ভারতে ইংরেজ শাসন

মিঃ এন্. এন্. ঘোষ-কৃত

England's Work in India

পুস্তকের বঙ্গানুবাদ

(পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত)

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম. এ.,

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রামতনু লাহিড়ী' অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী বিভাগের
স্কুল সমূহের ভূতপূর্ব্ব ইন্স্পেক্টার ; 'প্রথমশিক্ষা ভারতবর্ষের ইতিহাস',
'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা ; ভারতবর্ষীয়
ব্যবস্থাপরিষৎ ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভ্য
এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য

(চতুর্থ সংস্করণ)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৯৩৩

ভূমিকা

পূর্ব্বে ১৯১৬ সালে England's Work in India গ্রন্থের একখানি বঙ্গানুবাদ বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। এই দশ বার বৎসরের মধ্যে ভারতের রাজনীতিক ইতিহাসে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সেই সকল পরিবর্ত্তন মূল গ্রন্থের নব সংস্করণে উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং বঙ্গানুবাদেও সে পরিবর্ত্তনগুলির উল্লেখ থাকা আবশ্যক বোধে এই নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানীতিরও দ্রুত পরিবর্ত্তন হইতেছে। মাতৃভাষাসমূহের সাহায্যে শিক্ষা-দানের প্রয়োজনীয়তা কর্ত্তৃপক্ষগণ ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে উপলব্ধি করিতেছেন। বঙ্গীয় পাঠার্থিগণ যাহাতে ইংরেজ শাসনের মূলসূত্র ও প্রধান প্রধান ব্যাপারের সহিত তাহাদের আপন মাতৃভাষায় সহজে ও অল্প সময়ে পরিচয় লাভ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে এই বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইল। পুস্তকখানির বিষয় সুবোধ্য করিবার আশায় ইহার ভাষা যথা-সম্ভব সরল করা হইয়াছে। এই জন্য গ্রন্থখানি নূতন করিয়া অনুবাদ করা আবশ্যক বিবেচিত হইয়াছে। এই নূতন অনুবাদে অনেক নূতন তথ্যও সংযোজিত হইয়াছে।

গত দশ পনের বৎসরের মধ্যে শাসন-প্রণালীর সম্বন্ধে ভারত-বাসীর মনে যে সকল নব নব আশা ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে সম্পূর্ণ নূতন। ভবিষ্যৎ গঠন করিতে যাঁহারা প্রয়াসী, বর্ত্তমান ও অতীতের সহিত সুপরিচয় থাকা তাঁহাদের পক্ষে যে একান্ত আবশ্যক, ইহা বলাই বাহুল্য। আমি ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা পরিষদে

ও রাষ্ট্রীয় পরিষদে এমন অনেক ব্যক্তি দেখিয়াছি, যাঁহারা শাসন-সংস্কারে অত্যন্ত উৎসাহশীল; কিন্তু কি প্রণালীতে এই জটিল শাসন-নীতি পরিচালিত হইতেছে, পূর্ব্বে ইহা কিরূপ ছিল, কি কারণে ইহা বর্ত্তমান আকারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে সংবাদ তাঁহারা রাখেন নাই। ইহাতে যে কত অসুবিধা হয়, তাহা বলা বাহুল্য। এই অসুবিধা দূর করা প্রত্যেকের পক্ষেই সুসাধ্য। এই জন্যই 'ভারতে ইংরেজ শাসন' একখানি অতি সময়োপযোগী গ্রন্থ। জনসাধারণের মধ্যে রাজনীতিক শিক্ষা যাহাতে ক্রমশঃ অনুসৃত হয়, সেই উদ্দেশ্যেই বাঙ্গালায় এইরূপ সহজ একখানি সঙ্কলন-গ্রন্থ বঙ্গীয় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পক্ষে একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে হয়।

বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর দোষ ও গুণ উভয়ই আছে। মানবের কোনও কর্ম্মই চরম উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না। দোষ-গুণের তারতম্য-বিচারের শক্তিও যত্নে অর্জ্জন করিতে হয়। শাসন-নীতির কোথায় গুণ, কোথায় দোষ তাহা জানিতে পারিলেই ইহাকে উন্নতির দিকে লইয়া যাওয়া সম্ভব হইতে পারে। বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর সংস্কার যে যে স্থলে আবশ্যক, তাহাও এই গ্রন্থে কিছু কিছু প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কোনও দেশের সহিত সম্যক্ পরিচয় লাভ করিতে হইলে, তাহার সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত সুপরিচিত হওয়া অত্যাবশ্যক। 'ভারতে ইংরেজ শাসন' সংক্ষেপে এই সকল প্রতিষ্ঠানের পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

জুন, ১৯২৭ অনুবাদক

সূচী

প্রথম ভাগ

ইংরেজ আমলে ভারতবর্ষ

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দ্বিতীয় ভাগ

ভারতবর্ষের শাসন-পদ্ধতি

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

পরিশিষ্ট (১)

পরিশিষ্ট (২)

পরিশিষ্ট (৩)

ভারতে ইংরেজ শাসন

প্রথম অধ্যায়

ইংরেজ শাসনের মূলসূত্র

উপক্রমণিকা—ইংরেজেরা এ দেশে যেমন রাজ্য লাভ করিলেন, তেমনি তাহার শাসন ও রক্ষণের দায়িত্বও তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইল। এই দায়িত্ব যে কত গুরুতর তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কোথায় ইংলণ্ড আর কোথায় ভারতবর্ষ! ছয় হাজার মাইলেরও অধিক দূরবর্ত্তী এক দেশ হইতে আর এক দেশ শাসন করা যে অতি কঠিন, ইহা বলাই বাহুল্য। ভারতবর্ষ একটি ছোট দেশ নহে, ইহার অধিবাসীদিগের জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম, ভাষা, আচার, ব্যবহার একরূপ নহে। এ দেশের লোকের মধ্যে ত অনেক বিষয়ে প্রভেদ রহিয়াছে; তাহার উপর আবার যাঁহাদের স্কন্ধে এই বিশাল দেশের শাসনভার পড়িল, তাঁহাদের জাতি, ধর্ম্ম, ভাষা, প্রকৃতি—এ সমস্তই এ দেশের লোকের জাতিধর্ম্ম ইত্যাদি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইংরেজ শাসনের প্রথম অবস্থায় তাঁহাদের শাসনাধীনে যে সকল স্থান ছিল, তাহা আয়তনে এখনকার অপেক্ষা অনেক ছোট ছিল। লোকসংখ্যাও এত অধিক ছিল না। কিন্তু সে সময়ে ইংলণ্ড হইতে ভারতে আসিতে, বা ভারতের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে

যাতায়াত করিতে বা সংবাদ প্রেরণ করিতে এখনকার অপেক্ষা দীর্ঘ সময় লাগিত এবং বহু আয়াস-স্বীকারের প্রয়োজন হইত। শাসনকর্ত্তারা রাজ্যের সমস্ত স্থান দেখিবার এবং প্রজাদিগকে জানিবার সুযোগ তেমন পাইতেন না। তাঁহাদের সংখ্যাও বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা অনেক কম ছিল। সুতরাং নূতন একটি শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে যে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। এক্ষণে ভারতবর্ষ শাসন করা কোনও কোনও বিষয়ে কঠিন হইয়া থাকিলেও পূর্ব্বে যে সকল অসুবিধা ছিল, তাহা যে বহু পরিমাণে কমিয়াছে, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে।

। **শাসন-প্রণালী**—এই বিশাল দেশের শাসনভার যখন ইংরেজদের হস্তে আসিল, তখন তাঁহারা এই বিজিত দেশে আপনাদের ইচ্ছামত যে কোনও শাসন-প্রণালী অবলম্বন করিতে পারিতেন। তাঁহারা আপনাদের জন্য এক প্রকার আইন এবং এ দেশের লোকের জন্য আর এক প্রকার আইন সৃষ্টি করিতে পারিতেন। এ দেশের লোকের মধ্যেও কাহাকেও অনুগ্রহ, কাহাকেও নিগ্রহ করিবার জন্য তাঁহারা আইনের বৈষম্য ঘটাইতে পারিতেন। নূতন শাসন-প্রণালী উদ্ভাবন করিবার ক্লেশ-স্বীকার না করিয়া, তাঁহারা তাঁহাদের নিজ দেশের শাসনপদ্ধতি এ দেশে অবিকল চালাইতে পারিতেন; কিংবা এ দেশের শাসন-প্রণালী যতই মন্দ হউক না কেন, এ দেশবাসীর পক্ষে তাহাই যথেষ্ট মনে করিয়া, তাঁহারা এ দেশের প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে শাসনদণ্ড চালাইতে পারিতেন। অথবা ইচ্ছা করিলে এক অভিনব শাসন-প্রণালীর সৃষ্টি করিয়া এ

দেশবাসীর উপর তাহার পরীক্ষা করিতেও তাঁহাদের কোনও বাধা ছিল না।

সংস্কার ও সংরক্ষণ—কিন্তু এ সকল পন্থার কোনওটিই তাঁহারা অবলম্বন করিলেন না। তাঁহারা এ দেশের যাহা কিছু বিধি-ব্যবস্থা ছিল, তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তনও করিলেন না: আবার তাঁহাদের নিজ দেশের আইন-কানুন এ দেশে আনিয়া চালাইলেন না। আমূল পরিবর্ত্তন এবং অবিকল সংরক্ষণ, এ দুইয়ের মাঝামাঝি পথই শ্রেয়ঃ বলিয়া তাঁহারা মনে করিলেন। মানুষ স্বভাবতঃই মনে করে যে, তাহার স্বদেশের যাহা কিছু সমস্তই ভাল, আর বিদেশের যাহা কিছু সমস্তই মন্দ,—সেকালের ইংরেজেরা এই পক্ষপাতিত্ব হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। এ দেশের শাসন-বিষয়ে তাঁহারা অতি সতর্কতা ও ধীরতার সহিত অগ্রসর হইয়াছিলেন। আদর্শ শাসন-প্রণালী উদ্ভাবন করিবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া সেকালের বিচক্ষণ ইংরেজ শাসনকর্ত্তারা এ দেশের পক্ষে কি প্রকার শাসন-প্রণালী অধিকতর উপযোগী, তৎপ্রতি অবহিত ছিলেন। এ দেশের অবস্থা ও মানবচরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া যাহা সেই অবস্থা ও চরিত্রের অনুকূল বলিয়া তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, তাহাই গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের শাসন-রীতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এ দেশের পুরাতন রীতিনীতির মধ্যে যাহা কিছু নীতিবিরুদ্ধ, ক্ষতিজনক বা একান্ত অনুপযোগী ছিল, তাহা পরিবর্ত্তন করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হয়েন নাই। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে তাঁহারা কোনও অভিনব বিধিরও প্রবর্ত্তন করেন নাই। ইংরেজেরা

সমগ্র দেশের পক্ষে সুশাসনের ও ন্যায়বিচারের জন্য কতকগুলি মূলসূত্র স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তারপর প্রত্যেক প্রদেশের জন্য দেশকালপাত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, তাঁহারা বিশেষ বিশেষ বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন। অবস্থাভেদে শাসন-সম্বন্ধেও স্থলবিশেষে তাঁহারা বিশেষ বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। এক কথায় বলিতে গেলে ইংরেজেরা এ দেশের পুরাতন বিধি-ব্যবস্থা ও ভাব-ধারা যতদূর সম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টিত ছিলেন এবং পুরাতন যাহা কিছু ভাল, তাহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে ক্রটী করেন নাই। তাহা হইলেও, যে সমস্ত বিষয়ে তাঁহাদের নিজের দেশে উন্নতি সাধিত হইয়াছে, সেই সকল উন্নতি হইতে এ দেশ যাহাতে বঞ্চিত না হয়, তাহাও তাঁহারা করিয়াছেন। এ দেশের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, তাঁহারা আইন-কানুন ও শাসন-প্রণালীতে উন্নতিশীল পাশ্চাত্ত্য ভাবের ধারা আনয়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং এ দেশের অবস্থার সহিত মানাইয়া ভাল ভাল পাশ্চাত্ত্য প্রতিষ্ঠানও যথাসম্ভব এ দেশে প্রবর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইংরেজ শাসনাধীনে ভারতবর্ষের যে উন্নতি, তাহা এই প্রাচীনত্বের সংরক্ষণ ও নূতনত্বের যথাসম্ভব প্রবর্ত্তন হইতেই হইয়াছে। সুতরাং এই উন্নতির ইতিহাস বিবৃত করিতে হইলে, কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিতে হয়, যথা—কোন্ কোন্ বিষয়ে ভারতের পুরাতন ধারা অবিকল সংরক্ষিত হইয়াছে, কোথায় বা তাহার অল্পাধিক সংস্কার করিয়া লইতে চেষ্টা করা হইয়াছে, এবং কোথায়ই বা সম্পূর্ণ নূতন পাশ্চাত্ত্য ভাব অবলম্বন করা হইয়াছে।

ভারত সাম্রাজ্যের বিশালত্ব—ভারতবর্ষ যে কত বড় তাহা ধারণা করিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে, ইহার আয়তন ১৮,৩৩,০০০ বর্গ মাইল। ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশের আয়তন ১১,২৪,০০০ বর্গ মাইল এবং দেশীয় রাজগণের অধিকারভুক্ত স্থানের পরিমাণ ৭,০৯,০০০ বর্গ মাইল। ইংরেজ অধিকৃত প্রদেশ সমূহের মধ্যে এই কয়েকটি বড়—ব্রহ্মদেশ (শান্ রাজ্যসমেত) ২,৩০,৮৩৯ বর্গ মাইল; মান্দ্রাজ ১,৪২,৩৩০ বর্গ মাইল; বোম্বাই (এডেন লইয়া) ১,২৩,০৫৯ বর্গ মাইল; এবং যুক্ত প্রদেশ ১,০৭,২৬৭ বর্গ মাইল। ১৯১২ সালে যে নূতন বিভাগ হয়, তাহার ফলে বিহার ও উড়িষ্যার পরিমাণ হইল ৮৩,১৮১ বর্গ মাইল, অথচ বাঙ্গালার আঠাশটি জেলায় মাত্র ৭৮,৬৯৯ বর্গ মাইল রহিল। আসাম গভর্নমেণ্টের অধীন প্রদেশের পরিমাণ ৫৩,০১৫ বর্গ মাইল।

১৯২১ সালের গণনায় ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৩১,৮৯,৪২,৪৮০, ইহার মধ্যে ইংরেজ-শাসিত ভারতে ২৪,৭০,০৩,২৯৩, এবং দেশীয় রাজ্য সমূহে ৭,১৯,৩৯,১৮৭। বাঙ্গালার লোকসংখ্যা ৪,৭৫,৯২,৪৬২। ইহার পরেই যুক্ত প্রদেশ (আগ্রা ও অযোধ্যা); ঐ প্রদেশের লোকসংখ্যা ৪,৬৫,১০,৬৬৮; বিহার ও উড়িষ্যার লোকসংখ্যা ৩,৭৯,৬১,৮৫৮। ১৯১১ সালের তুলনায় ১৯২১ সালে ভারতে লোকসংখ্যা ৩৭,৮৬,০৮৪ অর্থাৎ শতকরা ১·২ মাত্র বাড়িয়াছিল।

ভাষার বিভিন্নতা—ভারত-সাম্রাজ্যে যে সকল ভাষা প্রচলিত আছে, তাহার সংখ্যা ২২০; ইহার মধ্যে ৩৮টি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। এই সকল ভাষা প্রধানতঃ তিনটি বৃহৎ

পরিবারভুক্ত, যথা ভারত-চৈনিক (Indo-Chinese), দ্রবিড়-মুণ্ডা এবং ভারত-ইয়ুরোপীয় (Indo-European)। ভারত-চৈনিক ভাষা সমূহ হিমালয় প্রদেশ, ব্রহ্মদেশ এবং উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে প্রচলিত। দ্রবিড়-মুণ্ডা ভাষা প্রধানতঃ ভারতের দক্ষিণে ও মধ্যভাগে ব্যবহৃত। ভারত-ইয়ুরোপীয় ভাষা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, পাঞ্জাব, বোম্বাই, বঙ্গ, আসাম, এবং হায়দারাবাদ রাজ্য ও হিমালয়ের অন্তরালবর্ত্তী প্রদেশে প্রচলিত।

জাতিধর্ম্মগত বৈষম্য—ভারত-সাম্রাজ্যের অধিবাসিগণ নৃ-তত্ত্বানুসারে সাতটি প্রধান জাতিতে বিভক্ত। তাহাদের ধর্ম্ম দশটি প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এই সকল জাতি এবং ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে আবার নানা শাখা-প্রশাখা আছে।

যে দেশের আয়তন ও লোকসংখ্যা এত অধিক এবং যে দেশের জাতি ও ধর্ম্মমত এত বহু শাখায় বিভক্ত, সে দেশের লোকের মনের গতি ও জীবন-ব্যাপারে যে বহু বৈচিত্র্য এবং সময়ে সময়ে স্বার্থের বিরোধ পর্য্যন্ত থাকিবে, তাহা স্বাভাবিক। এই বৈচিত্র্য-বহুল লোকপুঞ্জ যে একই শাসনের অধীনে আসিয়াছে, ইহা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নূতন ঘটনা। একই শাসনভুক্ত হওয়াতে, লোকের একই রাজনীতিক অধিকার ও দায়িত্ব হইয়াছে। এই সাম্যের গতিকে জাতিগত ও সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবাদ-বিসংবাদ অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান, পার্শী ও খৃষ্টান ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমন্দিরে গিয়া আপন আপন প্রণালী অনুসারে পূজা উপাসনাদি করিতে পারে; ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীর শিক্ষা লাভ করিতে পারে এবং বিভিন্ন সামাজিক রীতিনীতির অনুষ্ঠান করিতে পারে। এই সকল বৈষম্য-হেতু পরস্পরের মধ্যে

বিলক্ষণ ঈর্ষ্যা জন্মিতে পারে, কিন্তু রাজনীতিক ক্ষেত্রে সকলের অধিকার সমান। একই রাজ্যের প্রজা হওয়ায় সকলেরই দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য একই প্রকারের। প্রত্যেক ব্যক্তিই ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় এবং সামাজিক ব্যাপারে স্বাধীন। অন্য বিষয়ে যতই বিরোধ থাকুক না কেন, কেহ কাহারও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ও সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইংরেজেরা ইচ্ছা করিলে অন্যরূপ নীতির অনুসরণ করিতে পারিতেন এবং নানা বৈষম্য ঘটাইতে পারিতেন; কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহারা সকলকে সমান অধিকার ও তুল্যরূপে আশ্রয় প্রদান করিয়া বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে যখন পার্লিয়ামেণ্ট আইন করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দের (Charter) মেয়াদ বাড়াইয়া দিলেন, তখন সেই আইনের ৮৭ ধারায় উল্লিখিত হইয়াছিল যে, "কোম্পানীর অধিকারভুক্ত প্রদেশ সমূহের কোনও অধিবাসীকে বা ইংলণ্ডেশ্বরের রাজ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এমন কোনও ব্যক্তিকে তাহার জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম, বংশমর্য্যাদা বা জন্মস্থানের জন্য কোম্পানীর অধীনে কোনও চাকুরী, পদ বা কার্য্যের জন্য অযোগ্য বিবেচনা করা হইবে না।" ইল্‌বার্ট (Sir Courtney Ilbert) বলিয়াছেন, দেশ-শাসন-কার্য্যে এ দেশীয়গণের এরূপ অবাধ প্রবেশাধিকার ইতিপূর্ব্বে কখনও এত উদারতার সহিত ও পরিস্ফুটভাবে স্বীকৃত হয় নাই।

উক্ত আইনের আর একটি ধারায় লিখিত আছে যে, "যখন ইয়ুরোপীয়েরা এ দেশে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার পাইতেছে, তখন তাহারা যাহাতে এ দেশের লোকের উপর অত্যাচার, উৎপীড়ন না

করে বা কাহারও ধর্ম্মের অমর্য্যাদা না করে, তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবার ভার মন্ত্রি-সভাসীন গভর্নর জেনারলের উপর অর্পিত হইল।”

সেই আইনের দ্বারা ইহাও বিধিবদ্ধ হইল যে, এ দেশ হইতে দাসত্বপ্রথা যাহাতে যত সত্বর সম্ভব উঠিয়া যায় এবং ক্রীতদাসদিগের দুরবস্থা যাহাতে অপনোদিত হয়, গভর্নর জেনারল তাহার ব্যবস্থা করিবেন এবং এ বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করিয়া শীঘ্রই তিনি বিলাতের ডিরেক্টর-সভায় (Court of Directors) প্রেরণ করিবেন। উক্ত আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবার সময় বলিয়া দেওয়া হইল যে, বিবাহ সম্বন্ধে, ও পিতা বা পরিবারস্থ প্রধান ব্যক্তির স্বত্ব এবং কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে যে সকল আইন প্রচলিত আছে, তাহার সহিত কোনও বিরোধ না হয়, তৎপ্রতি যেন লক্ষ্য রাখা হয়।

সিপাহী-বিদ্রোহের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিলেন, তখন তিনি যে ঘোষণা-পত্র প্রচার করেন, তাহাতেই ভারতে ইংরেজ শাসনের সাধারণ সূত্রগুলি অতি সুচারুভাবে বিবৃত হয়। ইহা “ভারতীয় রাজন্য ও প্রজাবৃন্দের প্রতি মহারাণীর ঘোষণা” (Queen's Proclamation) এই নামে আখ্যাত হইয়াছিল; ইহা ভারতে পঠিত ও ১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বর তারিখে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছিল। মহারাণীর ঘোষণায় যে অপক্ষপাত ন্যায়বিচারের আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে এবং যে উদারনীতি ও কল্যাণ-কামনা তাহার প্রতি ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য কোনও টীকার প্রয়োজন

হয় না। মহারাণীর ঘোষণা ও তাঁহার পুত্র সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ড্ এবং পৌত্র সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ যে সকল ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন এবং যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা যত্নের সহিত পাঠযোগ্য। তাহা হইতে ভারতে ব্রিটিশ শাসন যে নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাহা সুন্দররূপে বুঝিতে পারা যায়। সেগুলির অনুবাদ দেওয়া হইল।

মহারাণীর ঘোষণা-পত্র

গ্রেট্‌ব্রিটেন ও আয়ারলণ্ড, ইয়ুরোপ, এসিয়া, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলেশিয়া প্রভৃতি মহাদেশে ইংলণ্ডের যে সকল উপনিবেশ ও অধীন প্রদেশ আছে, ঈশ্বরেচ্ছায় আমি ভিক্টোরিয়া সে সকল দেশের রাণী ও ধর্ম্মের রক্ষয়িত্রী।

নানা গুরুতর কারণে, আমরা পার্লিয়ামেণ্টে সমবেত অভিজাতবর্গ (Lords) ও সাধারণ প্রজাসমূহের প্রতিনিধিবর্গের (Commons) পরামর্শ ও সম্মতি লইয়া স্থির করিয়াছি যে, ভারতবর্ষের অন্তর্গত প্রদেশসকলের শাসনভার, যাহা এতদিন আমাদের প্রতিভূস্বরূপ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উপর ন্যস্ত রহিয়াছে, তাহা আমরা এক্ষণে স্বহস্তে গ্রহণ করিব।

অতএব এই ঘোষণা-পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি যে, আমরা সকলের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে উক্ত শাসনভার গ্রহণ করিলাম। আমরা ভারতবর্ষের প্রজাবর্গকে এতদ্দ্বারা আদেশ করিতেছি, তাহারা যেন বিশ্বাসী ও রাজভক্ত হয় এবং যাঁহাদিগকে

আমরা আমাদের নামে ও আমাদের পক্ষ হইতে ভারতবর্ষ শাসন করিতে সময়ে সময়ে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিব, তাঁহাদের আদেশ যেন সর্ব্বথা মানিয়া চলে।

আমরা আমাদের পরম আত্মীয় ও বিশ্বাসভাজন চার্লস্ জন্ ভাইকাউণ্ট ক্যানিং মহোদয়ের যোগ্যতা, রাজভক্তি ও বিচারশক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, তাঁহাকেই আমাদের সর্ব্বপ্রথম প্রতিনিধি ও গভর্ণর জেনারল নিযুক্ত করিলাম। তিনি আমাদের নামে ভারতবর্ষীয় রাজ্য শাসন করিবেন ও আমার একজন প্রধানতম সচিবের দ্বারা আমরা সময়ে সময়ে যে সকল আদেশ ও বিধি প্রচার করিব, তদনুসারে আমাদের পক্ষ হইতে ও আমাদের নামে তিনি রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য করিবেন।

এক্ষণে যাঁহারা মাননীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে সাধারণ ও সামরিক বিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত, তাঁহাদিগকে আমরা সেই সেই পদে স্থায়ী রাখিলাম। ভবিষ্যতে আমরা তাঁহাদের সম্বন্ধে যেরূপ আদেশ করিব, তাহা তাঁহাদিগকে মানিতে হইবে এবং যে সকল আইন-কানুন পরে প্রচারিত হইবে, তাহার অধীন থাকিতে হইবে।

আমরা দেশীয় রাজন্যবৃন্দকে এতদ্দ্বারা জানাইতেছি যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাদের সহিত যে সকল সন্ধি বা প্রতিশ্রুতি দ্বারা আবদ্ধ আছেন, আমরা তাহা স্বীকার করিলাম। উহা আমাদের পক্ষ হইতে সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালিত হইবে। আমরা তাঁহাদের নিকট হইতেও এইরূপ অঙ্গীকার-প্রতিপালনের প্রত্যাশা করি।

ভারতে আমরা যে সকল প্রদেশ লাভ করিয়াছি, তাহা বাড়াইবার ইচ্ছা আমাদের নাই। কিন্তু অপরে আমাদের অধিকার বা স্বত্বাদির উপর হস্তক্ষেপ করিলে, তাহা আমরা কখনও সহ্য করিব না। কেহ যদি কাহারও ন্যায্য অধিকারে হস্তক্ষেপ করে, তাহাও আমরা অনুমোদন করিব না।

দেশীয় রাজগণের স্বত্ব, অধিকার, পদ ও সম্মান আমরা আপনার ন্যায় জ্ঞান করিয়া মান্য করিব। আমাদের একান্ত ইচ্ছা যে, তাঁহারা ও আমাদের প্রজাবর্গ সর্ব্বপ্রকার আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি লাভ করুন। কেবল দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও সুশাসনের দ্বারাই ইহা সাধিত হইতে পারে।

আমাদের অন্যান্য প্রজাদিগের প্রতি যেরূপ কর্ত্তব্য আছে, ভারতীয় প্রজাদিগের প্রতিও সেই সেই কর্ত্তব্য পালন করিতে আমরা বাধ্য রহিলাম। ঈশ্বর-কৃপায় আমরা নিশ্চয়ই সেই সকল কর্ত্তব্য আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে পালন করিতে পারিব।

যদিও খৃষ্টধর্ম্মের উপর আমাদের একান্ত বিশ্বাস এবং সেই ধর্ম্মবিশ্বাস যে শান্তি ও সান্ত্বনা প্রদান করে, তাহা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করিয়া থাকি, তথাপি আমাদের সেই ধর্ম্মবিশ্বাস গ্রহণ করিতে আমাদের প্রজাদিগকে কখনও বাধ্য করিতে ইচ্ছা করি না; বা আমাদের সেরূপ কোনও অধিকার আছে বলিয়া স্বীকার করি না। ইহা আমাদের রাজকীয় ইচ্ছা ও ইহাই আমাদের অনুমোদিত বলিয়া ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের অধিকারে আপন আপন ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য কেহই অনুগৃহীত বা নিগৃহীত হইবে না। অপিচ অপক্ষপাত ও সমদৃষ্টিসম্পন্ন আইন সকলকেই তুল্যভাবে রক্ষা করিবে। আমাদের অধীনে

যাঁহারা নিয়োজিত তাঁহাদিগকে আমরা সতর্ক করিয়া দিতেছি ও আদেশ করিতেছি যে, তাঁহারা যেন আমাদের ভারতীয় প্রজাদিগের ধর্ম্মবিশ্বাসে ও পূজোপাসনাদিতে কখনও হস্তক্ষেপ না করেন। যিনি আমাদের এ শাসন লঙ্ঘন করিবেন, তিনি আমাদের নিরতিশয় বিরক্তিভাজন হইবেন।

ইহাও আমরা ইচ্ছা করি যে, আমাদের ভারতীয় প্রজারা যে জাতির বা যে সম্প্রদায়ের হউক না কেন, তাহারা শিক্ষা, যোগ্যতা এবং সাধুতার দ্বারা যে কার্য্য পাইবার উপযুক্ত, সেই কার্য্যে অবাধে ও বিনা পক্ষপাতে নিযুক্ত হইতে পারিবে।

পিতৃপিতামহ হইতে লব্ধ সম্পত্তি ভারতবাসীর চোখে কিরূপ আদরের বস্তু, তাহা আমরা জানি এবং তাহাদের এই ভক্তিভাবকে আমরা শ্রদ্ধা করি। এ জন্য আমরা সেই সকল সম্পত্তি সম্বন্ধে তাহাদের সর্ব্বপ্রকার বৈধ স্বত্বাধিকার রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি। কেবল আমাদের যাহা ন্যায্য প্রাপ্য, তাহাই আমরা গ্রহণ করিব। ইহাও আমাদের ইচ্ছা যে, আইন-কানুন বিধিবদ্ধ ও প্রচলিত করিবার সময়ে ভারতের পুরাতন আচার, পদ্ধতি ও অধিকারের প্রতি যেন যথোচিত দৃষ্টি রাখা হয়।

কতকগুলি অপরিণামদর্শী দুরাকাঙ্ক্ষা-প্রণোদিত ব্যক্তি বিদ্রোহ করিয়া ভারতে যে অনর্থ ঘটাইয়াছে, সে জন্য আমরা গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। ঐ সকল লোক মিথ্যা সংবাদ রটনা করিয়া তাহাদের স্বদেশবাসীকে প্রতারিত করিয়াছিল এবং প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল। এই বিদ্রোহ-দমনে আমাদের শক্তির পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। এক্ষণে আমরা আমাদের ক্ষমাগুণের পরিচয় দিতে ইচ্ছা করি।

যাহারা অপরের কুপরামর্শে চালিত হইয়াছিল, তাহারা যদি কর্ত্তব্যের পথে ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহাদিগের অপরাধ ক্ষমা করা হইবে।

যাহাতে আর অধিকতর রক্তস্রোত প্রবাহিত না হয় এবং অচিরেই যাহাতে শান্তি সংস্থাপিত হয়, এই উদ্দেশ্যে আমাদের প্রতিনিধি গভর্নর জেনারল ইতিমধ্যেই একটি প্রদেশে ক্ষমার আশ্বাস দিয়াছেন। যাহারা বিগত শোচনীয় বিদ্রোহে লিপ্ত হইয়া আমাদের প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে অপরাধ করিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশকে তিনি কতকগুলি সর্ত্তে ক্ষমা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন; যাহাদের অপরাধ ক্ষমার বহির্ভূত, তাহাদিগকে যে শাস্তি দেওয়া হইবে, তাহাও তিনি বলিয়া দিয়াছেন। তাঁহার ঐ ব্যবস্থা আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি এবং ঘোষণা করিতেছি যে, সমস্ত অপরাধীকে ক্ষমা করা হইবে; কেবল যাহারা ইংরেজ প্রজাগণের হত্যাব্যাপারে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে লিপ্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকে ক্ষমা করা হইবে না। কারণ ন্যায়ধর্ম্মানুসারে তাহাদিগকে কোনও মতে ক্ষমা করা যাইতে পারে না।

যাহারা ইংরেজদিগের হত্যাকারিগণকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আশ্রয় দিয়াছে, অথবা যাহারা বিদ্রোহের নেতা বা মন্ত্রণাদাতা ছিল, তাহাদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে না। তাহাদিগকে অন্য উপযুক্ত শাস্তি দিবার কালে, কিরূপ অবস্থায় পড়িয়া তাহারা রাজদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা বিবেচনা করা হইবে এবং যাহারা দুষ্ট লোকের কুমন্ত্রণায় পড়িয়া এবং অলীক সংবাদে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অপরাধ করিয়াছে

বলিয়া প্রমাণিত হইবে, তাহাদের প্রতি বহুল পরিমাণে ক্ষমা প্রদর্শিত হইবে।

এতদ্ভিন্ন অন্য বিদ্রোহীরা যদি আপন আপন গৃহে ফিরিয়া গিয়া শান্তশিষ্টভাবে জীবন যাপন করিতে প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে আমরা এতদ্দ্বারা তাহাদের সকল অপরাধ সম্পূর্ণভাবে ক্ষমা করিব বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছি। আমাদের রাজকীয় ইচ্ছা এই যে, যাহারা আগামী ১লা জানুয়ারীর পূর্ব্বে এই সকল সর্ত্ত পালন করিবে, তাহাদিগকে উপরিলিখিত ভাবে ক্ষমা করা যাইবে।

ঈশ্বর-কৃপায় যখন ভারতে আভ্যন্তরীণ শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন যাহাতে ভারতের শান্তিপূর্ণ শ্রমিক শিল্পের উন্নতি হয়, যাহাতে সর্ব্বসাধারণের উন্নতিকর কার্য্যের বহুল প্রসার হয়, এবং ভারতের প্রজার হিতের জন্যই যাহাতে শাসন-যন্ত্র পরিচালিত হয়, সেইরূপ ব্যবস্থা করাই আমাদের একান্ত ইচ্ছা। তাহাদের উন্নতিতেই আমাদের শক্তি, তাহাদের সন্তোষেই আমাদের সর্ব্ব-প্রকার ভরসা এবং তাহাদের কৃতজ্ঞতাই আমাদের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ আমাদিগকে এবং আমাদের অধীন কার্য্যাধ্যক্ষগণকে এরূপ শক্তি দান করুন, যাহাতে ভারতবাসিগণের কল্যাণার্থ আমাদের এই সকল সৎসংকল্প কার্য্যে পরিণত হয়।

ভারতবর্ষের রাজন্যবৃন্দ ও প্রজাবর্গের প্রতি সম্রাট্ সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডের ঘোষণা-পত্র

২রা নভেম্বর, ১৯০৮

অদ্য পঞ্চাশৎ বর্ষ হইল, আমার স্নেহময়ী জননী ও রাজ-সিংহাসনের মহামহিমময়ী পূর্ব্বাধিষ্ঠাত্রী মহারাণী ভিক্টোরিয়া নানা গুরুতর কারণে, পার্লিয়ামেণ্টের পরামর্শ ও সম্মতি অনুসারে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে ভারতের রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে দিন যে-গৌরবপূর্ণ দায়িত্ব ধর্ম্মতঃ গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহারই স্মরণার্থ অদ্য আমি ভারতবর্ষের রাজন্য ও প্রজাবর্গকে সাদর সম্ভাষণ জানাইবার উপযুক্ত সময় মনে করিতেছি। আপনাদের সুদীর্ঘ ইতিহাসের পটে অর্দ্ধ শতাব্দী অতি অল্প স্থান অধিকার করিলেও, অদ্য যে অর্দ্ধ শতাব্দীর অবসান হইল, তাহা ইতিহাসের যুগপ্রবাহ-মধ্যে বহু দিন উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। ইংলণ্ডের রাজশক্তির প্রাধান্য বিঘোষিত হওয়ায় ভারতবর্ষে এক শাসন-প্রণালী সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং একটি নূতন যুগের সূত্রপাত হইয়াছিল। পথ সুদুস্তর এবং গতি অনেক সময়ে অতি মন্থর বলিয়া বোধ হইয়াছে। কিন্তু ইংরেজদিগের কর্ত্তৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে নানা বিচিত্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত প্রায় ত্রিশ কোটী মানবের মধ্যে একতার চেষ্টা স্থিরভাবে এবং অবিরাম গতিতে অগ্রসর হইয়াছে। আমাদের বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর

কার্য্যকলাপ আমরা আজ সুস্পষ্টভাবে এবং পবিত্র হৃদয়ে পর্য্যালোচনা করিতে পারিতেছি।

মানুষের শাসন-ব্যাপারে সকল যুগে ও সকল স্থানে যে সকল বিঘ্ন উপস্থিত হয়, এখানেও তাহা নিত্য নিয়ত ঘটিয়াছে। ব্রিটিশ রাজকর্ম্মচারিগণ পরিশ্রম, সাহস ও ধৈর্য্যসহকারে সেই সকল বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হইয়াছেন। বহু বিচার-তর্কের পর তাঁহারা যে সংকল্পে উপনীত হইয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহারা কখনও স্খলিত কিংবা পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। ভুলভ্রান্তি হইলে আমার কর্ম্মাধ্যক্ষগণ তাহা সংশোধন করিতে কখনও পরিশ্রম বা ত্যাগ-স্বীকারে বিমুখ হয়েন নাই। কোথাও দোষ ঘটিয়াছে এরূপ প্রমাণিত হইলে, তাহার প্রতিবিধান করিতে তাঁহারা যথাসাধ্য শ্রম স্বীকার করিয়াছেন।

সাম্রাজ্যের এমন কোন গূঢ় শক্তি নাই যদ্দ্বারা জলকষ্ট এবং মহামারী নিবারণ করা যায়; তবে বহুদশী শাসনকর্ত্তারা কৌশল ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার দ্বারা যতদূর সম্ভব, ঐ সকল প্রাকৃতিক বিপৎপাতের কঠোরতা লাঘব করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ আর কখনও যে আপনাদের দেশে এত দীর্ঘকাল থামিয়াছিল, ইহা ইতিহাস বলে না। আভ্যন্তরীণ শান্তির কোনও ব্যাঘাত ঘটে নাই।

১৮৫৮ সালের বিখ্যাত ঘোষণা-পত্রে মহারাণী ভিক্টোরিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, শান্তিপ্রসূত শ্রমিক শিল্পের উন্নতির ব্যবস্থা করা হইবে, সাধারণের হিতকর কার্য্যের বহুল প্রসারে যত্ন করা হইবে এবং এ দেশীয়দিগের কল্যাণকল্পে শাসনদণ্ড পরিচালিত করা হইবে।

আপনাদের আর্থিক উন্নতি ও সুবিধার জন্য যে সকল ব্যাপার বহু শ্রমসহকারে উদ্ভাবিত ও অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা হইতে সমগ্র পৃথিবীর সমক্ষে সপ্রমাণ হয় যে, মহারাণীর সেই সাধু আশ্বাসবাণী কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কি ঐকান্তিক চেষ্টা করা হইয়াছে! সে সকল ব্যাপার এরূপ বৃহৎ এবং এরূপ সাহসিকতার অপেক্ষা করে যে, জগতে তাহার তুলনা বিরল।

করদ ও মিত্ররাজগণের বিশেষ বিশেষ অধিকার ও স্বাধীনতা সম্মানিত ও সংরক্ষিত হইতেছে; এবং তাঁহাদের রাজভক্তিও অবিচলিত রহিয়াছে। আমার প্রজাবৃন্দের মধ্যে কোনও ব্যক্তিই তাহার আপন ধর্ম্মমত বা উপাসনা-পদ্ধতির জন্য অনুগৃহীত, উত্ত্যক্ত বা অশান্তিগ্রস্ত হয় নাই। সকলেই আইনের দ্বারা রক্ষিত হইতেছেন; আপনাদের নিজস্ব সভ্যতার উপরে প্রতিষ্ঠিত যে সকল আচার, ব্যবহার এবং ধর্ম্মমত, তাহার প্রতি কোনও রূপ অশ্রদ্ধা প্রদর্শন না করিয়া আইন প্রয়োগ করা হইতেছে। আইন সকল সরল ও সুবোধ্য করা হইয়াছে; এবং তাহার প্রয়োগ-যন্ত্র এরূপভাবে গঠিত হইয়াছে. যাহাতে নূতন জগতে প্রবেশকামী প্রাচীন জাতি সমূহের পক্ষে তাহা উপযোগী হইতে পারে। আমার ও আমার কর্ম্মাধ্যক্ষগণের প্রতি যে দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে, তাহার উপর বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অসংখ্য লোকের ভাগ্য নিভর করিতেছে। উপযুক্ত কারণ-অভাবে এবং বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে যাহারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, তাহাদিগকে কঠোরভাবে দমন করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। আমি জানি যে, আমার বহুসংখ্যক বিশ্বস্ত রাজভক্ত ভারতীয় প্রজাবৃন্দের নিকট এই সকল ষড়যন্ত্র অত্যন্ত ঘৃণার্হ। এই সকল ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র যাহাতে শান্তি ও

শৃঙ্খলাস্থাপনের কার্য্যে আমার বাধা জন্মাইতে না পারে, আমি তাহা নিশ্চয়ই করিব।

মহারাণীর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘোষণা-পত্রের পঞ্চাশত্তম সাংবৎসরিক দিবস কোনও প্রকার রাজকীয় ক্ষমা বা দয়ার স্মরণযোগ্য নিদর্শন ব্যতিরেকে অতিবাহিত হইতে দেওয়া আমার ইচ্ছা নহে। অতএব আমি আদেশ করিতেছি যে, ১৯০৩ সালের অভিষেক-দরবারে যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল, সেইরূপ আমাদের বিচারালয় কর্ত্তৃক দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের দণ্ডাজ্ঞা রহিত করা হয় অথবা হ্রাস করিয়া দেওয়া হয়। আমি এই ইচ্ছা করি যে, অপরাধীরা যেন সর্ব্বদা এই দয়ার কথা স্মরণ করে এবং আর কখনও অপরাধ না করে।

ক্ষমতাপূর্ণ উচ্চ রাজপদে লোক-নিয়োগকালে জাতিবর্ণের প্রভেদ দূর করিয়া দিবার জন্য অনবরত চেষ্টা করা হইতেছে। আমি ইহা বিশেষ ভরসা করি ও ইচ্ছা করি যে, ভারতবাসীদিগের যেরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং স্বভাবসিদ্ধ যোগ্যতা, তাহাতে শিক্ষার বিস্তার, অভিজ্ঞতা-লাভ ও দায়িত্বজ্ঞান-বৃদ্ধির সঙ্গে এই জাতিগত তারতম্য নিশ্চয় দরীভূত হইবে।

প্রথম হইতেই স্বায়ত্ত শাসন বা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির দ্বারা শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আমার প্রতিনিধি ও গভর্নর জেনারল এবং অন্যান্য অমাত্যগণের মতে এক্ষণে ঐ প্রণালী সাবধানতার সহিত আরও কিছু দূর বিস্তৃত করিয়া দিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। আপনাদের মধ্যে কতিপয় মুখ্য শ্রেণী যাঁহারা ব্রিটিশ শাসনের দ্বারা পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়াছেন, তাঁহারা সমান

অধিকার পাইতে চাহেন এবং আইন-প্রবর্ত্তন ও শাসন-ব্যাপারে তাঁহারা আরও ক্ষমতা-লাভের প্রয়াসী। এইরূপ প্রার্থনা সুবিবেচনার সহিত পূরণ করিলে বর্ত্তমান রাজশক্তি বর্দ্ধিতই হইবে, খর্ব্ব হইবে না। যদি শাসনকর্ত্তারা শাসিতের সহিত এবং তাহাদের নেতা ও মুখপাত্রদিগের সহিত অধিকতর পরিমাণে মিশিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে শাসনকার্য্য আরও সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইবে। এই উদ্দেশ্যে যে সকল নিয়ম ধীরতার সহিত লিপিবদ্ধ হইতেছে, আমি তাহার কথা কিছু বলিব না। সেগুলি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে এবং আমি একান্ত ভরসা করি যে, তাহা আপনাদের দেশের কল্যাণপ্রদ উন্নতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায়ের সূচনা করিবে।

আমি আমার ভারতীয় সৈন্যবৃন্দের শৌর্য্য, বীর্য্য ও বিশ্বস্ততার প্রশংসা করিতেছি এবং আমি নববর্ষের প্রথমে আদেশ করিয়াছি যে, আমার এই উচ্চ প্রশংসার অনুরূপভাবে যাহাতে তাহাদের স্বাভাবিক সামরিক গুণ, চমৎকার নিয়মবর্ত্তিতা এবং অবিচলিত কার্য্য-তৎপরতার উপযুক্ত পুরস্কার হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হইবে।

ভারতবর্ষের উন্নতি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার একান্ত কামনার বিষয় ছিল। ১৮৭৫ সালে আমার ভারত-গমনের পর হইতেই আমি ভারতের এবং তত্রত্য রাজন্য ও প্রজাবর্গের হিত সর্ব্বদা আগ্রহসহকারে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি এবং কাল আমার সে স্নেহপূর্ণ আগ্রহ কিছুমাত্র শিথিল করিতে সমর্থ নহে। আমার প্রিয়তম পুত্র প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্স্ এবং তদীয় পত্নী আপনাদের সহিত অবস্থান করিয়া, আপনাদের দেশের প্রতি অনুরাগ ও

ঐ দেশের উন্নতি ও স্বাচ্ছন্দ্যের কামনা লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রতি আমার বংশের সকলে যে অকৃত্রিম সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা পোষণ করেন, তাহা ইংলণ্ডের যাবতীয় লোকসমূহের সমবেত ইচ্ছা ও অভিপ্রায়েরই পরিচায়ক।

এই যে দায়িত্বপূর্ণ ভার আমাদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে, ইহার অপেক্ষা গৌরবময় কার্য্য আর কোনও রাজা এবং প্রজার স্কন্ধে পতিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। শ্রীভগবানের আশ্রয়ে ও কৃপায় ইহার জন্য যে বুদ্ধি এবং পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও সৌহৃদ্য আবশ্যক, তাহা যেন বর্দ্ধিত হয়।

রাজ্যাভিষেক দরবারে

সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের ঘোষণা

১২ই ডিসেম্বর, ১৯১১

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও আহ্লাদের সহিত আমি অদ্য আপনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি। এই বৎসর আমার ও সম্রাজ্ঞীর পক্ষে মহোৎসব-বাহুল্যের বৎসর হইয়াছে এবং সে জন্য অনেক অনভ্যস্ত আয়াস স্বীকার করিতে হইলেও, ইহা অত্যন্ত সুখের হইয়াছে। আমরা সে বারে আসিয়া যে-দেশকে ভালবাসিতে শিখিয়াছিলাম,

গত বারের সেই সকল প্রীতিমধুর স্মৃতিতে আকৃষ্ট হইয়া, দূরত্ব ও কাল উপেক্ষা করিয়া, আমরা আবার সেই দেশে আসিয়াছি। যে-দেশে আসিয়া প্রবাসেও আমরা গৃহসুখ উপভোগ করিয়াছিলাম, সেই দেশ পুনরায় দেখিবার জন্য আমরা বড় আশা লইয়া যাত্রা করিয়াছিলাম।

গত জুলাই মাসের বার্ত্তায় আমি যে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাই আমাদের আগমনে কার্য্যে পরিণত হইল। আমি ইচ্ছা করিয়াছিলাম যে, আমি স্বয়ং আপনাদের নিকট আমার রাজ্যাভিষেক-বার্ত্তা ব্যক্ত করিব। গত ২২শে জুন 'ওয়েষ্টমিনষ্টার এবি'তে আমার রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হইয়াছিল। ভগবানের অনুগ্রহে সেই দিন আমার পূর্ব্বপুরুষগণের রাজমুকুট পবিত্রভাবে ও প্রাচীন উৎসবের সহিত আমার মস্তকে স্থাপিত হইয়াছিল।

সম্রাজ্ঞীকে সঙ্গে লইয়া আমি যে এ দেশে আসিয়াছি, তাহার অপর কারণ ভারতীয় রাজভক্ত রাজন্য ও বিশ্বস্ত প্রজাবর্গের নিকট আমি আমাদের প্রীতি জ্ঞাপন করিতে উৎসুক। ভারত-সাম্রাজ্যের মঙ্গল ও সুখ-সমৃদ্ধির জন্য আমরা কি পর্য্যন্ত লালায়িত. তাহাই প্রকাশ করিবার জন্য আমরা আসিয়াছি।

আরও একটি কারণ এই যে, যাঁহারা আমার রাজ্যাভিষেকের পবিত্র উৎসবে উপস্থিত হইতে সমর্থ হয়েন নাই, তাঁহারা দিল্লী নগরীতে উহার স্মৃতি-উৎসবে যোগদান করিবেন, ইহাও আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল।

আজ এই বিপুল জনসংঘ দেখিয়া আমি ও সম্রাজ্ঞী আন্তরিক আনন্দ লাভ করিয়াছি। ইহার মধ্যে আমার শাসনকর্ত্তৃগণ, বিশ্বাসী কর্ম্মাধ্যক্ষগণ, প্রধান নৃপতিবৃন্দ, ভারতীয় জনসাধারণের

প্রতিনিধিগণ এবং ভারত-সাম্রাজ্যের সৈন্যদলের নির্ব্বাচিত ব্যক্তিবর্গ সম্মিলিত হইয়াছেন দেখিয়া আমি সুখী হইয়াছি।

রাজভক্তি-প্রণোদিত হইয়া তাঁহারা যে সম্মান ও বশ্যতা প্রদর্শন করিতে ইচ্ছুক, তাহা আমি স্বয়ং আন্তরিক আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিব। আজ এই ইতিহাস-বিশ্রুত ব্যাপারে ভারতের রাজন্যবৃন্দ ও প্রজাবর্গ যে আমার সহিত সহানুভূতি ও সস্নেহ প্রীতি-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন, এই চিন্তা গভীরভাবে আমার মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছে।

এই সকল মনোভাব জানাইবার জন্য আমি আমার বিশেষ অনুগ্রহসূচক চিহ্নের দ্বারা এই অভিষেকোৎসব চিরস্মরণীয় করিতে মনস্থ করিয়াছি। সমবেত জনমণ্ডলীর নিকটে অদ্যই সেগুলি আমার গভর্নর জেনারল কর্ত্তৃক কিয়ৎক্ষণ পরে বিজ্ঞাপিত হইবে।

অবশেষে, আমার পূজনীয় পূর্ব্বাধিকারিগণ আপনাদের স্বত্ব ও বিশেষ বিশেষ অধিকার-রক্ষা-সম্বন্ধে যে সকল প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন, আমি আনন্দের সহিত স্বয়ং উপস্থিত হইয়া পুনরায় সেই সকল প্রতিশ্রুতি আপনাদিগকে দান করিতেছি। আপনাদের সুখ, শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা যে আমার বিশেষ আগ্রহের বিষয় সে সম্বন্ধেও আমি পুনর্ব্বার আপনাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিবার সুযোগ পাইয়া আনন্দিত হইতেছি।

জগদীশ্বর তাঁহার অপার অনুগ্রহে আমার প্রজাগণের প্রতি দৃষ্টি রাখুন এবং তাঁহাদের সুখসমৃদ্ধি-বিধানকল্পে আমার ঐকান্তিক চেষ্টার সহায় হউন।

অদ্য যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন, রাজন্যগণ এবং প্রজাবৃন্দের সকলকেই আমি আমাদের প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি।

পূর্ব্বোক্ত দিল্লী দরবারের পরে ১৯১২ সালে সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী কলিকাতায় আগমন করিলে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদিগকে স্বাগত জানাইয়া অভিনন্দন করেন। তাহার উত্তরে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ যে সকল চিরস্মরণীয় উক্তি করিয়াছিলেন, তাহা ছাত্রদিগের পক্ষে যেমন, জনসাধারণের পক্ষেও তেমনি অবশ্য-জ্ঞাতব্য ও প্রণিধানযোগ্য।

নিম্নে সেই অভিনন্দন ও প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইল। উহা পাঠ করিলে মনে আশা ও উৎসাহের সঞ্চার হয় এবং উহাতে ভাবিবার বিষয় অনেক রহিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মমন্দির 'দ্বারবঙ্গ-গ্রন্থাগারে' উহা মর্ম্মর প্রস্তরে সুবর্ণাক্ষরে উৎকীর্ণ হইয়াছে :

বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত অভিনন্দন

৬ই জানুয়ারী, ১৯১২

মহামহিম সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী মহোদয়ার প্রতি বিনীত নিবেদন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে আমরা আপনাদিগকে অভিনন্দন প্রদান করিবার মহোচ্চ অধিকার প্রাপ্ত হইয়া আমাদের সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত গভীর রাজভক্তি ও অসীম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

গত জুন মাসে লণ্ডনে যে রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হইয়াছিল, সেই উৎসব আমাদের সুপ্রাচীন রাজধানীতে পুনর্ব্বার সম্পাদন করিবার ইচ্ছায় ভারতবর্ষে শুভাগমন করিয়া আমাদের সম্রাট্ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী সমস্ত ভারতবাসীকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন ; আমরাও সেই আনন্দোচ্ছল কৃতজ্ঞতা অনুভব

করিতেছি। ছয় বৎসর পূর্ব্বে আপনি যে প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্‌স্ রূপে আমাদের "মর্য্যাদাত্মক ডক্টর অব্ ল" (Honorary Doctor of Law) উপাধি গ্রহণ করিযাছিলেন, তাহা আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যগণ বিশেষ গর্ব্বমিশ্রিত কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছি। আপনার মহিমশালী পিতৃদেব প্রাতঃস্মরণীয় সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডও বিশ্ববিদ্যালয়কে এই প্রকার সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন; তাহা আমরা বিস্মৃত হই নাই। এই প্রকারের রাজবংশের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে, তাহা ইতিমধ্যেই বংশানুগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে মনে করিয়া আমরা গর্ব্বানুভব করিতেছি।

অদ্যকার এই শুভ উপলক্ষে আমরা যে কেবল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিস্বরূপ আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা নহে; পরন্তু ভারতের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়, তথা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-প্রাপ্ত, ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীল নিখিল ভারতীয় প্রজাবৃন্দের প্রতিনিধিস্বরূপ আমরা রাজসমীপে উপনীত হইয়াছি। এইরূপ বহুবিস্তৃত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে আমরা বিশেবভাবে আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের অনুমতি ভিক্ষা করিতেছি। গ্রেট্ ব্রিটেনের সহিত ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় যে সকল অমূল্য সুযোগ ও উপকার আমরা লাভ করিয়াছি, তাহা এত বিচিত্র ও বহুসংখ্যক যে আমরা তাহার কিয়দংশ বর্ণনা করিতেও অক্ষম। কিন্তু একটি সুমহান্ উপকারের বিষয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের প্রতিনিধিরূপে আমরা উল্লেখ করিতে পারি এবং ইহা আমরা উল্লেখ করিতে বাধ্য; তাহা এই যে, দুইটি দেশের সম্মিলনের ফলে আমরা পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান ও শিক্ষা, সাহিত্য ও

বিজ্ঞানের অমূল্য রত্নরাজি লাভ করিয়াছি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পুরাকালে চিন্তা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা আমরা ভক্তি-মিশ্রিত গর্ব্বের সহিত স্মরণ করিয়া থাকি।

কিন্তু ইহাও আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমাদের দেশের মহত্ত্ব ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধান করিতে হইলে এবং পৃথিবীর উন্নতিশীল জাতি সমূহের মধ্যে এ দেশের পক্ষে একটি সম্মানজনক স্থান পুনরায় অধিকার করিতে হইলে, আমাদিগকে বহু আয়াস স্বীকার করিয়া অগ্রে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্পের অধিকারী হইতে হইবে। আমাদের দয়াবতার সম্রাট্, গ্রেট্ ব্রিটেন্ এবং ভারতবর্ষের সুখময় সম্মিলন ও তজ্জনিত সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের প্রতিরূপ স্বরূপ; আজ আমরা তাঁহার সম্মুখে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইয়া ভগবান্‌কে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি যে, তাঁহার করুণাময় বিধানে ভারতবর্ষের ভাগ্য গ্রেট্ ব্রিটেনের ন্যায় উন্নতিশীল ও জ্ঞানালোক-প্রাপ্ত একটি পাশ্চাত্ত্য দেশের ভাগ্যের সহিত জড়িত হইয়াছে; আমাদের শাসনকর্ত্তৃগণকেও ধন্যবাদ দিতেছি যে, তাঁহারা বহু পূর্ব্ব হইতে জনশিক্ষার ও জ্ঞানবিস্তারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহারা যে দূরদর্শী ও সহানুভূতি-পূর্ণ নীতির সূচনা করিয়াছিলেন এবং সেই অবধি যে নীতির অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন, তাহার ফলে আজ আধুনিক জ্ঞানালোক দেশের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

এই কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের সহিত আর একটি বিষয় ব্যক্ত করা সঙ্গত মনে করি। আপনাদিগকে সানুনয়ে ইহা বিশ্বাস করিতে অনুরোধ করি যে, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ তাঁহাদের সুমহৎ দায়িত্বের বিষয়ও সম্পূর্ণ অবগত আছেন। বর্ত্তমানে শিক্ষা ও জ্ঞানের

যে ধারা ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনকে পুনর্গ ঠন করিতেছে, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ সেই মহতী ধারার পরিচালক-স্থানীয়; এই সম্মান জনক পদের অনুপাতে কর্ত্তব্যের যে গুরুভার তাঁহাদের স্কন্ধে পড়িয়াছে, তাহা তাঁহারা সম্যক্ উপলব্ধি করিতেছেন। তাঁহারা জানেন যে, জ্ঞানের প্রসার ও বর্দ্ধন তাঁহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য নহে; পরন্তু শিক্ষার উৎকর্ষ ও জ্ঞানোন্নতির পথে দেশকে সংযতভাবে চালিত করাও বিশ্ববিদ্যালয়েরই কর্ত্তব্য।

শিক্ষাক্ষেত্র হঠাৎ বিস্তৃত হওয়ায় যুবকদিগের মনে অদম্য উৎসাহ সঞ্চারিত হইয়া শান্তিপ্রিয়তা, সদাচার ও রাজকীয় বিধির প্রতি শ্রদ্ধা এবং সুপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির প্রতি ভক্তি প্রভৃতি গুণগুলি ক্ষুণ্ণ বা শিথিল না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখাও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। কেন না এই সকল সমাজরক্ষণশীল মহৎ গুণ জীবনে অদৃশ্যভাবে ক্রিয়া না করিলে, কোনও জাতিই প্রকৃত মহত্ত্ব ও কল্যাণ লাভ করিতে পারে না। আমরা আপনা-দিগকে নিবেদন করিতেছি যে, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ সীমাহীন জ্ঞানোন্নতি-প্রবাহের নেতৃত্ব করিবার উচ্চাভিলাষ করিলেও, যাহাতে তাঁহারা চরিত্রনীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতির স্থায়িত্ব-লাভের সহায় হইতে পারেন, তৎপ্রতিও তাঁহাদের বিশেষ লক্ষ্য রহিয়াছে। যে সকল সম্বন্ধ গ্রেট্ ব্রিটেন্ ও তত্রত্য রাজপরিবারের সহিত ভারতবর্ষকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে, তাহা যাহাতে আরও সুদৃঢ় হয়, বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ ইহা একটি গুরুতর কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য করেন। মানবজাতির অশেষ কল্যাণের জন্য জগদ্ব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যে গুরুভার স্কন্ধে লইয়াছেন, ঈশ্বরেচ্ছায় তাহা সম্পন্ন করিবার পক্ষে কথঞ্চিৎ

সাহায্য করিতে পারিবেন, এই ধারণা তাঁহাদিগকে আনন্দ দান করিতেছে।

সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের উত্তর

ছয় বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আমি যে 'মর্য্যাদাত্মক ডক্টর অব্ ল' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহা আনন্দের সহিত স্মরণ করিতেছি। ভারতের উচ্চ শিক্ষার প্রতি আমার যে গভীর ও আন্তরিক আগ্রহ আছে, আমি আজ তাহা জানাইবার সুযোগ পাইয়া আহ্লাদিত হইয়াছি। ইয়ুরোপীয় এবং ভারতীয় শিক্ষাদীক্ষা, আশাভরসার সামঞ্জস্য ও সংমিশ্রণে ভারতবর্ষীয় বিদ্যালয় সমূহ সাহায্য করিবে, ইহাই আমি ভরসা করি। এই সংমিশ্রণের উপর ভারতের ভবিষ্যৎ মঙ্গল অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। শিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারিত ও আদর্শ উন্নত করিবার জন্য ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, আমি তাহা সহানুভূতির সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। এখনও অনেক কাজ করিবার আছে। আজকাল সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানের বিশেষ শাখাগুলির অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে এবং গবেষণার বিশেষ সুযোগ প্রদান না করিতে পারিলে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ই সম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয় না। আপনাদিগকে প্রাচীন শিক্ষার আদর্শ রক্ষা করিয়া, তাহার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের অনুশীলন করিতে হইবে। চরিত্র-গঠনের জন্যও আপনাদিগকে চেষ্টা

করিতে হইবে। কারণ চরিত্রের অভাবে সমস্ত শিক্ষাই মূল্যহীন। আপনারা বলিবেন যে, আপনারা আপনাদের সুমহৎ দায়িত্ব উপলব্ধি করিতেছেন। আপনাদের সম্মুখে যে কাজ রহিয়াছে, তাহা সাধনে ভগবান্ আপনাদের সহায় হউন, এই প্রার্থনা করি। আপনাদের আদর্শ উচ্চ হউক, এবং তাহা সফল করিবার জন্য আপনাদের চেষ্টা বিরামহীন হউক ; ঈশ্বরানুগ্রহে আপনারা নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবেন।

ছয় বৎসর পূর্ব্বে আমি ইংলণ্ড হইতে ভারতে সহানুভূতির বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছিলাম। আজ আমি ভারতে আসিয়া ভারতবাসীদিগকে আশার বাণী প্রদান করিতেছি। আমি চারিদিকেই নবজীবনের সাড়া ও চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি। শিক্ষা আপনাদিগকে আশা প্রদান করিয়াছে ; উন্নততর ও সুন্দরতর শিক্ষা আপনাদিগকে উচ্চতর ও উজ্জ্বলতর আশা-, আকাঙ্ক্ষা রচনা করিতে সমর্থ করুক। দিল্লী নগরীতে আমার আদেশক্রমে ঘোষিত হইয়াছে যে, আমার সপার্ষদ গভর্নর জেনারল শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতির জন্য প্রচুর পরিমাণে অর্থ নিয়োজিত করিবেন। আমার ইচ্ছা এই যে, সমগ্র দেশ স্কুল-কলেজের জালে ছাইয়া যাক ; সেই সকল অগণ্য স্কুল-কলেজ হইতে যাহারা শিক্ষা পাইয়া বাহির হইবে, তাহারা বলিষ্ঠ, রাজভক্ত ও কর্ম্মকুশল প্রজা হইবে এবং তাহারা শ্রমিক শিল্প, কৃষিকার্য্য এবং অন্যান্য যে কোনও জীবিকা অবলম্বন করুক না, তাহাতে কৃতকার্য্য হইবে। শিক্ষার বিস্তার এবং উচ্চতর মনোভাব, স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে উচ্চতর ধারণা প্রভৃতি যে সকল সুফল সৎশিক্ষা আনয়ন করে, তাহার দ্বারা আমার ভারতীয়

প্রজাগণের গৃহ আনন্দপূর্ণ ও পরিশ্রম মধুময় হউক, ইহাও আমি আশা করি। আমার সে অভিলাষ শিক্ষার দ্বারাই পূর্ণ হইবে এবং ভারতবর্ষের শিক্ষার বিষয় সর্ব্বদাই আমার হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে।

আমার প্রতি ও আমার পরিবারবর্গের প্রতি আপনাদের ভক্তির বিষয় এবং গ্রেট্ ব্রিটেন্ ও ভারতবর্ষের মধ্যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য আপনাদের কামনা অবগত হইয়া আমি সুখী হইলাম। ব্রিটিশ শাসনে আপনারা যে সকল সুবিধা ভোগ করিতেছেন, তাহা আপনাদিগের মনঃপূত জানিয়া আমি সন্তোষ লাভ করিলাম। আপনাদের রাজভক্তিপ্রণোদিত ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠাপূর্ণ অভিনন্দনের জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রক্ষণশীলতা

ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীনতা—১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মহারাণী যে ঘোষণা-পত্র প্রচার করেন, তাহাতে ভারতবর্ষের সমস্ত সম্প্রদায়কে ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীনতা প্রদত্ত হইয়াছে। যে যে-কোনও ধর্ম্ম অনুসরণ করিতে পারিবে এবং যেরূপে ইচ্ছা পূজা-অর্চ্চনা করিতে পারিবে—তাহাতে কেহ বাধা দিবে না। ১৮৩৩ সালের সনন্দ-আইনে সপার্ষদ গভর্নর জেনারলকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে; ভারতবাসীরা যাহাতে শারীরিক উপদ্রব ও অপমান হইতে এবং আপন আপন ধর্ম্ম ও বিশ্বাসের গ্লানি ও অমর্য্যাদা হইতে সর্ব্বদা রক্ষিত হয়, তিনি তাহার জন্য আইন-কানুন 'পাস' করিতে পারিবেন। সে আইনের দ্বারা ইহাও নির্দ্দিষ্ট হইল যে, কেহ নিজ ধর্ম্মমতের জন্য কোনও সরকারী কর্ম্মের অযোগ্য বলিয়া উপেক্ষিত হইবে না। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে যে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন পাস হয়, তাহাতে ধর্ম্মের অমর্য্যাদা ও গ্লানি হইতে সকলকে রক্ষা করিবার বিধান আছে। ঐ আইনের পঞ্চদশ অধ্যায়ে ২৯৫ হইতে ২৯৮ ধারা পর্য্যন্ত ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় অপরাধের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। মিঃ ষ্টোক্‌স বলেন, "উক্ত ব্যবস্থার মূলসূত্র এই যে, প্রত্যেকেই তাহার নিজ ধর্ম্মের অনুসরণ করিতে পারিবে; কেহ অন্যের ধর্ম্মমতকে অপমান করিতে পারিবে না। যে সকল অপরাধের

বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, সে সকল বর্ত্তমান ধর্ম্মগুলির প্রতি স্বেচ্ছাকৃত অপমান-বিষয়ক।"*

ভারতে ধর্ম্মবিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কারণ প্রথমতঃ প্রত্যেকেই স্বধর্ম্মের অনুসরণ ও বৈধভাবে পূজা-অর্চ্চনাদি-সম্বন্ধে স্বাধীন। দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্মমতের জন্য কেহ কোনও সরকারী কার্য্যে অযোগ্য বিবেচিত হয় না। তৃতীয়তঃ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রেরিত সরকারী পত্রের নিদেশ অনুসারে সরকারী স্কুল-কলেজে ধর্ম্ম-সম্পর্কীয় কোনও শিক্ষা দিবার বা পরীক্ষা লইবার নিয়ম নাই।† বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা-সংক্রান্ত যে সকল নিয়ম আছে, তাহাতে পরীক্ষার্থীর ধর্ম্মবিশ্বাস-ঘটিত কোনও প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ।

এ দেশে যে ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় স্বাধীনতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার মর্য্যাদা বুঝিতে হইলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ইংলণ্ডেও এই স্বাধীনতা বেশী দিনের জিনিষ নহে। ১৮২৯ সালে প্রথম রোম্যান ক্যাথলিকদিগকে ধর্ম্ম-সংক্রান্ত স্বাধীনতা প্রদান করিয়া আইন পাস হয়। ইহুদীদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিবার জন্য যে আইন, তাহা ১৮৫৮ সালের পূর্ব্বে পাস হয় নাই। ইহার পূর্ব্বে ইংলণ্ডে ধর্ম্মবিষয়ে যথেষ্ট অনুদারতা ছিল। তিন শত বর্ষব্যাপী আন্দোলনের ফলে ইংলণ্ড এই অনুদারতা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আর ভারতবাসী বিনা চেষ্টাতেই যে সেই স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, ইহা ইংরেজ শাসনকর্ত্তৃগণের অপূর্ব্ব দূরদর্শিতার ফল। কারণ এ দেশে এত অধিক ধর্ম্মমত ও এত বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় রহিয়াছে যে, কোনও একটি ধর্ম্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব

* "এংলো-ইণ্ডিয়ান্ কোড্", প্রথম খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা।

† "ইম্পিরিয়াল গেজেটীয়ার", চতুর্থ খণ্ড, ৪৪৭ পৃষ্ঠা।

করিলে অশান্তির অবধি থাকিত না। সেই জন্যই বহু পূর্ব্বে এই স্বাধীনতা লাভ করিতে এ দেশ সমর্থ হইয়াছে। স্মরণ রাখিতে হইবে, ক্যাথলিকদিগকে স্বাধীনতা-প্রদানের চারি বৎসর পরেই সনন্দ-আইন পাস হইয়াছিল, এবং যে বৎসরে ইহুদীদিগের স্বাধীনতা-সংক্রান্ত আইন পাস হয়, সেই বৎসরেই মহারাণীর ঘোষণা-পত্র প্রচারিত হয়।

প্রাচীন শিক্ষায় উৎসাহ-দান—কোনও একটি জাতির চিন্তা, চরিত্র ও জীবন শিক্ষার উপরেই বেশী পরিমাণে নির্ভর করে। প্রাচীনকাল হইতে আমাদের শিক্ষার জন্য টোল, মক্তব্, মাদ্রাসা প্রভৃতি যে সকল প্রতিষ্ঠান আছে, ইংরেজ শাসনকর্ত্তারা সে সকলের উপর হস্তক্ষেপ করিতে চেষ্টা করেন নাই।* কয়েক বৎসর হইতে এইরূপ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহ-দান করিবার জন্য পরীক্ষা গ্রহণ করা হইতেছে, ছাত্রগণকে বৃত্তি ও উপাধি এবং শিক্ষকগণকে বেতন ও বৃত্তি প্রদান করা হইতেছে। দেশের নানা স্থানে প্রাচ্য বিদ্যার অনুশীলনের জন্য স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস মুসলমানদের জন্য 'কলিকাতা মাদ্রাসা' স্থাপন করেন। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে বারাণসীতে একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য, যাহাতে হিন্দুরা তাহাদের পুণ্যতীর্থে হিন্দু সাহিত্য, হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র ও ভগবদ্বিষয়ক তত্ত্বাদির (বিশেষ ভাবে ধর্ম্ম বা বিধিশাস্ত্রের) সংরক্ষণ ও অনুশীলন করিতে পারে। স্থির

* দেশীয় প্রতিষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণের জন্য 'ইম্পিরিয়াল গেজেটীয়ার', চতুর্থ খণ্ড, ৪০৭ হইতে ৪০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসুর 'হিন্দু সভ্যতার ইতিহাস'ও দ্রষ্টব্য।

হইল যে, চিকিৎসাশাস্ত্রের শিক্ষক ব্যতীত অন্য সমস্ত বিষয়ের অধ্যাপক ব্রাহ্মণ হইবেন। হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে শিক্ষাবিষয়ক অধ্যায়ে যে সকল বিধি-নিষেধ আছে, কলেজ সর্ব্বপ্রকারে তদ্দ্বারা শাসিত হইবে।

১৮১৩ সালে চার্টার বা সনন্দ-আইনের এক বিধিতে লিখিত আছে, "ভারতবর্ষের সাহিত্যের পুনরুদ্ধার ও উন্নতির জন্য, শিক্ষিত ভারতবাসীদিগকে উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য এবং তাহাদিগের মধ্যে বিজ্ঞান-চর্চ্চার বিস্তারের জন্য" প্রতিবৎসর এক লক্ষ টাকা পৃথক্ রাখিতে ও ব্যয় করিতে হইবে। এই টাকা প্রাচ্য বিদ্যালয় সমূহের ব্যয়-নির্ব্বাহে, ছাত্রদিগকে বৃত্তিদানে এবং প্রাচ্য সাহিত্যের প্রচারকল্পে ব্যয়িত হইত।* ১৮২১ সালে পুণায় একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮২৪ সালে লর্ড আমহার্ষ্ট কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন। পূর্ব্বে কেবল ব্রাহ্মণ-সন্তান-গণকেই বৃত্তি দান করা হইত এবং কেবল ব্রাহ্মণছাত্রগণই এই কলেজে পড়িতে পাইতেন। কিন্তু এক্ষণে সকল বর্ণের হিন্দু ছাত্রেরাই ঐ কলেজে পড়িতে পারে। ১৮২৪ ও ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আগ্রা ও দিল্লী কলেজ স্থাপিত হয়। ঐ দুই কলেজই প্রাচ্য বিদ্যার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু কিছু পরেই ইংরেজি শিক্ষাও সংযোজিত হয় এবং ভূগোল ও গণিত পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হয়। কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ ও আগ্রা কলেজে ইংরেজি পড়াইবার জন্য ব্যবস্থা হইয়াছে। দিল্লী ও কাশীতে ইংরেজি ভাষা পড়াইবার জন্য জিলা-স্কুল স্থাপিত হইয়াছে।†

* ইম্পিরিয়াল গেজেটীয়ার, চতুর্থ খণ্ড, ৪০৯ পৃষ্ঠা।

† হিন্দুসভ্যতার ইতিহাস ৩য় খণ্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা।

দেশীয় বিধিব্যবস্থা—শিক্ষা বিষয়ে যেরূপ, শাসন সম্বন্ধেও সেইরূপ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, ভারতের প্রচলিত রীতিনীতি প্রভৃতি বিষয়ে যতদূর সম্ভব কম পরিবর্ত্তন করা। ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেষ্টিংস কর্তৃক একটি আইন প্রবর্ত্তিত হয়; তাহার অভিপ্রায় এই যে, মফঃস্বলের সমস্ত আদালতে, উত্তরাধিকার, বিবাহ ও জাতিবর্ণ-সম্বন্ধীয় সমস্ত মোকদ্দমা এবং অন্যান্য যাবতীয় ধর্ম্ম-সম্পর্কীয় মামলা, হিন্দুদের বেলায় হিন্দুশাস্ত্রানুসারে এবং মুসলমানদের বেলায় কোরানের বিধানানুসারে মীমাংসিত হইবে। ১৭৮১ সালের আইনে আরও উল্লিখিত আছে যে, যে সকল স্থলে বিশেষ কোনও বিধি প্রদত্ত হয় নাই, সেই সব স্থলে বিচারকগণ ন্যায়-পরতা, সমদর্শিতা ও বিশুদ্ধ বিবেকবুদ্ধি অনুসারে বিচার করিবেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে পার্লিয়ামেণ্ট এক আইন পাস করিলেন, তাহাতে ইহা স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল যে, কলিকাতাবাসীদিগের বিরুদ্ধে সর্ব্ব প্রকার মামলা-মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার অধিকার সুপ্রীম কোর্টের থাকিবে; কিন্তু তাহাদের উত্তরাধিকার ও ভূমিসংক্রান্ত দায়াধিকার, খাজানা এবং জিনিষপত্র, চুক্তিপত্র ও দুই পক্ষের মধ্যে সমস্ত প্রকার আদান-প্রদান-সম্বন্ধীয় মোকদ্দমা মুসলমানদের বেলায় মুসলমানদের আইন ও লোকাচার এবং হিন্দুদের বেলায় হিন্দুদের আইন ও লোকাচার অনুসারে মীমাংসা করা হইবে। যে স্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে এক পক্ষ হিন্দু বা মুসলমান, সে স্থলে প্রতিবাদীর স্বজাতীয় আইন ও লোকাচার অনুসারে মীমাংসা হইবে।

দেশীয়দিগের লৌকিক এবং ধর্ম্ম-ঘটিত আচার-ব্যবহারের প্রতি যথোচিত মর্য্যাদা প্রদর্শন করিবার জন্য, ইহাও নির্দ্দিষ্ট

হইয়াছিল যে, "পরিবারস্থ প্রধান ব্যক্তির বা পিতার স্ব স্ব পরিবারে যে সকল ক্ষমতা এবং অধিকার হিন্দু বা মুসলমান ধর্ম্মানুমোদিত, তাহা সেই সেই পরিবারের সম্বন্ধে অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তাঁহাদের স্বজাতীয় রীতিনীতি-ঘটিত কার্য্যকলাপ ইংলণ্ডের আইনের বিরুদ্ধ হইলেও তাহা অপরাধের মধ্যে গণ্য হইবে না।"

একজন বিখ্যাত লেখক বলিয়াছেন যে, ভারতে ইংরেজদের আদালতে যে ভাবে বিচারকার্য নিষ্পন্ন হয়, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, যদিও ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রসিদ্ধ নিয়মে * ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সভা বাধ্য নহেন, তাহা হইলেও ঐ সকল ব্যবস্থাপক-সভা কতকগুলি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না; সেগুলি প্রচলিত দেশীয় আইন ও প্রথা অনুসারেই মীমাংসিত হয়। পারিবারিক বিধিব্যবস্থা এবং তাহার অন্তর্ভুক্ত উত্তরাধিকার ও দায়াধিকার সম্পর্কে যাবতীয় বিষয় দেশীয়দিগের স্ব স্ব বিধিব্যবস্থার দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া আসিতেছে; কোনও কোনও স্থলে সেগুলি ভারতে ইংরেজ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বিধিব্যবস্থার দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তিত বা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। হিন্দুর বিবাহ, দত্তক-গ্রহণ, একান্নবর্ত্তী পরিবার, সম্পত্তি-বিভাগ ও দায়াধিকার সম্বন্ধে হিন্দুদিগের নিজস্ব আইন প্রবল হয়। সেইরূপ মুসলমানের বিবাহ, দায়াধিকার (উইল থাকিলে এবং না থাকিলে), ওয়াক্‌ফ্‌ অথবা ধর্ম্মসংক্রান্ত দানের ন্যায় প্রতীয়মান যে সকল দান, তৎসম্বন্ধে মুসলমানদিগের নিজস্ব আইন প্রবল হয়। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ঐ সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই।

* ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের বিচার-সম্পর্কীয় আইনে উল্লিখিত আছে।

ভূসম্পত্তি-বিষয়ে প্রাচীন ব্যবস্থার অনুবর্ত্তন—গভর্নমেণ্ট যে প্রণালীতে ভূমি বন্দোবস্ত করেন, তাহা পরে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইবে। এ স্থলে এইমাত্র বলা আবশ্যক যে, এসকল বিষয়েও ইংরেজ গভর্নমেণ্ট যতদূর সম্ভব রক্ষণশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। "দেশীয় রাজতন্ত্রের চরম ভগ্নদশার পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনতন্ত্র প্রচলিত হয়। কিন্তু প্রথমে অভিজ্ঞতার অভাবেই হউক বা অন্য কোনও কারণে হউক প্রচলিত বিধিব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করা হয় নাই।" "মোগল রাজশক্তির গৌরবের দিনে এই সকল বিধিব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়, কিন্তু সে রাজশক্তি এই সময়ে শেষ দশায় উপনীত হইয়াছিল। সে সময়ে যে শাসন-প্রণালী প্রচলিত ছিল, অন্ততঃ মোটামুটী তাহাই অনুসরণ করা ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর ছিল না।" *

বোম্বাই প্রদেশে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে মারাঠাদের রায়তওয়ারি প্রথা প্রচলিত ছিল। মান্দ্রাজে যদিও এরূপ ছিল না, তথাপি অনেকগুলি জেলায় ভূম্যধিকার প্রথা এরূপভাবে বর্ত্তমান ছিল যে, উহাই অবলম্বন করা ব্যতীত উপায় ছিল না। সময়ে সময়ে আইন-কানুন করিয়া নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু সম্ভবতঃ পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশ ব্যতীত অন্য সকল স্থানেই দেশীয় প্রথা ভিত্তিস্বরূপে অবলম্বিত হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশে ভূমির কর ও রাজস্ব সম্বন্ধে যে সকল আইন-কানুন প্রচলিত হইয়াছে, তাহার অন্তর্গত

* বি. এচ্. বেডেন-পাওয়েল প্রণীত রাজস্ব ও ভূমিস্বত্ব-বিষয়ক পুস্তক, ১১৪ পৃষ্ঠা।

ভূম্যধিকার-বিষয়ক অতি প্রয়োজনীয় আইন পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহা দেশীয় প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও তাহাতে ইংলণ্ডীয় ও ভারতীয় বিধির মধ্যে বিরোধ ও সামঞ্জস্যের চেষ্টা রহিয়াছে।*

প্রাচীন গ্রাম্য পুলিস—ব্রিটিশ শাসনের প্রথমাবস্থায় গ্রাম্য পুলিসের অবস্থা আদৌ ভাল ছিল না। কিন্তু যাহাই হউক, উহা প্রাচীন প্রথার অনুযায়ী ছিল। গ্রামের চৌকীদার এবং মণ্ডলকে পরিত্যাগ করা সম্ভব ছিল না। মোগল রাজশক্তি যখন অস্তমিতপ্রায়, তখন গ্রামের প্রহরীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিল; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার ও রাজারা নির্ভয়ে তাঁহাদের লোকজন লইয়া প্রতিবেশীদিগের সম্পত্তি-লুণ্ঠনে তৎপর হইলেন। গ্রামের চৌকীদার ও মোড়ল এই দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনেক চৌকীদার নিজেরাই চুরি করিতে আরম্ভ করিল এবং মোড়লদিগের অনেকে অপরাধীকে আশ্রয় দিতে লাগিল ও লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশ পাইবে এই লোভে, অপরাধ দেখিয়াও দেখিত না। ইংরেজ শাসনের প্রথম অবস্থায় এইরূপ বিশৃঙ্খলা দেখিয়া ইংরেজ শাসনকর্ত্তারা প্রথমতঃ জমিদারগণের হস্ত হইতে পুলিসের কার্য্যভার তুলিয়া লইয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্‌দিগের হস্তে অর্পণ করিলেন। "প্রত্যেক জেলা ২০ বর্গ মাইল লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুলিস এলাকায় বিভক্ত হইল। এইরূপ এক একটি এলাকায় এক একজন দারোগা নিযুক্ত হইলেন। প্রত্যেক দারোগার অধীনে কুড়ি হইতে পঞ্চাশ জন সশস্ত্র পুলিস দেওয়া হইল এবং গ্রামের

* ইল্‌বার্ট কৃত "ভারত গভর্নমেণ্ট", ৪০ পৃষ্ঠা।

মণ্ডলের উপরে দারোগার ক্ষমতা দেওয়া হইল।" * এ ব্যবস্থাও বিফল হইল। তদবধি বরাবর পুলিসের সংস্কার-সাধন ও পুনর্গঠন চলিয়া আসিতেছে।

প্রাচীন বিচারালয়—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে সকল আদালত স্থাপিত করেন, তাহা মুসলমানদের আমলে প্রতিষ্ঠিত বিচার-যন্ত্রের উপাদান লইয়া গঠিত হইয়াছিল। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে কালেক্টরের অধীন এক একটি বিভাগে একটি দেওয়ানী আদালত এবং একটি ফৌজদারী আদালত স্থাপিত হয়। কোম্পানীর নিযুক্ত কালেক্টর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ফৌজদারী আদালতে জেলার কাজি, মুফ্‌তি † এবং দুইজন মৌলবী মুসলমান দণ্ডবিধি অনুসারে বিচার করিতে বসিতেন। তাঁহাদের বিচার ন্যায়সঙ্গত ও পক্ষপাতশূন্য হইল কিনা এবং বিচারপদ্ধতিতে কোনও গোলযোগ ঘটিল কিনা, তাহা দেখিবার ভার কালেক্টরের উপরে ছিল। উক্ত দেওয়ানী আদালত হইতে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করিবার অধিকার ছিল। সদর দেওয়ানী আদালতে কাউন্সিলের সভাপতি ও সদস্যগণ বিচারকার্য্য করিতেন। রাজস্ব-বিভাগের ভারতীয় কর্ম্মচারিগণও বিচারকার্য্যে ইঁহাদের সহায়তা করিতেন। ফৌজদারী আদালত হইতে নিজামৎ আদালতে আপীল করিবার অধিকার ছিল। নিজামৎ আদালতে নবাব নাজিম কর্ত্তৃক নিয়োজিত প্রধান বিচারপতি, প্রধান কাজি ও তিনজন প্রসিদ্ধ

* ইম্পিরিয়াল গেজেটীয়ার, ৪র্থ খণ্ড, ৩৮৬ পৃষ্ঠা।

† মুসলমান আমলে উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয়ের বিচার কাজিরা করিতেন। মুফ্‌তি কাজির পক্ষ হইয়া আইনের ব্যাখ্যা করিতেন।

মৌলবী বিচারকার্য্য করিতেন। নিজামৎ আদালতের কার্য্য-কলাপ কাউন্সিলের সভাপতি ও সদস্যগণের কর্ত্তৃত্বাধীন ছিল।

পঞ্চায়েৎ প্রথা—পঞ্চায়েৎ প্রথা এ দেশের একটি পুরাতন ব্যবস্থা। বঙ্গ, বোম্বাই, বিহার, যুক্তপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবে ইহা আইনতঃ পরিগৃহীত হইয়াছে। এই প্রথাটি গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন-যন্ত্রের অঙ্গবিশেষ। পঞ্চায়েৎ অর্থে—পাঁচজনের সমবায়। ইহা প্রকৃতপক্ষে স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তি লইয়া গঠিত; এইরূপ সভায় প্রাচীনকাল হইতে পল্লীগ্রামের সামাজিক বিবাদের, এমন কি আইনঘটিত ব্যাপারেরও নিষ্পত্তি হয়। গভর্নমেণ্ট এ প্রথাটি কখনও উঠাইয়া দিতে চেষ্টা করেন নাই, পরন্তু যেখানে যেখানে এই প্রথা ছিল, সেখানেই ইহার উদ্দেশ্য কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া ইহাকে কাজে লাগাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

রাজনীতিক উন্নতি

পাশ্চাত্ত্য ভাব—ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রথমাবস্থা হইতে ইংরেজ শাসনকর্ত্তারা জনসাধারণের ইচ্ছা ও হিতের প্রতি এবং তৎকাল-প্রচলিত বিধিব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা সর্ব্বদা উন্নতির দিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন; সেই উদ্দেশ্যে তাঁহারা এ দেশে পাশ্চাত্ত্য ভাব ও পাশ্চাত্ত্য প্রতিষ্ঠানসকল প্রবর্ত্তিত করা আবশ্যক মনে করিয়াছেন এবং সেগুলিকে যথাসম্ভব এ দেশের অবস্থার উপযোগী করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই সকল পাশ্চাত্ত্য ভাব ও প্রতিষ্ঠান সমূহ এ দেশের পক্ষে উন্নতির সহায় হইবে, ইহার দ্বারা ভারতবাসীর নৈতিক ও মানসিক উন্নতি, আর্থিক অবস্থার উৎকর্ষ এবং সুখ-স্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হইবে, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহারা ঐরূপ করিয়াছেন।

বিধিবদ্ধ আইন—এ দেশে যে সমস্ত আইন-কানুন পাস হইয়াছে, তাহা একত্র হইয়া 'বিধি' (Codes or Acts) হইয়াছে; এই সকল বিধিতে আধুনিক ভাব (ideas) রহিয়াছে। সকল সময়ে বা সকল দেশেই আইন যে বিধিবদ্ধ ছিল, তাহা নহে। কিন্তু আইনগুলি একত্র লিপিবদ্ধ হওয়ার সুবিধা এই যে, তাহাতে আইন সমূহ পরিষ্কারভাবে, নিশ্চিতরূপে ও সুনির্দ্দিষ্ট

প্রণালী অনুসারে গ্রথিত থাকে এবং সর্ব্বলোকে তাহা জানিতে পারে। ছাত্র, উকীল, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট ও জনসাধারণ সকলেই অনায়াসে তাহার মর্ম্ম জানিতে ও বুঝিতে পারে। ইংরেজদিগের পার্লিয়ামেণ্ট বহুপূর্ব্বে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ভারতের জন্য আইন বিধিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। ১৮৩৩ সালের চার্টার বা সনন্দ-আইনে উক্ত হইয়াছে যে, "দেশীয় এবং ইউরোপীয়—সকলেই যাহার অধীন হইতে পারে, সেইরূপ আদালত ও পুলিস ভারতে সংস্থাপিত করা যুক্তিযুক্ত। অবশ্য বিশেষ বিশেষ স্থানীয় অবস্থা বুঝিয়া এগুলিকে বিশেষ বিশেষ ভাবে গঠন করিতে হইতে পারে। ভারতবর্ষের জন্য এরূপ আইন প্রণয়ন করিতে হইবে, যাহা সকলের পক্ষেই সমভাবে প্রযোজ্য। এই আইন বিধিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে এ দেশবাসীর আচার-ব্যবহার, মনোভাব এবং অধিকার প্রভৃতির বিষয়ও স্মরণ রাখিতে হইবে। বিভিন্ন প্রদেশে যে সমস্ত আইন এবং আইনের ন্যায় পরিগণিত লোকাচার প্রচলিত আছে, তৎসমুদয় জানিতে হইবে, বিধিবদ্ধ করিতে হইবে এবং আবশ্যকমত সংশোধন করিয়া লইতে হইবে।" উক্ত সনন্দ-আইন অনুসারে সপার্ষদ গভর্নর জেনারলের প্রতি আদেশ হইল যে, তিনি একটি সমিতি বা কমিশন নিযুক্ত করিবেন; ঐ সমিতির নাম 'ভারতীয় আইন-সমিতি' হইবে এবং "এ দেশে যে সকল আইন এবং বিচার-পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান ও বিবরণ দাখিল করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ঐ কমিশনের থাকিবে;" ঐ সকল বিবরণ পার্লিয়ামেণ্টের নিকট দাখিল করিতে হইবে। মেকলে এই কমিশনের সর্ব্বাপেক্ষা খ্যাতনামা সদস্য ছিলেন।

এ স্থলে দ্রষ্টব্য এই, পার্লিয়ামেণ্ট যে আদেশ দিলেন, তাহাতে বিশেষভাবে বলিয়া দেওয়া হইল যে, আইন বিধিবদ্ধ করিবার সময়ে যেন দেশীয় আচার-ব্যবহার, মনোভাব এবং অধিকার সমূহকে কোনও রূপে অগ্রাহ্য না করা হয়। আরও বলা হইল যে, দেশীয় সমস্ত আইন-কানুন যাহা লিপিবদ্ধ আছে এবং যাহা লোকাচারে চলিয়া আসিতেছে, সে সমস্তই যেন তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হয়। তারপর, আইনের দৃষ্টিতে সকল লোকই যে সমান, ইহাও অসন্দিগ্ধ ভাষায় উল্লিখিত হইয়াছে। সমস্ত লোক—কি ইয়ুরোপীয়, কি ভারতীয়—সকলেই যাহাকে মানিতে পারে এমন বিচারালয় এবং পুলিস সংগঠন করিতে হইবে এবং এমন সকল আইন করিতে হইবে যাহা সকলের প্রতি সমানভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে। এই সকল আইন যে আকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা বহু বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছে। একজন বিখ্যাত ইংরেজ আইনব্যবসায়ী বলিয়াছেন যে, "এ পর্য্যন্ত যত আইন-কানুন প্রণীত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ভারতীয় আইন শ্রেষ্ঠ আদর্শ-স্থানীয়।" বিলাতের আইনই ভারতীয় আইনের উপাদানের মূলভিত্তি, এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে। বিলাতের আইন হইতে যে অংশ ভিত্তিস্বরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাকে এ দেশের স্থানীয় বিশেষত্ব, অবস্থা, জলবায়ু, লোক-চরিত্র ও ধর্ম্মগত আচার-ব্যবহারের প্রতি যথোচিত লক্ষ্য রাখিয়া পরিবর্ত্তিত করিয়া লওয়া হইয়াছে।

আইনের দৃষ্টিতে সকলের সমতা থাকিলে লোকের অশেষ কল্যাণ হয়। ইহার অর্থ এই যে, প্রজাগণের মধ্যে কোনও ব্যক্তি বা শ্রেণীবিশেষ অনুগ্রহের ভাজন নহে, এবং অত্যাচারী তাহার

কৃত অপরাধের জন্য শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাইবে না। আইন সকলকেই বিনাপক্ষপাতে তুল্যরূপে রক্ষা করে এবং সকলেই তুল্য পৌরজনোচিত অধিকারের (Rights of Citizenship) দাবী করিতে পারে। প্রাচীন রোমে যেমন পৌরজনের পক্ষে এক প্রকার আইন ও বিজিতদের পক্ষে অন্যরূপ আইন ছিল, ভারতবর্ষে সেরূপ প্রভেদ নাই। স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, এই যে আইনের সমতা, ইহা ইংরেজ শাসনকর্ত্তৃগণের এক নূতন সৃষ্টি ; পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। ইহা ১৮৩৩ সালের চার্টার আইনে উল্লিখিত হইয়াছিল এবং ১৮৫৮ সালে মহারাণীর ঘোষণাপত্রে ও পরবর্ত্তী অন্যান্য রাজকীয় ঘোষণাপত্রে ধর্ম্মতঃ ও দৃঢ়তার সহিত পুনরুক্ত হইয়াছে। ইহা দণ্ডবিধিতেও রহিয়াছে ; তদনুসারে যে কেহ ১৮৬২ সালের ১লা জানুয়ারী বা তাহার পরে এই আইনের নিয়ম ভঙ্গ করিবে, সে-ই ইংরেজ-অধিকৃত ভারতে দণ্ডনীয় হইবে।

আইনে সমতা—ইংরেজ শাসনকর্ত্তৃগণই এ দেশে স্বাধীনতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহারা দাসত্ব-প্রথা রহিত করিয়া দিয়াছেন এবং জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকলকে আইন অনুসারে সমান অধিকার প্রদান করিয়াছেন। রাজা প্রজা, জমিদার রায়ত, প্রভু ভৃত্য, পিতা পুত্র, স্বামী স্ত্রী,—সমাজে, পরিবারে যে কেহ যে কোনও সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকুক না—আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান অধিকার ভোগ করিতেছে। ইংরেজ শাসননীতির ইহা একটি মূলসূত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, আইন কোনও ব্যক্তিবিশেষের সম্মান করে না।

বিচার সর্ব্ব-সমক্ষে এবং প্রকাশ্যভাবে সম্পন্ন হয়। বিচার-আদালতে সকলেরই প্রবেশাধিকার আছে—শুধু নালিশ রুজু

করিবার জন্য নহে, সমস্ত বিচারকার্য্য নিরীক্ষণ করিবার জন্যও বটে। যাহাতে বিচারালয়ে অধিক জনতা বা শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা না হয়, বিচারক তাহা করিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে, প্রত্যেকেই বিচারালয়ে প্রবেশ করিতে পারে এবং কিরূপে মোকদ্দমার বিচার হয় তাহা দেখিতে পারে। এইরূপে জনসাধারণকে বিচার-পদ্ধতি দেখিবার একটি সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে। বিচারালয়ে এবং ব্যবস্থাপক-সভায় যে সকল কার্য্য হয়, তাহা প্রকাশ করিবার কোনও বাধা নাই। ইংলণ্ডের ইতিহাসে দেখা যায় যে, এমন একসময় ছিল, যখন কোনও কোনও শ্রেণীর মামলার বিচারের সময় কাহাকেও সেখানে যাইতে দেওয়া হইত না। পার্লিয়ামেণ্টের কার্য্যাবলী প্রকাশিত করিবার অধিকারও ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে মাত্র স্বীকৃত হইয়াছে। সহজে এই অধিকার লাভ হয় নাই। এক দিকে ম্যাজিষ্ট্রেট ও সংবাদপত্রের সংবাদ-দাতৃগণ, অন্য দিকে পার্লিয়া-মেণ্ট,—উভয়ের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী তীব্র বাদানুবাদের পর তবে এই স্বাধীনতা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

আইন অনুসারে এবং ন্যায়ধর্ম্ম ও বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যে মোকদ্দমার বিচার করা হয়। বিচারকের নিজের খেয়াল বা ইচ্ছার উপর বিচার নির্ভর করে না। বিচারপ্রার্থী ব্যক্তি মাত্রেই বিচার-যন্ত্র পরিচালনা করিতে পারে। বাদী প্রতিবাদী উভয়পক্ষের বা তাহাদের উকীলগণের নিকট সমস্ত না শুনিয়া কোন মোকদ্দমার মীমাংসা করা হয় না। প্রকাশ্যভাবে এবং আইন অনুসারে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। প্রত্যেক পক্ষ অপর পক্ষের সাক্ষ্য জেরা করিয়া সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিতে পারে।

ফৌজদারী মামলায় অপরাধীর প্রতিকূলে কোনও সাক্ষ্যই তাহার অসাক্ষাতে লওয়া হয় না। সকল মোকদ্দমায়ই শপথ অথবা ধর্ম্ম-সাক্ষী করিয়া সাক্ষ্য দিতে হয় এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে, গুরুতর দণ্ড ভোগ করিতে হয়। কোনও কোনও ঘটনায় সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করা একটি অপরাধ। এক কথায় বলিতে গেলে, প্রত্যেক বিচারকালে সত্য বাহির করিবার জন্য এবং নিরপেক্ষভাবে ন্যায়বিচার করিবার জন্য সকল রকম উপায় অবলম্বিত হয়।

অপরাধী বা অভিযুক্ত ব্যক্তি দণ্ডার্হ কিনা, তাহা সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে। সাক্ষ্য উপস্থিত করা বাদী বা অভিযোক্তার কার্য্য। অপরাধের উপযুক্ত প্রমাণ থাকিলে, অপরাধীর দণ্ড হইবে, নচেৎ অপরাধীকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। ফ্রান্সে এক প্রকার রীতি আছে, তাহাতে অভিযুক্তের নিজের চরিত্র ও পূর্ব্ব ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করা হয় এবং যদি তাহার দ্বারা সেরূপ অপরাধ সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে তাহাকে তাহার নির্দ্দোষত্ব প্রমাণ করিতে বলা হয়। যদি সে উপযুক্ত প্রমাণ দিতে না পারে, তবে তাহার দণ্ড হয়। বলা বাহুল্য যে, এই রীতি কারারুদ্ধ অভিযুক্তের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধাজনক।

কোনও দেশের দণ্ডবিধি দেখিলে বুঝা যায় যে, সে দেশের লোকের কি পরিমাণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে। লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিনা কারণে বা অন্যায়রূপে খর্ব্ব না হইতে পারে, বিলাতের আইনে এরূপ ব্যবস্থা আছে। কেহ অপরাধ করিলে অথবা অপরাধ করিয়াছে এরূপ আশঙ্কা হইলে, তাহার নামে নালিশ করিতে হয়। যে ব্যক্তি নালিশ করে বা সংবাদ প্রদান

করে তাহার সংবাদ বা নালিশ যদি মিথ্যা সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে সে দণ্ডনীয় হয়। তারপর যে লোকের বিরুদ্ধে নালিশ করা হয়, তাহাকে আদালতে আনয়ন করা হয়। কতকগুলি গুরুতর অপরাধ ব্যতীত কাহাকেও ওয়ারেণ্ট ব্যতীত ধৃত করিবার নিয়ম নাই। বিচারকালে আসামী তাহার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য উকীল নিযুক্ত করিতে পারে। কোনও ব্যক্তিকে তাহার পক্ষের বক্তব্য না শুনিয়া দণ্ড দেওয়া হয় না। দোষ সপ্রমাণ না হওয়া পর্য্যন্ত, আসামীকে নির্দ্দোষ মনে করা হয়। সাক্ষীর যেমন জবানবন্দী লওয়া হয় বা তাহাকে জেরা করা হয়, আসামীকে সেরূপ করিবার রীতি নাই। তবে তাহার নির্দ্দোষত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য তাহার কিছু বক্তব্য থাকিলে, তাহা বলিতে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করিতে দেওয়া হয়। আসামীর পক্ষে এসকল সামান্য সুবিধা নহে; ইহা অপেক্ষা অধিকতর সুবিধা আর কিছু হইতে পারে না। ইহার মধ্যে কতকগুলি সুবিধা বিলাতের আইনের বিশেষ গুণ। সেগুলি হইতে বুঝা যায় যে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য কি সুন্দর ব্যবস্থা হইয়াছে! ইংরেজদিগের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে, এই সকল অধিকারের অনেকগুলি তাঁহারা পরে লাভ করিয়াছেন; পূর্ব্বে এগুলি ছিল না। ইংলণ্ডের দণ্ডবিধি আইন চিরকাল এখনকার মত উদার ও নিরপেক্ষ ছিল না, বরং আসামীর পক্ষে অত্যন্ত অন্যায় ছিল। "ইংলণ্ডের দণ্ডবিধির ইতিহাস দায়িত্বশূন্য শাসনতন্ত্রের একটি দুরপনেয় কলঙ্ক। যেরূপ নির্ম্মমভাবে মানুষের জীবন বলি দেওয়া হইত, তাহা একটি খৃষ্টান রাজ্যের অপেক্ষা কোনও প্রাচ্য নিরঙ্কুশ নরপতি অথবা

আফ্রিকার কোনও বর্ব্বর রাজারই সাজে।" * বহু বৎসরের বাগ্‌বিতণ্ডার পর, ১৮৩৬ সালে মাত্র, আসামীদিগকে গুরুতর অপরাধে উকীলের দ্বারা হাজির হইবার অধিকার দেওয়া হয়।

কতকগুলি বিশেষ কারণে মাত্র কোনও ব্যক্তিকে বিনা বিচারে অবরুদ্ধ করা যাইতে পারে, কিন্তু সেরূপ কারণ সচরাচর ঘটে না। যেসকল ঘটনায় এরূপ করা যায় তাহা ১৮১৮ সালের ৩য় রেগুলেশন নামক আইনে বিবৃত হইয়াছে। রাজনীতি-ঘটিত কোনও ব্যাপারে সপার্ষদ গভর্নর জেনারল এরূপ আদেশ দিতে পারেন যে, যে কোনও ব্যক্তিকে আবদ্ধ করা হউক; কিন্তু কেবল সেইরূপ ব্যক্তির বিরুদ্ধে এ প্রকার আদেশ দেওয়া যাইতে পারে যাহার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিবার প্রচুর কারণ নাই। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিবার এই যে ক্ষমতা, ইহার অপব্যবহার সহজেই হইতে পারে। এই জন্য বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক ও সতর্কতার সহিত এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যেখানে দণ্ডবিধির বিধান সহজে প্রয়োগ করা যায় না, অথচ গুরুতর অপরাধের সন্দেহ বা আশঙ্কা আছে, কেবল সেই স্থলেই উক্ত রেগুলেশন ব্যবহার করা উচিত। অনেকের মতে কোনও অবস্থাতেই বিনাবিচারে একজনকে কারারুদ্ধ করা সঙ্গত নহে। এই আইনে যাহারা অবরুদ্ধ হয়, তাহাদিগকে কোনও অপরাধের জন্য দণ্ডিত বলিয়া মনে করা হয় না; তাহাদিগকে অপরাধীর ন্যায় কোনও পরিশ্রমের

* সার টী. ই. মে প্রণীত ইংলণ্ডের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, ৩৯৩ পৃষ্ঠা।

কার্য্যেও নিযুক্ত করা হয় না। এই সকল রাজনীতিক কয়েদীর স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতার প্রতি লক্ষ্য রাখিবার ব্যবস্থা আছে এবং তাহাদের অবস্থা বা পদের উপযুক্তভাবে তাহাদের ও তাহাদের পরিবারের ভরণপোষণ রাজকোষ হইতে দিবার কথা।

জুরীর বিচার—১৮৬১ সালের ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ফলে এ দেশে জুরীর বিচার প্রবর্ত্তিত হয়। হাইকোর্টে যে সকল অপরাধীর বিচার হয়, তাহাদের বিচার জজ এবং জুরী উভয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। জুরীরা যদি একমত হয়েন, তাহা হইলে জজের মত প্রতিকূল হইলেও, জুরীর মতই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হয়। সেসন আদালতে আসামীদের বিচার জজেরা করেন, জুরী অথবা এসেসরেরা তাঁহার সাহায্য করেন। কোন্ জেলায় জুরীর সাহায্যে এবং কোন্ জেলায় এসেসরের সাহায্যে বিচার হইবে, তাহা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। জুরীর বিচারে জজ আইন-ঘটিত বিষয়ের বিচার করেন; ঘটনা-সম্বন্ধে বিচার করেন জুরীরা। মোকদ্দমার শুনানি শেষ হইলে, জজ সাক্ষ্য-প্রমাণের সারাংশ জুরীদিগকে বুঝাইয়া দিয়া, সেই মোকদ্দমায় প্রযোজ্য আইনের মর্ম্ম ব্যাখ্যা করেন এবং ঘটনা-সম্বন্ধে মীমাংসার জন্য তাঁহাদিগকে আহ্বান করেন। ইংলণ্ডে জুরীর বিচার জনসাধারণের একটি অমূল্য অধিকার। বহুদিন হইতে ইংলণ্ডের প্রজাসাধারণ এই অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছে। ভারতে ইহা ইংলণ্ডের দান। ইহাতে আসামীর সুবিধা এই যে, আইন-ব্যবসায়ীরা তাঁহাদের কূট বিচার-বুদ্ধির দ্বারা মোকদ্দমার মীমাংসা করেন না, পরন্তু সাধারণ লোকে সহজ জ্ঞানের দ্বারা ঘটনার সম্বন্ধে

সত্যাসত্য বিচার করেন। আর একটি সুবিধা এই যে, বে-সরকারী লোকের দ্বারা ঘটনার সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত হওয়ায় ইহাতে সরকার পক্ষের লোকের ধারণায় কিছু আসিয়া যায় না। জুরীর বিচার সফল করিতে হইলে বুদ্ধিমান্, সাধু, নিরপেক্ষ ও মোটামুটি শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন এমন লোক দেখিয়া জুরী নিযুক্ত করা উচিত।

স্বায়ত্ত শাসন—সমুন্নত পাশ্চাত্ত্য ভাবের অনুযায়ী আইন প্রস্তুত করিয়া ও তাহার প্রয়োগ-যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া যে শুধু রাজনীতিক উন্নতি লাভ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহা নহে; স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াও রাজনীতিক উন্নতি লাভের চেষ্টা হইয়াছে। স্বায়ত্ত শাসন স্বাধীনতার নামান্তর মাত্র। যে দেশ স্বাধীন, সে দেশকে স্বায়ত্ত শাসনের অধীন বলিতে পারা যায়; যে দেশ স্বায়ত্ত শাসনাধীন, তাহাকে স্বাধীন বলা যায়। সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বাধীনতা অর্থে 'সাম্রাজ্য-সম্বন্ধীয় স্বায়ত্ত শাসন' ব্যবহার করা যাইতে পারে। সাম্রাজ্যের কোনও অংশ স্বায়ত্ত শাসনাধীন হইয়াও, সাম্রাজ্যের শাসনতন্ত্রের অধীন হইতে পারে। ইহার অর্থ শুধু এই যে, সেই সেই স্থানের সমস্ত অথবা কতক কাজ স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা সম্পন্ন হয়। ইহা গভর্নমেণ্টের কর্ত্তৃত্বের বিরোধী নহে; বরং ইহা গভর্নমেণ্টেরই দ্বারা উদ্ভাবিত। এতদ্ভিন্ন সকল স্বায়ত্ত শাসনেই কতকগুলি ক্ষমতা (যেমন পরিদর্শন ও সাধারণ কর্ত্তৃত্ব) উচ্চতর শাসনতন্ত্র বা গভর্নমেণ্টের হস্তেই থাকে। সহরের যাবতীয় কার্য্যনির্ব্বাহার্থ কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে স্বায়ত্ত শাসন প্রচলিত আছে বলা হয়। ইহার অর্থ এই যে, কলিকাতার

স্বাস্থ্য-রক্ষা প্রভৃতি কার্য্য ভারত গভর্নমেণ্ট বা বেঙ্গল গভর্নমেণ্টের অধীন না হইয়া একটি সমিতির দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। ইহার নাম কলিকাতা কর্পোরেশন; ইহার অধিকাংশ সদস্য সহরের করদাতৃগণের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হয়েন।

স্বায়ত্ত শাসনের অর্থ—'স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন' সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পরবর্ত্তী একটি অধ্যায়ে প্রদত্ত হইবে। এ স্থলে ঐ কথাটির অর্থ কি, এবং স্বায়ত্ত শাসনের উদ্দেশ্য কি, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। স্থানীয় শাসনতন্ত্র এবং স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনতন্ত্র এই দুইটি কথার অর্থ এক নহে। স্থানীয় শাসনতন্ত্র বা গভর্নমেণ্ট অর্থে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা কোনও দেশ বা সাম্রাজ্যের কোনও একটি অংশের শাসন-প্রণালী বুঝায়। কখনও কখনও শাসনকর্ত্তৃগণকেও বুঝায়। স্থানীয় শাসনতন্ত্র স্বায়ত্ত শাসনে পরিণত হইতে পারে, যদি শাসনকর্ত্তৃগণ সকলে বা কিয়দংশে জনসাধারণের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হয়েন। বঙ্গের শাসনতন্ত্রকে স্থানীয় বা প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র বলা যায়, কারণ ইহা কতক পরিমাণে স্বাধীনভাবে বাঙ্গালাদেশ শাসন করিতেছে। সম্প্রতি কাউন্সিলের নির্ব্বাচিত সদস্যগণের মধ্য হইতে মন্ত্রিনিয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছে; সেই পরিমাণে বাঙ্গালার শাসনতন্ত্রকে স্বায়ত্ত শাসন বলিলেও বলিতে পারা যায়। কলিকাতা কর্পোরেশন স্বায়ত্ত শাসনের একটি দৃষ্টান্ত বলা হয়, কারণ ইহার সদস্যগণ জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত এবং ইহার মেয়র ও প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ কর্পোরেশন কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন।

গভর্নমেণ্টের যতগুলি দায়িত্ব আছে, তন্মধ্যে কর ধার্য্য করা ও সরকারী অর্থের ব্যয় নিয়ন্ত্রিত করা একটি গুরুতর কার্য্য।

যে স্থলে স্বায়ত্ত শাসন প্রচলিত আছে, সেখানে জনসাধারণের প্রতিনিধিরা স্থানীয় লোকের নিকট হইতে ট্যাক্স লইতে পারেন এবং স্থানীয় প্রয়োজনে সেই অর্থ ব্যয় করিতে পারেন। অবশ্য কিছু পরিমাণে ইঁহাদিগকে গভর্নমেণ্টের কর্ত্তৃত্ব মানিয়া চলিতে হয়। ইংলণ্ডে এই নীতি বহুদিন হইতে স্বীকৃত হইয়াছে যে, জনগণের প্রতিনিধিরাই কর ধার্য্য করিবার প্রকৃত অধিকারী। সে দেশে লোকের মনের ভাব এই যে, যেখানে সাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি ব্যতীত অন্য কেহ কর ধার্য্য করে. সেখানে স্বাধীনতার কোনও অর্থ নাই। যাহা হউক, ইহা মনে রাখা উচিত যে, এই নীতিটি অতীত বা বর্ত্তমান কালে সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক গৃহীত হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন নীতি প্রজার স্বাধীনতার প্রমাণস্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।

এই নীতিটির বিষয় হিন্দু বা মুসলমান আমলে কেহ বড় চিন্তা করে নাই। ইংরেজ শাসনকর্ত্তৃগণও স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন-নীতি সর্ব্বত্র বিশুদ্ধভাবে প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। সুতরাং এ দেশের স্বায়ত্ত শাসনকে এখনও প্রকৃত প্রস্তাবে স্বায়ত্ত শাসন বলা যায় না। যে সকল উচ্চতর প্রতিষ্ঠানে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে, সে সকল ক্ষেত্রেও গভর্নমেণ্ট কতকগুলি কর্ম্মচারী তাহার মধ্যে রাখিয়া দিয়াছেন ; আরও এমন কতক-গুলি লোককে তাঁহারা পাঠাইয়াছেন, যাঁহারা সম্প্রদায়বিশেষের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি কেহ না থাকায়, হয়ত সেই সেই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে গণ্য হইতেও পারেন। কিন্তু তাঁহারা যখন জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত নহেন, তখন তাঁহাদিগকে প্রকৃত পক্ষে সাধারণের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

স্বায়ত্ত শাসনের প্রসার—এক প্রকার স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল। কিন্তু তাহা গ্রামে বা নিতান্ত সংকীর্ণ স্থানে নিবদ্ধ ছিল। গ্রামের ছোটখাটো বিবাদ-বিসংবাদ স্থানীয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক মীমাংসিত হইত। গ্রামের চৌকীদার বা পুলিসের কার্য্য স্থানীয় লোকের দ্বারা সম্পাদিত হইত এবং তাহারা স্থানীয় লোকের কর্ত্তৃত্বাধীনই থাকিত। পঞ্চায়েতেরা সামাজিক ও আইনঘটিত বিবাদের বিচার করিতেন। কিন্তু ঐ সকল গ্রাম্য শাসন-সমিতি নির্ব্বাচন করিবার যে কোনও নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি বা প্রণালী ছিল, এমন মনে হয় না। 'প্রজার নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি ব্যতীত কেহ কর ধার্য্য করিতে পারিবে না' এই নীতিও স্বীকৃত হইত বলিয়া বোধ হয় না। ইংরেজ শাসন-কর্ত্তারা যে স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহা বিশেষতঃ লর্ড রিপনের পর হইতে অনেক ব্যাপক ও সুসংযত নিয়মের অধীন হইয়াছে। নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি ব্যতীত কর-স্থাপন হইতে পারিবে না বা ঐ প্রকার কোনও সূক্ষ্ম নীতির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

এ দেশের লোক রাজনীতিক অধিকার পাইলে, যাহাতে তাহার সুব্যবহার করিতে শিখেন এবং অধিকতর কার্য্যক্ষম হয়েন, সেই জন্যই এই স্বায়ত্ত শাসন-প্রথা উদ্ভাবিত হইয়াছে। প্রথমতঃ স্থানীয় ব্যাপার সমূহ স্থানীয় অবস্থাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের দ্বারা সুনির্ব্বাহিত হয়। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, এইরূপে উচ্চতর সরকারী কর্ম্মাধ্যক্ষগণের কার্য্যভার লাঘব করা যায়। তৃতীয় উদ্দেশ্য, সাধারণকে ক্রমশঃ স্বায়ত্ত শাসনে দক্ষ হইতে শিক্ষা দান করা হয়। শেষোক্ত উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের সঙ্গে কাজ করিতে

দেওয়া হয়। এখনও সমস্ত জিনিষটাই পরীক্ষাধীন। যেমন যেমন ইহা সফলতা লাভ করিতেছে, তেমনই ইহার আয়তন বিস্তৃত করা হইতেছে এবং পরিপুষ্টি বিধান করা হইতেছে; অর্থাৎ ক্রমেই নূতন নূতন স্থানে স্বায়ত্ত শাসন প্রচলিত হইতেছে, নির্ব্বাচনকারীদিগের সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে এবং নির্ব্বাচন-প্রণালী বিস্তৃত হইতেছে। নূতন নূতন স্বায়ত্ত শাসন-যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং দিন দিন নির্ব্বাচন-নীতির উপকারিতা অধিকতর স্বীকৃত হইতেছে। কলিকাতা, বোম্বাই এবং পাঞ্জাব ব্যতীত আর সকল স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যপদ নির্ব্বাচনের দ্বারা পূরণ করা হইয়া থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভা যে সকল সমিতি গঠন করেন সেই সমিতি, মিউনিসিপ্যালিটীর সমিতি এবং অন্যান্য সাধারণ জনসমবায়ের সমিতিসমূহ নির্ব্বাচনের দ্বারা গঠিত হয়। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক-সভা বা কাউন্সিল এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সভার দুইটি শাখার অধিকাংশ সদস্যই উপযুক্ত ভোটদাতাদিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। গভর্নমেণ্টের এই দৃষ্টান্তে, লোকে স্বকীয় ব্যাপারেও যেখানে যেখানে নির্ব্বাচন-রীতি চলে, সেখানেই এই রীতি প্রয়োগ করিতেছে।

গঠন-প্রণালী অনুসারে স্বায়ত্ত শাসনের তারতম্য হইয়া থাকে। নির্ব্বাচিত সভ্যের সংখ্যার তারতম্য অনুসারে স্বায়ত্ত শাসনের ক্রম ভিন্ন হয়। উর্দ্ধতন কর্ম্মাধ্যক্ষদিগের হস্তে যে পরিমাণ পরিদর্শন ও কর্ত্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা থাকে, তাহা হইতেও স্বায়ত্ত শাসনের ক্রম বুঝিতে পারা যায়। স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন কেন্দ্রীভূত বা মুখ্য শাসনের বিপরীত; অর্থাৎ সমগ্র দেশের শাসনভার যেখানে এক ব্যক্তির বা একটি শাসন-পরিষদের

উপর ন্যস্ত, সেখানে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রসার লাভ করিতে পারে না। সেই জন্য ইংরেজদের ইচ্ছা মুখ্য শাসন-কেন্দ্রকে বহুধা বিন্যস্ত করা; অর্থাৎ শাসন-প্রণালী একই কেন্দ্রে আবদ্ধ না থাকিয়া যদি বহু স্থানে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের প্রতিষ্ঠানে বিভক্ত হয়, তাহা হইলে অধিকতর সফলতা লাভ করে, ইহাই তাঁহাদের ধারণা। এই জন্য তাঁহারা অনেক স্থলে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রদান করিতেছেন। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও কোন একটি অপরীক্ষিত ধারণার বশবর্ত্তী না হইয়া, তাঁহারা ভূয়োদর্শনলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা যাহা ভাল বলিয়া বুঝিতেছেন, তাহাই সতর্কতার সহিত অবলম্বন করিতেছেন। পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য মিষ্টার হব্‌হাউসের সভাপতিত্বে যে শাসন-কেন্দ্র-নিরসন সমিতি বা কমিশন বসিয়াছিল, তাঁহারা শাসন-কেন্দ্রকে সঙ্কুচিত করিবার জন্য অনেক প্রস্তাব পাঠাইয়াছিলেন; ঐ সকল প্রস্তাবের অনেকগুলি কার্য্যে পরিণত হইয়াছে।

শাসন-সংস্কার—স্বায়ত্ত শাসনাবলম্বী প্রতিষ্ঠান সমূহ সাধারণ নিয়মেই বাড়ে, ক্রমশঃ ক্ষুদ্রতর হইতে বৃহত্তর আকারে পরিণত হয়। সেইরূপ স্বায়ত্ত শাসনের ক্ষমতাও ছোটখাটো শাসনব্যাপার হইতে বৃহত্তর শাসনব্যাপারে পরিপুষ্ট হয়। স্বায়ত্ত শাসন স্বল্পপরিসরে কৃতকার্য্যতা লাভ করিলে, গভর্নমেণ্ট আরও বাড়াইয়া দিতে প্রস্তুত হইবেন, এইরূপ আশা করা যায়। জনসাধারণের যোগ্যতা যেমন যেমন বাড়িতেছে, স্বায়ত্ত শাসনও সেই অনুসারে ক্রম-বিস্তার লাভ করিতেছে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে লর্ড রিপনের আমলে একটি মন্তব্য গৃহীত হয়; উহা হইতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্দেশ্য স্পষ্টতঃ জানা

যায়; লোকে যাহাতে স্থানীয় কার্য্যাদি নিজেরা পরিচালন করিতে শিক্ষা করে, তাহাই স্বায়ত্ত শাসনের উদ্দেশ্য। এই শ্রেণীর রাজনীতিক শিক্ষা শাসন-যন্ত্রের কার্য্যকারিতা অপেক্ষাও প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কারের (Reform) একটি মূলসূত্র এই যে, "স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহে যত দূর সম্ভব জনসাধারণের কর্তৃত্ব থাকিবে এবং বাহিরের কোনও কর্তৃত্ব তাহাতে যত না থাকে, ততই ভাল।" ১৯১৮ সালে ভারত গভর্নমেণ্ট একটি মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহাতে কি ভাবে ভারতবর্ষের উন্নতিবিধান হইবে, তাহা লিপিবদ্ধ হয়। লর্ড রিপনের আমলে যে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছিল, তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া নূতন মন্তব্য প্রকাশিত হয়। সেই নূতন মন্তব্যে এই কথা বলা হয় যে, এখন হইতে সরকার পক্ষের অনাবশ্যক কর্তৃত্ব ক্রমশঃ রহিত হইবে এবং কোন্ কোন্ কার্য্যক্ষেত্রে গভর্নমেণ্টের কর্তৃত্ব বাঞ্ছনীয় এবং কোথায়-বা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করা উচিত, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে। এই নীতি বঙ্গদেশে অনুসৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সরকারী সভাপতির স্থলে এক্ষণে বে-সরকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইতেছেন। বে-সরকারী নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের সংখ্যাও দিন দিন বাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। ভারতবর্ষে যে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তদনুসারে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনবিভাগ মন্ত্রীদিগের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। এই মন্ত্রিগণ ব্যবস্থা-পরিষদের নিকট দায়ী। ইহার ফলে বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রায় সমস্ত প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নতি বিধান করিতে উৎসুক হইয়াছেন।

সংস্কারের মূলসূত্র—কিন্তু ভারতবর্ষের রাজনীতিক উন্নতি-সম্পর্কে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ভারতসচিব পরলোকগত মিষ্টার মণ্টেগুর উক্তি। মিষ্টার মণ্টেগু ১৯১৭ সালের ২০শে আগষ্ট তারিখে বলিয়াছিলেন, "বিলাতের গভর্নমেণ্ট ভারত গভর্নমেণ্টের সহিত সম্পূর্ণ একমত হইয়া এই নীতি অবলম্বন করিতেছেন যে, ভারত-শাসনের প্রত্যেক বিভাগে ক্রমেই বেশী সংখ্যক ভারতবাসীকে সংশ্লিষ্ট করা হইবে এবং ক্রমশঃ স্বায়ত্ত শাসনাবলম্বী প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিপুষ্টি সাধন করা হইবে, যাহাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশস্বরূপ থাকিয়া ভারতবর্ষ দায়িত্বপূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনের দিকে ক্রমশঃ অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে।" ১৯১৯ সালে যে 'ভারত গভর্নমেণ্ট আইন' পাস হয়, তাহার ভূমিকায় ইহা স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত হইয়াছে। এই আইন এ দেশে দায়িত্বপূর্ণ শাসন-প্রবর্ত্তনের পথ বাস্তবিকই প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে; কারণ ইহার দ্বারা জনসাধারণের মধ্য হইতে প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের উপর কিয়ৎ পরিমাণে শাসনের কার্য্য ও শাসনদায়িত্ব ন্যস্ত করা হইয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভারতবাসীদিগকে দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত করা হইতেছে। অনেকে মনে করেন যে তাহা যথেষ্ট নহে; এ দেশীয় লোক আরও অধিক সংখ্যায় নিযুক্ত হওয়া উচিত। এক্ষণে ভারতবাসীর মন পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনের পথে দ্রুত অগ্রসর হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়

সামাজিক দুর্নীতি-নিবারণ

অশ্লীল ও নীতিবিগর্হিত কদাচার-নিবারণ—ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কোনও জাতির বা কোনও সম্প্রদায়ের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এবং সামাজিক প্রথাগুলিতে হস্তক্ষেপ করেন না। কিন্তু যে সকল আচার আপত্তিকর বা নীতি-বিরুদ্ধ, সেগুলিকে উপেক্ষা করা চলে না। যাহাতে লোকের প্রাণহানি হইতে পারে, বা শারীরিক কষ্ট ও বৈষয়িক অনিষ্টের কারণ হইতে পারে, এমন কর্ম্মকে 'অপরাধ' বলা যায়। যখনই কোনও প্রথা রহিত করা আবশ্যক বিবেচিত হইয়াছে, তখনই গভর্নমেণ্ট সাবধানে অগ্রসর হইয়াছেন এবং উক্ত প্রথা যে সমাজের মধ্যে প্রচলিত সেই সমাজের মতামত নির্দ্ধারণ করিতে যত্নশীল হইয়াছেন। প্রথমতঃ তাঁহারা ঐ সমাজকেই সতর্ক করিয়াছেন অথবা সামান্য রকম দণ্ড প্রয়োগ করিয়াছেন এবং ঐ সমাজই প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করিয়া লইবে, এই ধারণায় প্রতীক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু যখন সতর্ক করা সত্ত্বে এবং লঘু দণ্ড-প্রয়োগেও সে সমাজের চৈতন্য হয় নাই বা প্রয়োজনীয় সংস্কার করিতে সে সমাজ অপারগ হইয়াছে, তখনই আইনের দ্বারা বা শাসনের দ্বারা সেই প্রথার উন্মূলনে গভর্নমেণ্ট যত্নবান্ হইয়াছে।

সতী—গভর্নমেণ্ট কর্ত্তৃক সমাজসংস্কারের একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত সতীদাহ-নিবারণ। 'সতী' শব্দের অর্থ সাধ্বী স্ত্রী। 'সতী হওয়ার' অর্থ মৃতপতির চিতায় ভস্মীভূত হওয়া। এই প্রথার মূল অজ্ঞাত। শাস্ত্রে বিধি এই যে, বিধবা ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে অথবা সে অনলে জীবনাহুতি দিতে পারে। জীবনাহুতিতে যদি পুণ্য থাকে, তবে তাহা স্বেচ্ছাকৃত হওয়া আবশ্যক। কালক্রমে এই প্রথা দোষে পরিণত হইল; বিধবাগণকে সহমৃতা হইতে বাধ্য করা হইত। পতির মৃত্যু হইলে যখন রমণীগণ শোকে আত্মহারা হইয়া পড়িতেন, হিতাহিত জ্ঞান অথবা বাধা দিবার শক্তি পর্য্যন্ত লোপ পাইত, তখন তাঁহাদিগকে সহমৃতা হইবার জন্য জেদ করা হইত। এমন শুনা যায় যে, কোনও কোনও স্থলে ঔষধপ্রয়োগে জ্ঞান-লোপ করিয়া তাঁহাদিগকে সম্মত করা হইত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যে এই অনিষ্টকর ব্যাপার এত বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, গভর্নমেণ্ট আর উদাসীন থাকিতে পারিলেন না। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লীর শাসন-কালে গভর্নমেণ্ট আপীল আদালতের জজদিগকে অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিলেন যে, "সহমরণ-প্রথা কি পরিমাণে হিন্দুধর্ম্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত। যদি ধর্ম্মের কোনও অনুশাসনের উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে গভর্নর জেনারল আশা করেন যে, এই প্রথা একেবারে না হউক ক্রমশঃ সম্পূর্ণরূপে উঠাইয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু যদি আদালতের নিকট এরূপ বোধ হয় যে, এই প্রথা উঠাইয়া দিলে হিন্দুধর্ম্মে আঘাত করা হইবে এবং সে জন্য এই প্রথা রহিত করা বাঞ্ছনীয় নহে বা সম্ভব

নহে, তাহা হইলে তাঁহারা যেন লক্ষ্য রাখেন যাহাতে অল্পবয়স্কা বিধবাগণকে সহমৃতা হইতে না দেওয়া হয় এবং ঔষধপ্রয়োগ করিয়া কাহাকেও সম্মত না করা হয়।” জজেরা পণ্ডিতগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, শাস্ত্রে বিধবার সহমরণ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে কি না। পণ্ডিতেরা তদুত্তরে বলিলেন যে, সকল বর্ণের রমণীগণই ইচ্ছা করিলে কতকগুলি অবস্থাবিশেষ ভিন্ন সহমৃতা হইতে পারেন। জজেরা গভর্নমেণ্টকে উত্তর দিলেন যে, “অকস্মাৎ এই প্রথার বিলোপসাধন করা উচিত হইবে না; কিন্তু তাঁহারা মনে করেন যে অচিরে উহা ক্রমশঃ উঠাইয়া দিতে হইবে।” তাঁহারা গভর্নমেণ্টকে এরূপ আইন প্রণয়ন করিতে পরামর্শ দিলেন যেন সতীদাহে কোনও বে-আইনী, অসঙ্গত এবং দণ্ডার্হ উপায় অবলম্বিত হইতে না পারে।

১৮১৩ সালে আদেশ হইল যে, “অগ্রে ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা প্রধান পুলিস কর্ম্মচারীকে না জানাইয়া ইংরেজাধিকারে সতীদাহ হইতে পারিবে না। ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুলিস কর্ম্মচারী সংবাদ পাইলে খোঁজ লইবেন যে, যিনি সহমৃতা হইতে চাহেন, তিনি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ঐ কার্য্য করিতেছেন কি না। আরও দেখিবেন যে, ঐ রমণীকে কোনও অজ্ঞানকর বা মত্ততাজনক ঔষধ খাওয়ানো হইয়াছে কি না, তাঁহার বয়স ১৬ বৎসরের ন্যূন কি না এবং তিনি গর্ভবতী কি না।” সতীদাহ পুলিসের সাক্ষাতে ভিন্ন অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে না; পুলিস দেখিবেন যেন ভয়প্রদর্শন বা বলপ্রয়োগের দ্বারা কাহাকেও সহমরণে বাধ্য করা না হয়। কিন্তু এ সকল ব্যবস্থা ফলবতী হইল না। রাজা রামমোহন রায় এই সহমরণ-প্রথার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন

উপস্থিত করিলেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড আমহার্ষ্ট সহমরণ-প্রথা বে-আইনী বলিয়া প্রচার করিলেন। তিনি আরও ব্যবস্থা করিলেন যে, যাঁহারা সহমরণে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিবেন; তাঁহাদের পরিবার-ভুক্ত কেহ কখনও কোম্পানীর চাকুরী পাইবে না; এবং সেই সকল সতী এবং তাঁহাদের স্বামীর সমস্ত সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে।

এ সকল ব্যবস্থাও যথেষ্ট বলিয়া বোধ হইল না। অবশেষে এই কদাচার লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক কর্তৃক উন্মূলিত হইল। তিনি এ দেশে আসিয়াই কতিপয় সরকারী কর্ম্মচারীর নিকটে একখানি পত্র প্রেরণ করেন। সেই পত্রে সহমরণ-প্রথার সম্যক্ উচ্ছেদ-সাধন সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত জিজ্ঞাসা করেন। তাহাদের মতামত পাইয়া তিনি সতীদাহ নিবারণে কৃতসংকল্প হইলেন। অনন্তর সপার্ষদ গভর্নর জেনারল কর্তৃক একটি আইন পাস হইল (Regulation XVII of 1829), তাহাতে স্পষ্ট উল্লিখিত হইল যে, হিন্দু বিধবাকে জীবন্ত দাহ করিলে বা সমাধিস্থ করিলে তাহা সম্পূর্ণ আইন-বিরুদ্ধ এবং ফৌজদারী আদালতে দণ্ডনীয় হইবে।

উক্ত আইনের ভূমিকা প্রণিধান-যোগ্য। উহাতে লিখিত আছে, "সতীদাহ-প্রথা অর্থাৎ হিন্দু বিধবাকে জীবন্ত দাহ করা বা প্রোথিত করা মানব-হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলির একান্ত বিরোধী। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহা কোথায়ও অবশ্যকরণীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই; বরঞ্চ পবিত্রভাবে নির্জ্জনে জীবন যাপন করা হিন্দু বিধবার পক্ষে উপদিষ্ট হইয়াছে। ভারতবর্ষে অধিকাংশ

হিন্দু কর্ত্তৃক এ কথা পালিত হয় না। অনেক বড় বড় জেলায় এ প্রথা প্রচলিত নাই। যে সকল স্থানে সতীদাহ বহুপরিমাণে ঘটে, সে সকল স্থানে এত নিষ্ঠুরতার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, তাহা হিন্দুদিগের নিকটেও অত্যন্ত বীভৎস, অবৈধ ও জঘন্য। এই নিষ্ঠুর প্রথা দমন বা রহিত করিতে গভর্নমেণ্ট যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সফল হয় নাই। এ জন্য সপার্ষদ গভর্নর জেনারল স্থির করিয়াছেন যে, এই সকল কদাচার নিবারণ করিতে হইলে সহমরণ-প্রথা রহিত করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সর্ব্বপ্রথম ও অতি প্রয়োজনীয় মূলসূত্র অবশ্য ইহাই যে, কোনও ধর্ম্মবিধি ন্যায় ও দয়াদাক্ষিণ্যাদি মনুষ্যোচিত শ্রেষ্ঠ গুণের বিরোধী না হইলে, ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর লোক তাহা অবাধে পালন করিতে পারিবে। সেই মূলনীতি হইতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, সপার্ষদ গভর্নর জেনারল সকল অবস্থা বিবেচনাপূর্ব্বক নিম্নলিখিত নিয়মগুলি করিতেছেন। ইহা প্রচারিত হইবার তারিখ হইতে ফোর্ট উইলিয়মের এলাকাভুক্ত সমগ্র দেশে কার্য্যকরী হইবে।” ইহার পরে, সতীদাহের সংবাদ পাইবামাত্র পুলিস ও জমিদারগণের কি কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম প্রদত্ত হইয়াছে; এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন।

বাণ ফোঁড়া—চড়ক পূজায় ‘বাণ ফোঁড়া’ প্রথার নিবারণ সতীদাহের ন্যায় বিখ্যাত না হইলেও, ইহা গভর্নমেণ্টকৃত সমাজসংস্কারের আর একটি দৃষ্টান্ত। প্রতিবৎসর চড়ক পূজার প্রধান তিন দিন যে নিষ্ঠুরতা, বর্ব্বরতা ও অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার ঘটিত, তাহা নিবারণের জন্য ১৮৫৬-৫৭ সালে কলিকাতার

খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারক-সম্মিলন গভর্নমেণ্টের নিকটে একখানি আবেদন-পত্র প্রেরণ করেন। উহাতে তাঁহারা বলেন, "সন্ন্যাসীরা কণ্টক ও উত্থতাগ্র ছুরিকার উপর আপনাদিগকে সজোরে নিক্ষেপ করে। তাহারা তাহাদের বাহু ও জিহ্বা লৌহ-শলাকার দ্বারা বিদ্ধ করে. শরীরের মাংসের অভ্যন্তরে সূত্র প্রবেশ করাইয়া তাহা অপর দিক্ দিয়া টানিয়া বাহির করে, অথবা অনবরত অগ্নির তাপে বর্শা উত্তপ্ত করিয়া তাহাই শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়; অপর কতকগুলি লোক পৃষ্ঠদেশে বাণ ফুঁড়িয়া চড়ক গাছে ঝুলিতে থাকে।" বঙ্গের ছোটলাট সার ফ্রেড্রিক হ্যালিডে বিশেষ বিবেচনা করিয়া এই স্থির করিলেন যে, এই যন্ত্রণা যখন লোকে স্বেচ্ছায় বরণ করে, তখন ইহার প্রতীকার ধর্ম্মপ্রচারক ও শিক্ষকের হস্তে থাকাই ভাল। কোর্ট অব্ ডিরেক্টার্স পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছেন, এ সকল নিষ্ঠুর প্রথা আইনের দ্বারা না হইয়া, নৈতিক প্রভাবের দ্বারা নিবারিত হইলেই ভাল হয়।

সার জন পিটার গ্রাণ্ট যখন বাঙ্গালার ছোটলাট হইলেন, (১৮৫৯-১৮৬২) তখন কলিকাতার খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারক-সম্মিলন ব্যবস্থাপক সভার নিকট আবার ঐ বিষয়ে আবেদন করিয়া পাঠাইলেন। সে আবেদন বিলাতে ভারতসচিবের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। এই প্রথা রহিত করিবার জন্য যে, সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা উচিত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার গভর্নমেণ্ট এই মত পোষণ করিতেন। তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন যে, অতঃপর গভর্নমেণ্ট যে সকল খাসজমি বিলি করিবেন, তাহাতে এমন সর্ত্ত থাকিবে যাহা চড়ক পূজার নিষ্ঠুর অনুষ্ঠানের বিরোধী। তাঁহারা ইহাও প্রস্তাব করিলেন যে, সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের

সহানুভূতি এই দিকে আকর্ষণ করিতে হইবে এবং গভর্নমেণ্ট যে এই সকল বীভৎস দৃশ্য মোটেই পছন্দ করেন না, ইহাও ক্রমশঃ জানাইয়া দিতে হইবে। সার জে. পি. গ্রাণ্ট ডিভিসনের কমিশনার-দিগকে এ সম্বন্ধে রিপোর্ট দাখিল করিতে বলিলেন; তাহা হইতে জানা গেল যে, 'বাণ ফোঁড়া' শুধু বঙ্গে ও উৎকলে প্রচলিত। যে সকল স্থানে এই প্রথা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, সেখানে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে বলিয়া দেওয়া হইল যে, তাঁহারা যেন সকলকে বুঝাইয়া বলিয়া ও জমিদারের সহায়তা লইয়া এরূপ ব্যবস্থা করেন যাহাতে লোকে স্বেচ্ছায় এই প্রথা পরিত্যাগ করে। যে স্থলে চড়ক একটি সাময়িক উৎসব মাত্র, সে স্থলে ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে শান্তি ও শিষ্টতা রক্ষার্থে পুলিস আইনের সাহায্যে, উৎসব বন্ধ করিয়া দিবার ক্ষমতা দেওয়া হইল। এই প্রথা ক্রমেই উঠিয়া যাইতেছে, এরূপ সংবাদ পাওয়া গেল।

১৮৬৪-৬৫ সালে এই বিষয় পুনরায় উত্থাপিত হইল। ১৮৬৫ সালের ১৫ই মার্চ্চ তারিখে বঙ্গের ছোটলাট সার সিসিল বীডন একটি মন্তব্য পাস করিলেন, যাহার ফলে এই নিষ্ঠুর প্রথা নিবারিত হইল। বঙ্গদেশের সমস্ত জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর আদেশ হইল যে, তাঁহারা যেন বাণ ফোঁড়া বা অন্য কোনও আত্মনির্য্যাতন প্রকাশ্য স্থানে না হইতে দেন বা কেহ এই ব্যাপারে সহায়তা করিতে না পারে। কাহারও জমিতে এরূপ ব্যাপার হইতে দেওয়া না হয়, সে বিষয়েও তাঁহারা লক্ষ্য রাখিবেন। যাহারা তাঁহাদের আদেশ অমান্য করিবে, তাহারা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

এই দুইটি সংস্কারের ইতিহাস কৌতূহল-জনক, কারণ ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, গভর্নমেণ্ট সামাজিক ও ধর্ম্ম-সম্পর্কীয় ব্যাপারে

হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক; সমাজ প্রয়োজনীয় সংস্কারসাধন করিতে অসমর্থ, এবং যখন সমাজ তাহার কর্ত্তব্যপালনে অক্ষম, তখন গভর্নমেণ্ট কুপ্রথা দমন করিতে পরাঙ্মুখ নহেন। উভয় স্থলেই অতি প্রয়োজনীয় সংস্কারসাধনে বিলম্ব ঘটিয়াছিল, তাহার কারণ এই যে, গভর্নমেণ্ট সমাজের উপরেই প্রথমতঃ সংস্কারের ভার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সতীদাহের কুপ্রথা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু গভর্নমেণ্টের গোচরে আসিবার পরে সংস্কার হইতে প্রায় পঁচিশ বৎসর লাগিয়াছিল। পারিবারিক, সামাজিক এবং ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করাই গভর্নমেণ্টের প্রসিদ্ধ নীতি; কিন্তু দুর্নীতির প্রশ্রয় না দেওয়াও ইঁহাদের একটি প্রসিদ্ধ নীতি। সহসা কোনও কাজ করা হয় না, বরং যথেষ্ট ধীরতা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যদি দেখা যায় যে, জনসাধারণ কোনও মতেই আপনাদের ভাল করিতে চাহে না, তাহা হইলে সবলের হস্ত হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার জন্য, অত্যাচার ও অবিচার দূর করিবার জন্য এবং প্রজাসাধারণের আপন সমাজের কুপ্রথা হইতে তাহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য গভর্নমেণ্টের শক্তি সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

শিশুহত্যা—ইংরেজদিগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে এ দেশে শিশুহত্যা বেশ চলিতেছিল। রমণীরা তাহাদের নবজাত শিশুসন্তানকে গঙ্গাসাগরে নিক্ষেপ করিত। তাহারা দেবদেবীর নিকট কোনও কামনা করিয়া বা অভীষ্টলাভের মূল্যস্বরূপ এই কার্য্য করিত। পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ এবং রাজপুতানা প্রভৃতি অঞ্চলে কন্যাসন্তান জন্মিবামাত্র তাহাকে হত্যা করিবার প্রথা বিরল ছিল না। কন্যা বড় হইলে বিবাহের

ব্যয় অধিক হইবে, অথবা হয়ত নীচকুলে বিবাহ দিতে হইলে সম্মানের হানি হইবে, এই আশঙ্কায় তাহারা ঐরূপ নিষ্ঠুর কার্য্য করিত। এই অমানুষিক ব্যাপার নিম্নলিখিত উপায়ে রহিত হইয়াছে,—দেশের সাধারণ ফৌজদারী আইন, জন্মমৃত্যুর রেজেষ্টারি জন্য বিশেষ আইন এবং দূষণীয় অনুষ্ঠান সমূহের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের রীতিমত দৃষ্টি।* ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন অনুসারে অভিসন্ধিপূর্ব্বক কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি শিশু কি বৃদ্ধ কাহাকেও হত্যা করিলে নরহত্যার অপরাধ হয় এবং তাহার শাস্তি মৃত্যু অথবা যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন। উক্ত আইনের ব্যাখ্যাস্থলে বিহিত হইয়াছে যে, কোন জীবন্ত শিশুর কোনও অংশ মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হইয়াছে, কিন্তু সে সম্পূর্ণ ভূমিষ্ঠ হয় নাই, বা ভূমিষ্ঠ হইয়া নিঃশ্বাস ফেলে নাই, এমন অবস্থায়ও যদি কেহ তাহার প্রাণহানি করে সে নরহত্যা অপরাধে অপরাধী হইবে। উক্ত আইনে ইহাও বিহিত হইয়াছে যে, যদি দ্বাদশ বর্ষের অনধিক বয়সের কোনও শিশুর পিতা, মাতা বা প্রতিপালক সেই শিশুকে একেবারে পরিত্যাগ করিবার মানসে কোনও স্থানে ফেলিয়া যায়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি অতি কঠোর রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। যদি সেই পরিত্যাগের ফলে শিশুটির প্রাণত্যাগ ঘটে, তাহা হইলে অপরাধী হত্যাপরাধে দণ্ডনীয় হইবে।

এক শ্রেণীর সন্ন্যাসী আছে, যাহারা ধর্ম্মঘটিত ব্যাপারে নরবলি দেওয়া এক সময়ে আবশ্যক মনে করিত; এ জন্য তাহারা স্বহস্তে নরহত্যা করিত অথবা অন্যের দ্বারা নরহত্যা ঘটাইত।

* ইহার বিস্তৃত বিবরণ "প্রাচীর ভারতবর্ষ" পুস্তকে দ্রষ্টব্য, ৩৯৫-৪০৯ পৃষ্ঠা।

এক্ষণে আর তাহা সম্ভব নহে; কারণ কেহ এইরূপ করিলে তাহাকে নরহত্যাকারী বা তাহার সহায়ক রূপে অভিযুক্ত করা হয়। আইনের দ্বারা কোনও অপরাধের মূলোৎপাটন করা না যাইতে পারে;—এখনও হয়ত কোথাও শিশুহত্যা ঘটে এবং নরবলি হয়;—কিন্তু ইহা স্থির যে, প্রকাশ্যভাবে এবং ধর্ম্মের দোহাই দিয়াও এরূপ কার্য্য কেহ এক্ষণে করিতে পারে না। অবশ্য গোপনে এইরূপ অপরাধ করা অসম্ভব নহে; কিন্তু ধরা পড়িলে অপরাধীকে আইন অনুসারে শাস্তি পাইতে হয়।

বিধবা-বিবাহ—অদ্যাপি সামাজিক জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশে হয়ত এমন সকল কুপ্রথা আছে যাহা অত্যন্ত আপত্তিকর এবং আইন অনুসারে দণ্ডযোগ্য; কিন্তু এ কথা সত্য যে, মানবজীবন যে পবিত্র বস্তু অর্থাৎ মানবজীবনের হানি করা যে পাপের কার্য্য ইহা ব্রিটিশ আইনের সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। কেহই কাহারও গায়ে হাত তুলিতে পারে না; রাজাই হউন আর কৃষকই হউক, ব্রাহ্মণ হউন বা অস্পৃশ্যজাতি হউক, আইনের সমদৃষ্টি সকলকেই তুল্যভাবে রক্ষা করে। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট আর এক প্রকার সমাজ-সংস্কার করিতেছেন, যাহার ফলে সামাজিক জীবনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বৰ্দ্ধিত হইতেছে। হিন্দুসমাজ উচ্চবর্ণের মধ্যে বিধবা-বিবাহ অনুমোদন করিত না; অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের কোনও বিধবা সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীন হইলেও এবং আইন অনুসারে কোনও বাধা না থাকিলেও পুনরায় বিবাহ করিতে পারিত না। সেই বিধবা যদি নাবালিকা হয়, তাহা হইলে তাহার অভিভাবক ইচ্ছা করিলেও তাহার বিবাহ দিতে পারিতেন না। বিধবা এবং তাহার অভিভাবকগণের এই যে স্বাধীনতার সঙ্কোচ, ইহা এখন আর

নাই। প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই সংস্কারের জন্য আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। শাস্ত্রে যে কোনও কোনও অবস্থায় বিধবার বিবাহ অনুমোদিত হইয়াছে, তিনি তাহা পুস্তিকা লিখিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন এবং বিধবা-বিবাহের বাধা রহিত করিয়া আইন প্রণয়ন করিবার জন্য গভর্নমেণ্টের নিকট আবেদন করেন। গভর্নমেণ্ট যখন এই সংস্কারের আবশ্যকতা বুঝিতে পারিলেন, তখন তাঁহারা এই বিষয়ে সম্মতি-জ্ঞাপক এক আইন পাস করিতে মনঃস্থ করিলেন। ১৮৫৬ সালে কাউন্সিলের অন্যতম সদস্যরূপে সার জে. পি. গ্রাণ্ট একটি বিল উপস্থাপিত করেন; এই বিল পাস হইলে বিধবা-বিবাহের সমস্ত আইন-ঘটিত প্রতিবন্ধক দূরীভূত হয়। এই বিল "১৮৫৬ সালের পঞ্চদশ সংখ্যক আইন" নামে অভিহিত হয়। এই আইনের প্রথম ধারায় আছে, "একজন স্ত্রীলোক যদি পূর্ব্বে কোন ব্যক্তির সহিত বিবাহিতা বা বাগ্দত্তা হইয়া থাকে এবং পরে যদি সেই ব্যক্তি মারা যায়, তাহা হইলে সে রমণী আবার বিবাহ করিলে, সে বিবাহ অবৈধ হইবে না; এবং সেই বিবাহের কোনও সন্ততি অবৈধ বলিয়া গণ্য হইবে না; হিন্দুশাস্ত্রের কোনও ব্যাখ্যা বা হিন্দুসমাজের কোনও প্রথা যদি ইহার প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে উহা গ্রাহ্য হইবে না।"

বাল্য-বিবাহ-নিবারণ—১৯২৯ খৃষ্টাব্দে বাল্য-বিবাহ নিবারণকল্পে যে আইন পাস হইয়াছে, তাহা গভর্নমেণ্টের সমাজসংস্কার-চেষ্টার আর একটি উদাহরণ। ভারতবর্ষে অনেক জাতির মধ্যে শিশুসন্তানের বিবাহ দিবার প্রথা প্রচলিত আছে। বলা বাহুল্য যে, এই প্রথা সমাজ-জীবনের পক্ষে অত্যন্ত

অনিষ্টকর। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, অতি শৈশবে বিবাহ দিবার ফলে বালবিধবার সংখ্যা বাড়ে। শুধু তাহাই নহে, বাল্য-বিবাহে বালক-বালিকাগণের শারীরিক ও মানসিক অবনতি ঘটে। ইহাতে জাতীয় অবনতির আশঙ্কা আছে। এই সকল অনিষ্ট দূরীকরণের জন্য 'বাল্য-বিবাহ-নিবারণ' আইন হইয়াছে। এই আইন অনুসারে যদি কোনও বালক ১৮ বৎসর ও বালিকা ১৪ বৎসর বয়ঃক্রম অতিক্রম করিবার পূর্ব্বে বিবাহ-সূত্রে বদ্ধ হয়, তাহা হইলে যাহারা সেই বিবাহ সংঘটন করিবে বা তাহাতে সহায়তা করিবে, তাহারা দণ্ডনীয় হইবে। ১৮ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে এমন কোনও ব্যক্তি যদি ১৪ বৎসরের কম বয়সের বালিকাকে বিবাহ করে, তাহা হইলে সে দণ্ডনীয় হইবে। ১৯৩০ সালের ১লা এপ্রিল হইতে সমগ্র ইংরেজ-শাসিত ভারতে এই আইন প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু অনেকে মনে করেন যে, এই আইনের ফল ভাল না হইয়া মন্দ হইবে। পক্ষান্তরে দেখা যায় যে পৃথিবীর সমস্ত সভ্যজাতির মধ্যেই বাল্য-বিবাহ নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এই জন্যই ভারতবর্ষীয় শাসন-পরিষদে সাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের অধিকাংশের মতে এই আইন পাস হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরবিলাস সর্দা এই আইনের পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থা-পরিষদে উপস্থাপিত করেন; সেই জন্য এই আইন 'সর্দা আইন' নামে পরিচিত। যাহাতে এই আইনের সাহায্যে অকারণ মিথ্যা মোকদ্দমা উপস্থাপিত করিয়া কেহ কাহাকেও উৎপীড়িত করিতে না পারে, সে জন্য আইনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, সহরের প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট বা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ব্যতীত

অন্য কেহ বাল্য-বিবাহ-সংক্রান্ত মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন না; অর্থাৎ যে কোনও আদালতে বা থানায় এই শ্রেণীর অভিযোগ উপস্থাপিত করা যাইবে না। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ব্যতীত অন্য কেহ এই সকল মোকদ্দমার তদন্ত করিতে পারিবেন না; অর্থাৎ বাল্য-বিবাহ-ঘটিত ব্যাপারে পুলিসের হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। বিবাহ সংঘটিত হওয়ার এক বৎসর পরে যদি কেহ নালিশ করে, তাহা গ্রাহ্য হইবে না।

ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ—এই জাতীয় সমাজ-সংস্কারের আর একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হিন্দুদিগের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যাহারা এইরূপ দীক্ষিত হইত, তাহারা পৈতৃক কোনও সম্পত্তির ন্যায্য অধিকারী বলিয়া গণ্য হইত না। পূর্ব্বে তাহাদের যে সকল অধিকার ও সম্পত্তি থাকিত, তাহা হইতেও তাহারা বঞ্চিত হইত। এই অযোগ্যতা ১৮৫০ সালের একবিংশ আইনের দ্বারা রহিত হইয়াছে। এই আইনে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে, "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকার মধ্যে যদি এমন কোনও প্রথা বা আইন থাকে যদ্দ্বারা ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ ও জাতিভ্রষ্ট হওয়া হেতু কেহ পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার বা অন্য কোনও সম্পত্তি বা অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়, তাহা অদ্য হইতে রহিত করা গেল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আদালতে বা যে সকল আদালত রাজকীয় সনন্দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে সেই সকল আইন বা প্রথা গ্রাহ্য হইবে না।"

স্ত্রীশিক্ষা—এ দেশে পূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে স্ত্রীশিক্ষা দিবার কোনও দেশীয় ব্যবস্থা ছিল না। এক্ষণে যে স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালী

প্রচলিত তাহা গভর্নমেণ্টের চেষ্টাতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডেল্‌হাউসী বঙ্গীয় শিক্ষা-সমিতিকে লিখিলেন, "অতঃপর স্ত্রীশিক্ষাও তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে।" ইহার কিছু পরেই কতিপয় দেশীয় ভদ্রলোকের চেষ্টায় একটি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ও তাহা গভর্নমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়। ১৮৫৪ সালের সরকারী পত্র অনুসারে নির্দ্দিষ্ট হইল যে, "স্ত্রীশিক্ষা গভর্নমেণ্ট কর্ত্তৃক অকপট ভাবে ও সর্ব্বান্তঃকরণে প্রচলিত হইবে। কারণ পুরুষের শিক্ষা অপেক্ষা স্ত্রীজাতির শিক্ষার দ্বারাই লোকের শিক্ষা ও নীতি বিষয়ে অধিকতর কল্যাণ সাধিত হইবে।" ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের "শিক্ষা-কমিশন" এই পরামর্শ দান করিলেন যে, এ দেশে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে গভর্নমেণ্টের বিশেষ উৎসাহ দান করা এবং বিশেষরূপ অর্থসাহায্য করা কর্ত্তব্য। গভর্নমেণ্ট এই মত গ্রহণ করিলেন। রাজকোষ হইতে বালকদিগের শিক্ষায় যে ভাবে অর্থ ব্যয়িত হয় এবং যে প্রকার সরকারী বন্দোবস্ত হয়, স্ত্রীশিক্ষায় তাহা অপেক্ষাও অধিক অর্থব্যয় এবং সুবন্দোবস্ত হইয়া থাকে।

দুর্নীতি-দমন—এ দেশের সামাজিক কল্যাণের জন্য গভর্নমেণ্ট এমন কতকগুলি আইন পাস করিয়াছেন, যাহাতে অশ্লীলতা ও দুর্নীতির দমন হয়। পুলিস সম্বন্ধীয় নানা বিধি ও ভারতীয় দণ্ডবিধিতে এই সকল আইন পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ জুয়াখেলা, অসংযত আমোদ-প্রমোদের আড্ডা রাখা, প্রকাশ্য স্থলে অশ্লীল ব্যবহার ও অশ্লীল গান করা, অশ্লীল পুস্তক বিক্রয় করা, এবং লোকসমাজের নীতির অন্যান্য গ্লানিকর কার্য্যের

নিবারণ উল্লেখ করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ ইহা বলা যাইতে পারে যে, যে কোনও বাক্য বা কার্য্য লোকের শিষ্টতার ব্যাঘাত জন্মায়, বা যাহাতে লোকের চরিত্র অধঃপতনের দিকে নীত হয়, বা নৈতিক আদর্শ যাহাতে খর্ব্ব হয়, সে সমস্ত নিবারিত হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়

শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্য

লোকশিক্ষা—উদার অর্থে গ্রহণ করিলে 'শিক্ষাদান' ইংলণ্ড ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন বলা যাইতে পারে; শিক্ষাদান ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কামনা। ইংলণ্ড যে সকল কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন, তাহার মধ্যে ইহাই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। যে সকল আইন পাস হইয়াছে এবং যে সকল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য কেবল মানুষকে জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহের উপযোগী করা নহে; পরন্তু নব নব ভাবে ও নব নব পন্থায় ভারতবাসীর জীবন যাহাতে পরিচালিত হইতে পারে, সেইরূপ ভাবে শিক্ষা দেওয়াও একটি মুখ্য উদ্দেশ্য। এ দেশের লোক সেই সকল প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা বুঝিবার পূর্ব্বেই তাহাদের আবির্ভাব হইয়াছে। এক দিকে যেমন তাহাদিগকে নূতন নূতন অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তেমনি আইন, আদালত, স্কুল প্রভৃতির সাহায্যে মানুসের মনে তাহাদের অধিকার সম্বন্ধে পরিস্ফুট ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এগুলির ফলে যেমন নানা উপকার সাধিত হইতেছে, তেমনি সে উপকারের মূল্যও লোকে বুঝিতে পারিতেছে। এক কথায় বলিতে গেলে আইনকানুন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হওয়ায় লোকের মনে নূতন নূতন অভাব জাগিয়া উঠিতেছে এবং নিজ নিজ অধিকার, দায়িত্ব ও সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে সকলেই জ্ঞানলাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

জুরী-প্রথা এ দেশের লোকের বিশেষ কোনও অভাব মোচন করিবার উদ্দেশ্যে অথবা কোনও প্রার্থনা পূরণ করিবার জন্য ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। বিচারতন্ত্রের উৎকর্ষ-সাধন করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না; ভারতবাসীদিগকে নব নব অধিকার প্রদান করিয়া তাহাদের মনে দায়িত্বজ্ঞান সঞ্চার করা এবং সেই দায়িত্ববোধ অনুসারে কর্ত্তব্য পালন করিতে শিক্ষা দেওয়াই ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। ইহার উপকারিতা লোকে এ প্রকার বুঝিতে পারিয়াছে যে, অন্য অন্য জেলায় এই প্রথার প্রবর্ত্তনের জন্য প্রার্থনা করিতেছে। আবার যখন স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন-প্রথা এ দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্বে দেশের লোক এই অধিকার লাভের জন্য বিশেষ কোনও আন্দোলন করে নাই। যে মহান্ উপকার ইহার দ্বারা সাধিত হইল, তাহার মূল্য এ দেশে আগে কেহ জানিত না বলিলেই হয়। কিন্তু গভর্নমেণ্ট বুঝিয়াছিলেন যে, এই প্রতিষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইলে লোকে আরও বেশী করিয়া ইহার উপকারিতা বুঝিতে পারিবে এবং নূতন নূতন অধিকার প্রদান করিলে লোকে নূতন নূতন দায়িত্ব পালন করিতে শিক্ষা করিবে। সুতরাং লোকশিক্ষাই ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য। শাসনকর্ত্তৃগণের উদ্দেশ্য এত বেশী পরিমাণে সফল হইয়াছে যে, স্বায়ত্ত শাসনের যাহাতে বিস্তার ও পরিপুষ্টি হয়, তজ্জন্য সকলেই বিশেষ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। যে সকল অর্থ নৈতিক, নাগরিক ও বৈষয়িক সংস্কারের বিষয় পরবর্ত্তী তিনটি অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে, সে সকলের উদ্দেশ্য অন্য যাহাই হউক, তাহা যে লোকশিক্ষার জন্যই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। শাসনকর্ত্তৃগণের মনে এই কামনাই জাগ্রত রহিয়াছে যে,

ভারতবাসীদিগের সম্মুখে নূতন নূতন আদর্শ স্থাপন করিতে হইবে, নূতন নূতন ভাবের ধারায় ও নূতন নূতন প্রণালীতে জীবন গঠন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে এবং তাহাদের অন্তর্নিহিত শক্তি নানাদিকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। ইংলণ্ড ভারতে যে রাজনীতিক ও সামাজিক সংস্কার করিয়াছেন, লোকশিক্ষা তাহার অপর উদ্দেশ্য। ইংরেজ গভর্নমেণ্ট এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু করিয়াছেন বা করিতে সমর্থ, তাহা ঐ একটি কথা—'লোকশিক্ষা'র দ্বারাই প্রকাশ করা যাইতে পারে। 'লোকের শিক্ষা' অর্থে লোকের উৎকর্ষও বুঝায়।

বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী—এই পরিচ্ছেদে বিদ্যালয়-প্রদত্ত শিক্ষার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এই শিক্ষা যে সকল মূলসূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যে সকল প্রতিষ্ঠানের দ্বারা এই শিক্ষা প্রদত্ত হয়, তাহাও বলা হইয়াছে। বুদ্ধি-বৃত্তি ও সৌন্দর্য্য-প্রবৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে, বুদ্ধি ব্যতিরেকে যে সকল কার্য্য শুধু অভ্যাসের দ্বারা করা যায় তৎসম্বন্ধে, এবং শিক্ষা দিবার পক্ষে কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাও এ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। শিক্ষণীয় বিষয়ানুসারে 'শিক্ষা' এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত হয়,—সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, নৈতিক, শিল্প-সম্বন্ধীয়, ব্যবসায়-সম্বন্ধীয় ও চিত্রকলা-বিষয়ক। পরিমাণের তারতম্য অনুসারে শিক্ষা প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ—এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। শিক্ষাপ্রণালীর বিভিন্ন ক্রম বুঝাইতে ভারতবর্ষে এই সকল নাম ব্যবহৃত হয়। বি. এ. পাস করিবার পরে (post-graduate) যে শিক্ষাপ্রণালী অনুসৃত হয়, তাহার প্রসার দিন দিন বাড়িতেছে এবং

গবেষণা বা সত্যানুসন্ধানের জন্য নূতন নূতন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

প্রাথমিক শিক্ষা—যে সকল বিদ্যালয়ে বর্ণপরিচয় প্রভৃতি অতি সহজ সহজ বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হয়, সেগুলিকে প্রাথমিক বা প্রাইমারী স্কুল বলে। এই সকল বিদ্যালয়ের পাঠ্য ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এক নহে, ইহাদের কার্য্যপ্রণালীও সর্ব্বত্র এক নহে। সেকালের গ্রাম্য পাঠশালা বা মকৃতব হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক উন্নততর স্কুল সমূহে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদত্ত হয়। সুতরাং প্রাইমারী স্কুল সর্ব্বত্র একরূপ নহে। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে প্রাইমারী স্কুলে ছোট ছোট ছেলেদের মাতৃভাষায় লিখিতে ও পড়িতে শেখানো হয়, সহজ সহজ অঙ্ক কষানো হয় এবং যাহাতে দেশীয় রীতির জমাখরচ ও গ্রামের জমিজমার কাগজপত্র বুঝিতে পারে, সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়। বস্তুর সম্বন্ধে যাহাতে ছেলেদের প্রাথমিক জ্ঞানলাভ হয় এবং ভূগোল, কৃষিকার্য্য, স্বাস্থ্যরক্ষা ও ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু কিছু শিখানো হয়, প্রাইমারী স্কুলে সেইরূপ ব্যবস্থা করা হয়। সহরেই এই প্রণালী অনুসৃত হয়। পল্লীগ্রামের স্কুলে পঠনীয় বিষয় আরও সরল। অতি অল্পসংখ্যক প্রাইমারী স্কুল স্বয়ং গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এবং অধিকাংশ প্রাইমারী স্কুল মিউনিসিপালিটী, জেলা বোর্ড বা কোনও ব্যক্তি বা সমিতি কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। বঙ্গে ও ব্রহ্মদেশে অধিকাংশ স্কুল বে-সরকারী লোকের দ্বারা পরিচালিত। ইহার অনেকগুলি সেকালের পাঠশালার মত, কিন্তু বর্ত্তমানে শিক্ষা-বিভাগের বিধান অনুসারে গঠিত ও পরিচালিত। কতকগুলি স্কুল অপেক্ষাকৃত আধুনিক রকমের; এগুলি ভারতীয়

ব্যক্তিবিশেষের যত্নে স্থাপিত হইয়াছে। অন্য কতকগুলি খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকদিগের ভিন্ন ভিন্ন সমিতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কোর্ট অব্ ডিরেক্টার্স্ মাতৃভাষায় জনসাধারণের শিক্ষাবিষয়ে গভর্নমেণ্টের যে বিশেষ দায়িত্ব আছে, তাহা স্বীকার করেন। ভারত গভর্নমেণ্ট সেই দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং উত্তরোত্তর অধিক যত্নসহকারে এই কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন। তথাপি প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি একেবারেই আশানুরূপ হয় নাই।

এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সাধারণের নির্ব্বাচিত মন্ত্রীর প্রতি শিক্ষার ভার অর্পিত হওয়ার ফলে জনমতের সহিত শিক্ষা-বিভাগের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইয়াছে। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে, স্থানীয় লোকের অবস্থার পক্ষে যেরূপ শিক্ষা উপযোগী ও ফলপ্রদ, তাহা বিচার করিবার ভার আজকাল ব্যবস্থাপক-সভার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। যেখানে যেখানে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ মন্ত্রি-স্বরূপে শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, সেখানেই শিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহ দেখা যাইতেছে। জনসাধারণের মধ্যে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা যাহাতে দিন দিন কমিয়া যায়, তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ফল অতি সামান্যই হইয়াছে। ব্রিটিশ ভারতের লোকসংখ্যা প্রায় ২৪ কোটী ৭০ লক্ষ; ইহার মধ্যে মাত্র ৯৩ লক্ষ লোক শিক্ষা পাইতেছে; অর্থাৎ শতকরা ৪ জনেরও কম কোনও রূপ শিক্ষা লাভ করিতেছে। প্রাইমারী স্কুল জাতীয় শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ; কিন্তু প্রাইমারী স্কুলে শতকরা তিন জনেরও কম পাঠ করে। কাজেই নিরক্ষরতা এ দেশে সর্ব্বব্যাপী। ১৯২১

সালের লোক-গণনায় লিখিতে পড়িতে জানে এরূপ লোকের সংখ্যা ছিল ২ কোটী ২৬ লক্ষ; ইহার মধ্যে ১ কোটী ৯৮ লক্ষ পুরুষ ও ২৮ লক্ষ স্ত্রীলোক। ভারতবাসীদিগের নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য বিভিন্ন প্রদেশে আইন পাস করিয়া বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাদানের চেষ্টা হইতেছে।

কিছুদিন পূর্ব্বেও প্রাইমারী স্কুলের পাঠ্য বিষয় সমূহ কেবল সাহিত্যিক শিক্ষার অনুকূল ছিল; কৃষিজীবীদিগের পক্ষে যে সকল বিষয় জানা আবশ্যক, তাহার প্রতি তেমন লক্ষ্য ছিল না। ভারতীয় অনেক শিক্ষানীতিজ্ঞ ব্যক্তি এরূপ একটি শিক্ষার অনুমোদন করেন, যাহা কোনও একটি জীবিকা বা বৃত্তি অবলম্বনে সহায়তা করে। কিন্তু এই ব্যবসায়মূলক শিক্ষাও বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। আমাদের দেশের শিক্ষাপদ্ধতির আগাগোড়া সমস্তই সাহিত্য-প্রধান পাঠ্যবিষয় সমূহে ভারাক্রান্ত; কাজেই প্রাথমিক শিক্ষায়ও তাহার অনিষ্টকর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

মধ্য-শিক্ষা—মধ্যম শ্রেণীর বা সেকেণ্ডারি স্কুলগুলি তিন ভাগে বিভক্ত,—মধ্য বাঙ্গালা স্কুল, মধ্য ইংরেজি স্কুল এবং হাই স্কুল বা উচ্চবিদ্যালয়। মধ্য বাঙ্গালা স্কুলে প্রাথমিক পাঠ্যেরই বিস্তৃতি। মধ্য ইংরেজি স্কুলে ইংরেজি ভাষা পড়ানো হয় এবং ইংরেজির সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। পাঠ্যের ক্রম প্রায় মধ্য বাঙ্গালা বিদ্যালয়েরই অনুরূপ। হাই স্কুলে প্রবেশিকা বা ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত পড়ানো হয়। ঐ সকল স্কুলে সাধারণতঃ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাথমিক শিক্ষা হইতে আরম্ভ করা হয় না। যে সকল ছাত্র অন্য কোথায়ও প্রাথমিক শিক্ষা পাইয়াছে, তাহারা হাই স্কুলের যে শ্রেণীর উপযুক্ত সেই শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে পারে।

প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট অনেক স্থলে অনুভব করিতেছেন যে, ভারতবর্ষে মধ্য বা সেকেণ্ডারি স্কুলের সংখ্যা প্রাইমারী স্কুল অপেক্ষা সন্তোষজনক হইলেও, তাহাদের অনেক গুরুতর ত্রুটী আছে। ভারতবর্ষের অনেক স্থলে মধ্য শিক্ষার আদর্শ নিতান্ত সংকীর্ণ এবং পরিচালনের দোষে সে শিক্ষা অতি হেয়। এই মধ্য শিক্ষার ত্রুটীগুলি 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন' সর্ব্বপ্রথমে দেখাইয়া দেন। এই কমিশন যে রিপোর্ট বা বিবরণ দাখিল করেন, তাহা ভারতীয় শিক্ষাপ্রণালীর ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায়। এখন ইহা সকলেই স্বীকার করেন যে, দেশের অভাব দূর ও আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে হইলে, মধ্য শিক্ষা পুনর্গঠিত হওয়া আবশ্যক। আজকাল সকলেই ক্রমে উপলব্ধি করিতেছেন যে, অধিকাংশ ছেলেরা যখন ম্যাট্রিকুলেশনের বেশী পড়িবার সুযোগ পাইবে না, তখন মধ্য-শিক্ষা সুসংযত ও আত্মনিষ্ঠ বা পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। এইরূপ অবস্থায় কি করিলে ভাল হয়, 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন' তাহাই নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা রিপোর্টে কতকগুলি প্রস্তাব করিয়াছিলেন,—যথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা হইতে মধ্য স্তরের শিক্ষাকে পৃথক্ করিয়া দেওয়া উচিত, মধ্য-শিক্ষা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও আত্মনিষ্ঠ হওয়া উচিত এবং উভয় শ্রেণীর শিক্ষা আপন আপন ক্ষেত্রে নিবদ্ধ থাকিলে ভাল হয়। এই সকল প্রস্তাব ভারতের সমস্ত প্রদেশে কার্য্যে পরিণত হইতেছে। অনেক স্থলে 'সেকেণ্ডারি ও ইণ্টারমিডিয়েট বোর্ড' প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। কোনও কোনও স্থানে ইণ্টারমিডিয়েট কলেজও খোলা হইতেছে।

শিক্ষা—উচ্চশিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের

অনুমোদিত কলেজে প্রদত্ত হইয়া থাকে। ১৮৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের বিশ্ববিদ্যালয়ে. ১৮৮২ সালে গঠিত পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ১৮৮৭ সালে স্থাপিত এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল পরীক্ষা গ্রহণ করিবার রীতি ছিল,—পড়াইবার রীতি ছিল না। শাসনকর্ত্তৃমহলে ও পণ্ডিত-সমাজে ইহা অত্যন্ত অসুবিধাজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। এই জন্য ভারত গভর্নমেণ্ট স্থির করিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ কেবল পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না—শিক্ষা দিবার ভারও ইহাদিগকে লইতে হইবে। এই অভিমত লর্ড কার্জনের ন্যায় প্রধান রাজপুরুষের বক্তৃতায় সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হইয়াছিল। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক উপাধি-বিতরণ-সভায় (Convocation) তিনি বলিয়াছিলেন, "ভারতেই হউক বা অন্যত্রই হউক. আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় কিরূপ হওয়া উচিত? ইহার নাম হইতে যেমন বুঝা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় এমন একটি স্থান হওয়া উচিত যেখানে সকলে সকল রকম জ্ঞান শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকের নিকট হইতে অর্জ্জন করিতে পারে। ছাত্রেরা ইচ্ছা করিলেই সেখানে অধ্যয়ন করিতে পারিবে এবং অভীপ্সিত জ্ঞানলাভ করিয়া, তাহা সার্থক করিতে পারিবে; তথায় জ্ঞানের পরিধি ক্রমেই বিস্তৃত হইবে। রাজনীতি-ক্ষেত্র হইতে লইয়া যদি একটি উপমা ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে আমি বলিব যে, জ্ঞানের কোনও বিজ্ঞান-নির্দ্দিষ্ট 'সীমান্ত' নাই। এই একমাত্র ক্ষেত্র, যেখানে রাজ্যবিস্তার নিন্দনীয় লোভের কার্য্য নহে, পরন্তু মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। তারপরে যে আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা আমি ভাবিতেছি, তাহা কোনও মধ্যস্থলে স্থাপিত হইবে। তাহার গৃহাদি সুপরিসর হইবে, আসবাব ইত্যাদির

অভাব থাকিবে না এবং তাহার ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য প্রচুর স্থায়ী বৃত্তি থাকিবে। এইরূপ হইলে, তবে ইহা শীঘ্রই এমন একটি বেষ্টনী সৃষ্টি করিবে, যাহাতে বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত ও পরিপুষ্ট হইবে, নৈতিক সামঞ্জস্য ও প্রভাব পরিস্ফুট হইবে এবং ভক্তি-শ্রদ্ধার ভাব পরম্পরাগত হইয়া সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীরগাত্রে লতার মত বিরাজ করিবে।" যে আদর্শ এই ওজস্বিনী ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহা পরে ১৯০৪ সালের "ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়" আইনে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। উহার তৃতীয় ধারায় লিখিত আছে, "অন্যান্য উদ্দেশ্যের সঙ্গে ছাত্রগণকে শিক্ষা দান করিবার উদ্দেশ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক (Lecturer) নিযুক্ত করা, ব্যয়নির্ব্বাহার্থ স্থায়ী বৃত্তি গ্রহণ করা, ন্যাস রক্ষা করা ও পরিচালন করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকালয়, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার ও চিত্রশালা নির্ম্মাণ করা, সজ্জিত করা এবং রক্ষা করা, ছাত্রদের বাসস্থান ও চরিত্র সম্বন্ধে নিয়ম গঠন করা এবং অধ্যয়ন ও গবেষণা যাহাতে উৎসাহ প্রাপ্ত হয় বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইনের অবিরোধী ভাবে এরূপ সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত।"

ভারতীয় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই সর্ব্বাগ্রে এই দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়াছিল। সেই সময়ে পরলোকগত মনস্বী সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চান্সেলার ছিলেন। তাঁহার অনন্যসাধারণ শক্তি ও দূরদর্শিতার ফলে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেবল পরীক্ষা-গ্রহণের যন্ত্রস্বরূপ না হইয়া যাহাতে শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে শীঘ্রই চেষ্টা আরব্ধ হইল। ভারত গভর্ণমেন্ট প্রথমে এই উদ্দেশ্য কার্য্যে

পরিণত করিবার পক্ষে সহায়তা করিবেন বলিয়া ইচ্ছা জানাইলেন ; তদনুসারে উচ্চশিক্ষার (post-graduate) উন্নতি সম্বন্ধে একটি বহুব্যয়সাধ্য বন্দোবস্ত করা হইল, যাহাতে সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ে ছাত্রেরা অবাধে অধ্যয়ন ও গবেষণায় নিযুক্ত থাকিতে পারে।

উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়—উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে ভারতে সম্প্রতি যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। সার মাইকেল স্যাড্‌লারের নেতৃত্বে যে 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন' বসিয়াছিল, তাঁহাদের প্রস্তাবের ফলেই এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ; কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, সাধারণ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কয়েকটি কলেজ লইয়া গঠিত ছিল ; তাহার একটি কলেজ হয়ত আর একটি কলেজ হইতে বহু ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই প্রণালীর পরিবর্ত্তে কমিশন বলিলেন যে, ঐক্য-সমন্বিত ও কেন্দ্রীভূত বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হওয়া আবশ্যক। সেই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের নির্দ্দেশ অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-গণ কর্ত্তৃক শিক্ষা প্রদত্ত হইবে। এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, যে সকল বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না, সে সকল বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা হইতে পৃথক্ করিয়া লওয়া আবশ্যক বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। কতকগুলি নূতন ইণ্টার-মিডিয়েট্ কলেজ স্থাপন করাও আবশ্যক হইবে, যাহাতে অধিকাংশ ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ না করিয়াও সন্তোষজনক রূপে শিক্ষা পাইতে পারে। শাসন-সংস্কারের পরে অনেক প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট স্থানীয় অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, কমিশনের অনেকগুলি মন্তব্য কার্য্যে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যুক্তপ্রদেশে লক্ষ্ণৌ ও আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

এলাহাবাদে যে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, তাহা কমিশনের মন্তব্যের অনুকূল ভাবে পুনর্গঠিত হইয়াছে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য এখন দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য। আভ্যন্তরীণ বিভাগকে ঐক্য-সমন্বিত এবং অধ্যাপক ও ছাত্রগণের একত্রাবস্থান-সম্বলিত বিশ্ববিদ্যালয়রূপে পরিণত করা হইয়াছে; বাহ্য অংশ পুরাতন রীতিতে দূরস্থিত কলেজসমূহকে লইয়া গঠিত। এইরূপ দ্বৈত প্রণালীতে কতকগুলি অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। এই জন্য আগ্রায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে বহিঃস্থ কলেজগুলিকে সন্নিবেশিত করিয়া দেওয়া হইবে। ১৯১৫ সালে কাশীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়; ১৯২২ সালের আইনে উহা পুনর্ব্বার অনুমোদিত হইয়াছে। ১৯১৭ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বঙ্গদেশে ১৯২০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনে'র নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারেই উহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অদ্যাপি কমিশনের নির্দ্দেশানুসারে পুনর্গঠিত করা সম্ভবপর হয় নাই, যদিও স্যাড্‌লার-প্রমুখ কমিশন মুখ্যতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার ও পুনর্গঠনের জন্যই নিযুক্ত হইয়াছিল। দিল্লী, রেঙ্গুন ও নাগপুরেও নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। পাঞ্জাব ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে নূতন "অনার্স কোর্স" খোলা হইয়াছে এবং নূতন অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। ১৯২৩ সালে মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় নূতন ভাবে গঠিত হইয়াছে; উহার কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এ স্থলে একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্বভার নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের

উপর ন্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতা, বোম্বাই ও পাঞ্জাব বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা পূর্ব্বে যাহা ছিল সেইরূপ, অর্থাৎ ১৯০৪ সালের আইনের নির্দ্দেশমতই, চলিয়া আসিতেছে। এই সকল স্থানে এখনও সেনেট সভার সদস্যমধ্যে শতকরা ৮০ জন প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হয়েন। তবে একটি সুলক্ষণ দেখা যাইতেছে এই যে, দেশীয় রাজন্যগণও উচ্চশিক্ষার উপকারিতা বুঝিতে পারিতেছেন। ইহার ফলে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় এবং হায়দ্রাবাদে ওস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। সম্প্রতি মান্দ্রাজ অঞ্চলে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; বরোদায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে।

শিল্পশিক্ষা—এ পর্য্যন্ত সাধারণ শিক্ষা-প্রণালীর বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ বিষয় শিক্ষা দিবার জন্যও বিদ্যালয় আছে। শিল্পশিক্ষা (technical education) পূর্ব্বেই গভর্নমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। বঙ্গদেশে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে সার সিসিল বীডন্ ভারত গভর্নমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া শ্রমিকশিল্প-শিক্ষালয়কে একটি সরকারী স্কুলে পরিণত করেন। এই স্কুল শ্রমিকশিল্পোন্নতি-বিধায়ক সমাজ কর্ত্তৃক ১৮৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু এই স্কুল গভর্নমেণ্টের উপরেই নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়াছিল, কাজেই ইহাকে সম্পূর্ণ সরকারী বিদ্যালয়রূপে গ্রহণ করা হইল। যাহাতে এ দেশীয় লোকের রুচি উন্নত হয় এবং সৌন্দর্য্য ও উপকারিতা এই দুয়েতেই প্রকৃত শিল্পের বোধ জন্মে, সেই উদ্দেশ্যে এই শিল্পালয়টি স্থাপিত হয়। এ দেশে নক্সানবিস, ইঞ্জিনিয়ার, প্রস্তরলেখক ইত্যাদির প্রয়োজন হইলে যাহাতে পাওয়া যায়, তাহা করাও এই স্কুলের উদ্দেশ্য ছিল। সার রিচার্ড্ টেম্পল্ যখন

বঙ্গের ছোটলাট তখন ঢাকা, হুগলী, পাটনা এবং কটকে সার্ভে বা জরিপ স্কুল স্থাপিত হওয়ায় শিল্পশিক্ষার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। প্রথমে এ দেশে শিল্পশিক্ষার আদর হয় নাই। যাহা কিছু শিল্পশিক্ষা এ দেশে ছিল, তাহা শিল্পিজাতীয় কারিকরগণ নিজ নিজ সন্তানগণকে শিখাইত। ছুতোর তাহার ছেলেকে ছুতোরের কাজ শিখাইত, ইত্যাদি। প্রণালী-বদ্ধ ভাবে রীতিমত শিল্প বা ব্যবসায় শিক্ষা দিবার কোনও আবশ্যকতা লোকে বুঝিত না। কিন্তু সম্প্রতি এই প্রকারের শিক্ষার আদর হইতেছে এবং শিল্পশিক্ষালয়ের সংখ্যা দ্রুত বাড়িতেছে। ১৯০২ সালে এই বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য এক কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল: তাঁহারা ১১৩টি ব্যবসায়সংক্রান্ত শিল্পশিক্ষালয়ের তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঐ সকলের অধিকাংশই অল্পদিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটি প্রধান শিল্পালয় গভর্নমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত; কতকগুলি মিউনিসিপালিটী ও লোকাল্ বোর্ড কর্ত্তৃক স্থাপিত; অবশিষ্টগুলি মিশনারী-সমাজ অথবা কোনও দানশীল ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরিচালিত। কি উপায়ে এই শিক্ষার উন্নতি হইতে পারে, গভর্নমেণ্ট সম্প্রতি সে বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন। ইতিমধ্যেই যে সকল ছাত্র এ বিদ্যায় কতকদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহাদের কয়েকজনকে ইয়ুরোপ কিংবা আমেরিকায় শিল্পশিক্ষার্থ পাঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও ঐরূপ সুযোগ দিয়া থাকেন। গভর্নমেণ্ট কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতায় একটি উচ্চশ্রেণীর শ্রমশিল্পবিজ্ঞান-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ—ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সমূহে উচ্চতর ও বিজ্ঞান-সম্মত শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। মান্দ্রাজ,

বোম্বাই, বাঙ্গালা ও যুক্তপ্রদেশে এইরূপ কলেজ আছে। যুক্ত-প্রদেশের রুরূকী কলেজ ও শিবপুর এবং পুনার কলেজই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। কাশীতে সম্প্রতি যে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইয়াছে, তাহাতে যন্ত্রশিল্প ও তাড়িত সংক্রান্ত ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বোম্বাই সহরে "ভিক্টোরিয়া জুবিলি শিল্পশিক্ষালয়ে" ইঞ্জিনিয়ার, যন্ত্রব্যবহারবিৎ এবং নক্সাপ্রস্তুতকারীদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কমিশন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট এই শিল্পশিক্ষার প্রসার সমর্থন করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সকল মন্তব্য কর্ত্তৃপক্ষগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে।

চিকিৎসা—কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, লক্ষ্নৌ, লাহোর, পাটনা ও দিল্লী নগরে প্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল কলেজে ও অন্যান্য মেডিক্যাল স্কুলে চিকিৎসা-বিদ্যা শিখানো হয়। এ সকল বিদ্যা-লয়ের অধিকাংশই সরকারী। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ ১৮৪৫ সালে এবং মান্দ্রাজ মেডিক্যাল কলেজ ১৮৬০ সালে স্থাপিত হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় 'স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন্' নামে একটি চিকিৎসা বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে।

ধর্ম্মঘটিত কুসংস্কারের জন্য ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি এ দেশের লোকের মনে বিদ্বেষ-ভাব ছিল। কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজের যে ছাত্র সর্ব্বপ্রথমে শবব্যবচ্ছেদ করেন, তিনি অত্যন্ত সাহসের কাজ করিয়াছেন বলিয়া লোকে মনে করিত। ঐ কলেজে ছাত্রগণকে আকৃষ্ট করিবার জন্য বৃত্তি দিতে হইয়াছিল। সম্প্রতি অনেক বে-সরকারী মেডিকাল স্কুল, কলেজ ও হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়া চিকিৎসাবিদ্যা-শিক্ষার অনেক

সুবিধা করিয়া দিয়াছে। ১৯১৭ সালে বেলগেছিয়ায় কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

আইন-শিক্ষা—ভারতের প্রায় সমস্ত প্রদেশে আইন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আইন-শিক্ষার সুবিধা হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চান্সেলার পরলোকগত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে ও পরিশ্রমে কলিকাতায় একটি বড় আইন কলেজ স্থাপিত হয়। প্রায় ১,৬০০ ছাত্র এই কলেজে অধ্যয়ন করে। এই কলেজের সংলগ্ন সুবৃহৎ ও সুসজ্জিত হার্ডিং হষ্টেল নামে ছাত্রাবাস ভূতপূর্ব্ব বিচক্ষণ ও জনপ্রিয় চান্সেলার লর্ড হার্ডিংএর নামে প্রতিষ্ঠিত।

নর্ম্মাল স্কুল—শিক্ষকদিগের শিক্ষার জন্য যে সকল নর্ম্মাল কলেজ ও স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, তাহার কেবল উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। ইহার সবগুলিই সরকারী।

আজকাল বাণিজ্য সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিবার জন্য যে সকল স্কুল বা শ্রেণী খোলা হইতেছে, তাহারও উল্লেখ করা যাইতে পারে। শেষোক্ত শ্রেণীর বিদ্যালয় বোম্বাই অঞ্চলেই অধিক উন্নতি করিয়াছে, কিন্তু বঙ্গদেশেও কিছু কিছু উন্নতি দেখা যাইতেছে।

কৃষিবিদ্যা—কৃষিবিদ্যা শিখাইবার জন্য মান্দ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে কলেজ বা কলেজের শাখা স্থাপিত হইয়াছে; পূর্ব্বে কলিকাতার নিকটে শিবপুরে কৃষিবিদ্যা অধ্যয়ন করিবার জন্য শ্রেণী ছিল। কিন্তু এক্ষণে তাহার স্থলে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত দ্বারভাঙ্গা জেলায় পুষা নামক স্থানে সমগ্র ভারতের জন্য একটি মুখ্য কৃষি-কলেজ স্থাপিত হইয়াছে; ইহার সঙ্গে গবেষণার জন্য শিক্ষাগার এবং কৃষি-পরীক্ষার্থ এবং গবাদি

পশুর উৎকর্ষের জন্য একটি কৃষিক্ষেত্রও স্থাপিত হইয়াছে।* ভাগলপুর জেলায় সাবোরে একটি কৃষি-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে খয়রার কুমার গুরুপ্রসাদ সিংহ-প্রদত্ত অর্থে একজন কৃষিসম্বন্ধীয় অধ্যাপকের পদ সৃষ্ট হইয়াছে।

আর্ট স্কুল—শিল্পকলা সম্বন্ধে প্রত্যেক জাতির ভিন্ন ভিন্ন রুচি এবং নিজস্ব কলাকৌশলের নিদর্শন বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। সব দেশের বিজ্ঞান একই, কিন্তু প্রত্যেক জাতির শিল্পকলা স্বতন্ত্র। কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই এবং লাহোরের সবগুলি আর্ট স্কুল বা শিল্পকলাবিদ্যালয় গভর্নমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত। মান্দ্রাজের স্কুল ১৮৫০ সালে, কলিকাতার স্কুল ১৮৫৪ সালে, এবং বোম্বাইয়ের স্কুল ১৮৫৭ সালে খোলা হয়। বে-সরকারী আর্ট স্কুলও স্থাপিত হইয়াছে; ঐ সকল স্কুল গভর্নমেণ্ট এবং সাধারণের নিকট হইতে অর্থসাহায্য প্রাপ্ত হয়।

পুস্তকাগার—স্কুল কলেজ ব্যতিরেকেও এমন সকল পুস্তকাগার ও চিত্রশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যাহাতে বিদ্যাশিক্ষা ও সত্যানুসন্ধানের প্রকৃষ্ট সুযোগ পাওয়া যায়। কলিকাতার "ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী" একটি সরকারী পুস্তকাগার। অনেক সরকারী কলেজে ভাল ভাল পুস্তকাগার আছে। যে সকল বিদ্বৎসমাজে পুস্তকাগার আছে, তাহার কতকগুলি সরকার হইতে বৃত্তি পাইয়া থাকে। যে সকল পুস্তকাগারে পুরাতন ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সংগৃহীত ও সুবিন্যস্ত হয়, তাহারও অনেকগুলিতে সরকারী বৃত্তি দেওয়া হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারবঙ্গ পুস্তকাগার

* ইম্পিরিয়াল গেজেটীয়ার, চতুর্থ খণ্ড, ৪৪০ পৃষ্ঠা।

দ্রুত বাড়িয়া উঠিতেছে; সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহার উপকারিতা এবং প্রাধান্যও বাড়িতেছে।

মিউজিয়ম—কলিকাতার "বস্তুজাত-প্রদর্শনাগার" (Economic Museum) ছোটলাট সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এ দেশের যাবতীয় দ্রব্যজাতের সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞানলাভ করা একান্ত আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে তিনি এই দেশে উৎপন্ন সমস্ত বস্তুর একটি বিবরণ সংগ্রহ করিবার কল্পনা করেন। প্রথমতঃ তিনি মনে করিলেন যে, এমন একটি স্থান থাকা উচিত, যেখানে শিল্পজাত, উদ্ভিদাদি এবং এ দেশের উৎপন্ন অন্যান্য বস্তুর নমুনা রক্ষিত হইতে পারে এবং সর্ব্বসাধারণে তাহা দেখিতে পায়। 'বস্তুজাত-প্রদর্শনাগার' সেইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিল। এক্ষণে ইহা যাদুঘরের সংলগ্ন আছে; এই স্থানে মৌলিক উপাদান এবং শিল্পজাত দ্রব্যনিচয় সংগৃহীত এবং শ্রেণী-বিন্যস্ত হয়। লক্ষ্ণৌ ও বোম্বাই নগরে 'বস্তুজাত-প্রদর্শনাগার' আছে। উদ্ভিদ্-উদ্যান ও পশুশালা হইতেও অনেক শিক্ষালাভ হয়।

শিক্ষায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আদর্শ—শিক্ষা-সংক্রান্ত কার্য্য এত দ্রুত অগ্রসর হইতেছে যে, ইহার সংখ্যা-সম্বলিত বিস্তৃত বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। কেন না কোনও এক সময়ে যতগুলি স্কুল কলেজ আছে, ছয় মাস পরে তাহার সংখ্যা বদলাইয়া যাইতেছে। কেবল যে স্কুল কলেজগুলি সংখ্যায় বাড়িতেছে, অথবা তাহার সংস্কার হইতেছে, অথবা শিক্ষার পরিধি বিস্তৃত হইতেছে, তাহা নহে; মানসিক শক্তিনিচয়ের যাহাতে সম্যক্ স্ফুরণ হয়, সে পক্ষেও বহু চেষ্টা হইতেছে। ভারতে ইংরেজ যে লোকশিক্ষার কার্য্য করিতেছেন, তাহার মূলসূত্রগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে

পারা একান্ত আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইংরেজ শাসনের প্রথমাবস্থায় প্রাচ্য শিক্ষাপ্রণালী শুধু যে অনুসৃত হইয়াছিল তাহা নহে, পরন্তু উহা যাহাতে উৎসাহ প্রাপ্ত হয় ও উন্নতি লাভ করে, সে চেষ্টাও হইয়াছিল। কিছু দিনের মধ্যেই লোকের মনে সন্দেহ হইতে লাগিল যে, ঐ প্রণালীর দ্বারা লোকের জ্ঞানস্পৃহা পরিতৃপ্ত হইতে পারে কি না এবং উহাতে আধুনিক আদর্শানুযায়ী সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের শিক্ষা হইতে পারে কি না। ইহা লইয়া বাদ-বিতণ্ডা হইতে লাগিল এবং দুইটি দলের উদ্ভব হইল। এ কথা সকলেই স্বীকার করিলেন যে, মাতৃভাষায় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আরও বিস্তৃত হওয়া উচিত। কিন্তু 'প্রাচ্য' দল বলিলেন যে, এই শিক্ষাকে পূর্ণাবয়ব করিতে হইলে, দেশীয় প্রাচীন ভাষাগুলির অনুশীলন অপরিহার্য্য; কারণ দেশীয় সমস্ত বিধিব্যবস্থা, সাহিত্য ও ধর্ম্ম ঐ প্রাচীন ভাষার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। 'ইংরেজি' দল বলিলেন যে, উচ্চশিক্ষা ইংরেজির সাহায্যেই প্রদত্ত হওয়া উচিত; কারণ ইংরেজি ভাষার অনেক গুণ ত আছেই, তদ্ভিন্ন এই ভাষা এ দেশের লোকের নিকট পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবে। এই দলের মধ্যে ভারতীয় সমাজের অনেক নেতা ছিলেন এবং ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। শেষে ইংরেজি ভাষার পক্ষপাতীরাই জয়লাভ করিলেন। ব্যবস্থা-পরিষদের আইন-সদস্য এবং শিক্ষাপরিষদের অন্যতম সভ্য লর্ড মেকলে সবিশেষ দক্ষতা ও দৃঢ়তার সহিত এই পক্ষের সমর্থন করিয়াছিলেন বলিয়াই প্রধানতঃ 'ইংরেজি' পক্ষের জয় হইয়াছিল। ১৮৩৫ সালে মেকলে যে প্রসিদ্ধ বিবরণ দাখিল করেন

তদন্তর্গত অভিমতসকল অনুমোদন করিয়া লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক কিছু দিন পরে এক মন্তব্য প্রকাশিত করেন। ঐ মন্তব্যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাই সমর্থিত হয়। এই মন্তব্যের ফলে অদ্যাপি ইংরেজি শিক্ষা এ দেশের লোকের জীবনে ও চিন্তায় অভাবনীয় পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে। যাহারা ইংরেজি শিক্ষা পাইতেছে, শুধু যে তাহাদের মধ্যে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহা নহে; তাহাদের প্রভাবে অধিকাংশ ভারতবাসীর জীবনেও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। ইংরেজি শিক্ষার ফলে ভারতবাসিগণের চিত্ত সমুন্নত পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সংস্পর্শে আসিয়াছে এবং এক অভিনব প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিয়াছে। ইহাতে যে, শুধু মনের বিকাশ সাধিত হইয়াছে, তাহা নহে; ইহা জ্ঞানোন্নতি ও রাজনীতিক অধিকার সম্বন্ধেও নূতন নূতন আশার সঞ্চার করিয়াছে। সমস্ত শিক্ষাপ্রণালীতেই মাতৃভাষার স্থান স্বীকৃত হইয়াছে; ইহাতে তাহার ন্যায্য অধিকার অপেক্ষা অতিরিক্ত কিছু স্বীকার করা হয় নাই। বি. এ. পরীক্ষার পূর্ব্বে ও পরে মাতৃভাষার রীতিমত অধ্যয়ন ব্যবস্থিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গভাষার একটি অধ্যাপক পদের প্রতিষ্ঠা এবং ভারতীয় ভাষাসমূহে এম্. এ. পরীক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

১৮৫৪ সালের সরকারী পত্র (Despatch)—দেশের নানাস্থানে গভর্নমেণ্ট, খৃষ্টান মিশনারী এবং শিক্ষিত ভারতবাসী কর্ত্তৃক স্কুল কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শিক্ষার উন্নতি তেমন দ্রুত হয় নাই। ১৮৫৪ সালে ইহা নূতন প্রেরণা লাভ করিল। সার চার্লস্ উড্—পরে লর্ড হ্যালিফাক্স নামে খ্যাত—যখন উচ্চতম শাসন-সভার (Board of

Control) সভাপতি ছিলেন, তখন কোর্ট অব্ ডিরেক্টার্স্ স্থির করিলেন যে, ভারতে লোকের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার যাহাতে বিস্তার হয়, তৎপক্ষে গভর্নমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে ও অধিকতর পরিমাণে অর্থসাহায্য করিবেন। তাঁহারা সপার্ষদ গভর্নর জেনারলের নিকট এই মর্ম্মে একখানি প্রসিদ্ধ সরকারী পত্র প্রেরণ করেন। ঐ পত্রে সংক্ষিপ্তভাবে এই দেশের লোকশিক্ষা-প্রণালী ও তাহা কি পরিমাণে সরকার হইতে অর্থসাহায্য পাইবে অথবা সম্পূর্ণ সরকারের অর্থে পরিচালিত হইবে এবং তাহাতে সরকারের কর্ত্তৃত্ব কি ভাবে থাকিবে, এই সমস্ত বিষয় উল্লিখিত হইয়াছিল। পরে ১৮৫৯ সালে এ দেশের শাসনভার ইংলণ্ডের রাণী গ্রহণ করিবার পরবৎসরে ঐ নীতি পুনর্ব্বার অনুমোদিত হয়। এখনও শিক্ষা সম্বন্ধে ঐ নীতি অনুসারেই গভর্নমেণ্ট চালিত হইয়া থাকেন। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ইহাও ঐ সরকারী পত্রে উল্লিখিত হইয়াছিল যে, প্রত্যেক প্রদেশে একটি সাধারণ-শিক্ষাবিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং প্রত্যেক প্রেসিডেন্সীর রাজধানীতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে।

অতি প্রাথমিক শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতম শিক্ষার অধিকার যে সর্ব্বজাতি, সর্ব্বশ্রেণী ও সর্ব্বসম্প্রদায়ের লোকের নিকট উন্মুক্ত হইয়াছে, এরূপ ঘটনা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই প্রথম। হিন্দুদিগের মধ্যে যে প্রথা পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল, তদনুসারে টোলের শিক্ষায় কেবল উচ্চবর্ণেরই অধিকার ছিল। মুসলমানদের স্কুলে হিন্দুদের যাইবার কোনও বাধা ছিল না বটে, কিন্তু বোধ হয় হিন্দুরা এরূপ স্কুলে যাওয়া পছন্দ করিত না। বিশেষতঃ মুসলমান-দের উচ্চশিক্ষায় ধর্ম্মের প্রসঙ্গ থাকিত; সুতরাং উহা যে কেবল

মুসলমানদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, ইহা নিশ্চিত। ব্রিটিশ আমলেই স্কুল কলেজে জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম ও পদমর্য্যাদা-নির্ব্বিশেষে সকলেরই সমান প্রবেশাধিকার হইয়াছে। আইনে যেরূপ, সেইরূপ শিক্ষায় সাম্যনীতি স্বীকৃত হইয়াছে। এই নীতির ফলে শুধু যে সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে, তাহা নহে,—সমগ্র ভারতবাসীর চিন্তা ও মনোভাব পরোক্ষভাবে বহু পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছে।

শ্রেণী-বিশেষের জন্য বিদ্যালয়—সকলের জন্য যে সকল কলেজ ও স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, তাহা ছাড়া বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর লোকের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে। যেমন নীচজাতীয় বালকবালিকার শিক্ষার জন্য বিশেষ স্কুল আছে। এই সকল স্কুল বেশীর ভাগ খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্ম্মের প্রচারক প্রভৃতি বে-সরকারী লোক কর্ত্তৃক স্থাপিত, কিন্তু সরকার হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছে। দেশীয় রাজাদিগের বংশধরগণের জন্য সরকারী যে সকল কলেজ স্থাপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আজমীর, রাজকোট এবং লাহোর 'রাজকুমার কলেজ'ই প্রধান। এই সকল কলেজের উদ্দেশ্য এই যে, রাজপুত্র ও উচ্চ-বংশের ছেলেদের এরূপভাবে শিক্ষা হওয়া উচিত, যাহাতে পরে তাহারা তাহাদের উচ্চপদের উপযুক্ত হইতে পারে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা—গভর্নমেণ্ট সাধারণ-ভাবে উদারনীতি অবলম্বন করিয়া এবং স্কুল কলেজের দ্বার সর্ব্বজাতি ও সর্ব্বধর্ম্মের লোকের পক্ষে উন্মুক্ত করিয়া দিয়া বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা করিতে পারিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই নিরপেক্ষ নীতি ১৮৫৪ সালে প্রেরিত সরকারী পত্রে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছিল। বে-সরকারী স্কুল কলেজের

কর্ত্তৃপক্ষগণ যে কোনও ধর্ম্ম-সংসৃষ্ট শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন, তাহাই অবাধে দিতে পারেন; কিন্তু সরকারী স্কুল কলেজে ধর্ম্মসংক্রান্ত কোন শিক্ষাই দেওয়া হয় না। সম্প্রতি প্রস্তাব হইয়াছে যে, নৈতিক শিক্ষার সহায়তার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় যাহাতে নিজ নিজ ধর্ম্মসংক্রান্ত শিক্ষা দিতে পারেন, সে বিষয়ে বন্দোবস্ত করা হইবে।

এ দেশে শিক্ষাবিস্তার-সম্বন্ধে, অথবা ভারতবাসীদের মানসিক উৎকর্ষ বিধান করিবার জন্য গভর্নমেণ্ট যেরূপ বহু প্রকারের ও বহু বিস্তারিত ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা প্রশংসার্হ। এই কথা লর্ড হার্ডিংএর শাসনকালে শিক্ষাসংক্রান্ত একটি মন্তব্যে সুন্দররূপে প্রকটিত হইয়াছিল। বিদ্যালয় সমূহে যে শিক্ষা প্রদত্ত হয় (অর্থাৎ প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ শিক্ষা, যাহা ইংরেজি ভাষা এবং মাতৃভাষার সাহায্যে প্রদত্ত হইয়া থাকে) তাহার অধিকাংশ গভর্নমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত। তাঁহারা অনেকগুলি ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। গভর্নমেণ্টের নিজের ত স্কুল কলেজ আছেই, তাহা ব্যতীত তাঁহারা অনেক বিদ্যালয়ে সাহায্য দান করিয়া থাকেন। বিশেষ প্রকারের শিক্ষার ভারও গভর্নমেণ্টকে বহন করিতে হয়; যে সকল শ্রমিক, শিল্প-সম্বন্ধীয় এবং বৈজ্ঞানিক বিদ্যালয় আছে, তাহার ভার গভর্নমেণ্ট স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষার ভারও বেশীর ভাগে তাঁহাদের প্রতি ন্যস্ত। বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর শিক্ষা সম্বন্ধেও তাঁহাদিগকে দেখিতে হয়—যেমন একদিকে অসভ্য ও নীচজাতীয় লোকের শিক্ষা, অপরদিকে সম্ভ্রান্তবংশীয় সন্তান ও রাজকুমারদের শিক্ষা। তাঁহাদেরই যত্নে ও উৎসাহে নানা বিদ্বৎসমাজের জন্ম হইয়াছে এবং নানা স্থলে পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছে। গভর্নমেণ্ট মিউজিয়ম বা চিত্রশালা স্থাপন করেন ও তাহার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। ভবিষ্যৎ শাসনকর্ত্তৃগণের অবগতির জন্য, ও দেশের ইতিহাস-সঙ্কলন বিষয়ে সুবিধার জন্য, গভর্নমেণ্ট দলিলাদি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সযত্নে রক্ষা করিয়া থাকেন। ভাল ভাল গ্রন্থকারকে উৎসাহ দিবার জন্য গভর্নমেণ্ট অনেক সময়ে তাঁহাদের রচিত কয়েকখানা করিয়া পুস্তক ক্রয় করিয়া থাকেন যাহাতে নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে সত্যানুসন্ধান বা গবেষণার সুযোগ ঘটে, এ জন্য গভর্নমেণ্ট নিজ হইতে কতকগুলি প্রতিষ্ঠান চালাইবার ভার লইয়াছেন; এতদ্ব্যতীত তাঁহারা অনেক বে-সরকারী গবেষণা-সমিতিকে বা ঐরূপ কার্য্যে ব্রতী ব্যক্তি-বিশেষকে সাহায্য ও উৎসাহ দান করিয়া থাকেন। প্রয়োজন হইলে, তাঁহারা ঐ প্রকারের বিশেষ কার্য্যে তাঁহাদের কর্ম্মচারীদিগকেও নিযুক্ত করিয়া থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ যাহাতে গবেষণায় ব্রতী হইতে পারে, সেইরূপ অনুমতি ও সাহায্য দিতেও তাঁহারা ক্রটা করেন না। সিমলার নিকটে কসৌলী নামক স্থানে যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার স্থাপিত হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য সত্যানুসন্ধান বা গবেষণা। ঐরূপ উদ্দেশ্যে কলিকাতায় 'স্কুল অব্ ট্রপিক্যাল মেডিসিন্' নামে একটি চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। পরে যে সকল বৈজ্ঞানিক পরিদর্শন বা পরিমাপের বিষয় কথিত হইবে, সে সকলও গবেষণামূলক। সময়ে সময়ে যে লোকগণনা হয়, তাহাও এই বিষয়ের অন্তর্গত।

বহু প্রাচীন কাল হইতে খৃষ্টান ধর্ম্ম-প্রচারকগণ স্কুল ও গ্রন্থাগার-স্থাপন, পাঠ্যপুস্তক-প্রণয়ন এবং ইংরেজিতে ও মাতৃভাষায় অন্য সাহিত্যের প্রচার-বিষয়ে অনেক মূল্যবান্ কার্য্য করিয়াছেন। আধুনিক কালে এই ভার অনেক বে-সরকারী লোক ও সমিতি

বহন করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বোম্বাইয়ের মিঃ প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, বাবু গুরুপ্রসন্ন ঘোষ, সার তারকনাথ পালিত, সার রাসবিহারী ঘোষ, সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, খয়রার কুমার গুরুপ্রসাদ সিং এবং বোম্বায়ের টাটাগণের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অর্থনৈতিক উন্নতি

কৃষিকার্য্য—কৃষিকর্ম্ম বহুদিন হইতে ভারতের প্রধান ব্যবসায় বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। অধুনা যে সকল দ্রব্যের চাষ হয়, তন্মধ্যে এইগুলি প্রধান, যথা—চাউল, গম, চীনা, ভুট্টা, যব, যই, কলাই, সরিষা, তিল, ইক্ষু, খেজুর, তুলা, পাট, নীল, আফিম, তামাক, তুঁত, চা, কফি, সিনকোনা প্রভৃতি। অন্যান্য জিনিষ অপেক্ষা চাউলই অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। নিম্ন ব্রহ্মের ও বঙ্গদেশের 'ব'-দ্বীপ, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরীর 'ব'-দ্বীপ, সমুদ্রকূলের দীর্ঘ ও অপ্রশস্ত ভূখণ্ডগুলি, ত্রিবাঙ্কুর, মালাবার, কানাড়া, কোঙ্কন প্রভৃতি অন্য স্থানসমূহ সর্ব্বপ্রকারে ধান্যের চাষের পক্ষে উপযোগী। এই সকল প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মে। ভারতবর্ষের অবশিষ্ট অংশে ধান্যের চাষ বিরল অথবা অন্যান্য জিনিষের তুলনায় কম। আসাম ব্যতীত অন্যান্য আভ্যন্তরীণ প্রদেশে ধান্যের পরিবর্ত্তে চীনার চাষ করা হয়। সার উইলিয়ম হাণ্টার লিখিয়াছেন, "সমগ্র ভারতের কথা ধরিতে গেলে, দেশের মুখ্য খাদ্য-শস্য ধান্যও নয় গমও নয়, চীনা বা জোয়ার এ কথা সাধারণ ভাবে বলা যাইতে পারে।"

পাট—ভারতে যে পাট হয়, তাহার প্রায় সমস্তই উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে জন্মে। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা নদীর 'ব'-দ্বীপ-সমূহেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাট হয়। পাটের চাষ ও পাটের ব্যবসায়ের

উন্নতি ইংরেজ শাসনেরই ফল। ইংরেজ বণিক্‌দের শস্যের, বিশেষতঃ গমের ব্যবসায় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হওয়ায়, থলিয়ার প্রয়োজন হয় এবং এই প্রয়োজন হইতেই পাটের চাষ প্রবর্ত্তিত হয়।* পাটের চাষ হইতে লাভ অধিক হইতেছে দেখিয়া ক্রমেই অধিক পরিমাণ জমিতে পাট বোনা হইতেছে; ধানের চাষ কমিয়া আসিতেছে।

রেশম—ভারতবর্ষে গুটিপোকার চাষ বহু পূর্ব্বকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু তুঁতগাছ যে ভারতবর্ষে পূর্ব্বে জন্মিত না এবং গুটিপোকা যে ভারতবর্ষে পূর্ব্বে পাওয়া যাইত না, ইহা একরূপ নিশ্চিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন বঙ্গদেশে ব্যবসায় খুলিয়া দিলেন, তখন তাঁহারা দেখিলেন যে রেশমের ব্যবসায় ক্রমেই অবনতির দিকে যাইতেছে। তাঁহারা এই ব্যবসায়টিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশেই তুঁতের চাষ বেশী হইত বলিয়া তাঁহারা এখানেই কয়েকটি স্থানে কুঠি নির্ম্মাণ করিয়া প্রত্যেকটিতে অনেকগুলি রেশমের সূতা-নাটাইয়ের স্থান প্রস্তুত করিলেন। কৃষকেরা সেখানেই রেশমের গুটি লইয়া গিয়া দিয়া আসিত। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা ইটালী হইতে একদল সূতা-নাটাইকার লইয়া আসিলেন; তাহাদের দেশে যে প্রণালীতে সূতা-নাটাই হয় তাহারা সেই প্রণালী কোম্পানীর কারিকরদিগকে শিখাইল। ক্রমে বঙ্গদেশের রেশম একটি প্রধান ব্যবসায়ের দ্রব্য হইয়া দাঁড়াইল এবং ইয়ুরোপের বাজারে অন্য দেশের রেশমকে ছাড়াইয়া উঠিল।

* শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসুর "হিন্দু সভ্যতার ইতিহাস," ১৮৯ পৃষ্ঠা।

বঙ্গদেশে রেশমের ব্যবসায়ের সুদিন ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। তার পরে কোম্পানী ঐ ব্যবসায় কোনও কারণে পরিত্যাগ করিলেন ; তখন অন্য লোকে ঐ ব্যবসায় চালাইতে লাগিল। সেই হইতে গুটিপোকার চাষ ক্রমাগতই অবনতির দিকে যাইতেছে। এক্ষণে অ-বোনা (raw) রেশমের রপ্তানী অপেক্ষা আমদানী বেশী হইতেছে। চীন, জাপান ও ভূমধ্য-সাগরোপকূলের রেশম ভারতবর্ষ ও ইয়ুরোপের বাজারে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

চা, কফি ও সিন্‌কোনা—চা, কফি ও সিন্‌কোনার চাষের সহিত সাধারণ কৃষকের সম্বন্ধ অতি অল্প, নাই বলিলেও চলে। এই সকল কৃষি-ব্যবসায় বেশীর ভাগে ইয়ুরোপীয় ধনী-দিগের অর্থে চলে ; ইয়ুরোপীয় দক্ষ লোক ইহার তত্ত্বাবধান করেন। কফি ব্যতীত অপর গুলির চাষ ইংরেজ গভর্নমেণ্টের যত্নেই এ দেশে প্রবর্ত্তিত হয়।

একজন অভিজ্ঞ লেখক * এ দেশে কৃষি সম্বন্ধে গভর্নমেণ্টের কৃতিত্বের বিষয় সংক্ষেপে এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন,—"ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল হইতে গভর্নমেণ্ট দেশীয় কৃষি-বাণিজ্যের বিস্তার ও উন্নতিকল্পে যে সকল চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বঙ্গদেশে রেশমের ব্যবসায়, ক্যারোলিনা দেশের ধান এবং আমেরিকার তুলা, চা, সিন্‌কোনা এ দেশে আনিয়া বপন করা, শনের গাছ হইতে সূতা বাহির করা, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের প্রণালীতে ইক্ষুর চাষ প্রভৃতির ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

* "হিন্দু সভ্যতার ইতিহাস," ২য় খণ্ড, ২০৮-৯ পৃষ্ঠা।

"১৮৭২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে কোনও রীতিমত বন্দোবস্ত ছিল না। ঐ সালে ভারত গভর্ণমেণ্টের অধীনে রাজস্ব, কৃষি ও বাণিজ্যের একটি স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হয়।......এই বিভাগ কিছুদিন পরে তুলিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু লর্ড রিপন উহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার শাসনকালে কৃষি-বিষয়ে উন্নতির প্রসার বর্দ্ধিত হইয়াছিল।............

"সরকারী কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে। উহাদের কতকগুলির ব্যয় গভর্ণমেণ্ট বহন করেন; আর কতকগুলির ব্যয় দেশীয় জমিদার ও রাজারা বহন করেন। বঙ্গদেশে শিবপুরে গভর্ণমেণ্টের কৃষিক্ষেত্র,* বর্দ্ধমান মহারাজের কৃষিক্ষেত্র, ডুমরাওন মহারাজের কৃষিক্ষেত্র রহিয়াছে। শেষোক্ত দুইটির ব্যয় ঐ দুই স্থানের রাজসরকার হইতে নির্ব্বাহিত হয়। যুক্তপ্রদেশের মধ্যে কানপুরের পরীক্ষামূলক কৃষিক্ষেত্র গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত। মান্দ্রাজে সৈদাপেটে গভর্ণমেণ্ট কৃষিক্ষেত্র, বোম্বাই প্রদেশে খান্দেশের সরকারী কৃষিক্ষেত্র এবং মধ্যপ্রদেশে নাগপুরে সরকারী কৃষিক্ষেত্র আছে। এতদ্ব্যতীত পাঞ্জাব, ব্রহ্মদেশ ও আসামে কতকগুলি ছোট ছোট কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে।"

কৃষিশিক্ষার সমুন্নতি সাধনের জন্য গভর্ণমেণ্ট যাহা করিয়াছেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এ দেশের পক্ষে কৃষিকার্য্য যে কিরূপ মূল্যবান্ তাহা গভর্ণমেণ্ট বিশেষরূপ অবগত আছেন;

* এক্ষণে উহা উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু উহার স্থলে ঢাকায় একটি কৃষিক্ষেত্র খোলা হইয়াছে।

সেই জন্য কৃষির উন্নতির চিন্তা তাঁহাদের মন হইতে কখনও অন্তর্হিত হয় না। এ বিষয়ে তাঁহারা যে কেবল পূর্ব্বে সহায়তা করিয়াছেন, তাহা নহে, এখনও করিতেছেন। 'মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কারে' কৃষি একটি 'হস্তান্তরিত' বিষয়, অর্থাৎ ইহার ভার জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির উপরে অর্পিত হইয়াছে। দেশের বিভিন্ন প্রদেশের মন্ত্রীরা এক্ষণে কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। রাজকর্ম্মচারিগণ পশুরোগ, উদ্ভিজ্জের ব্যারাম এবং ভিন্ন ভিন্ন রকমের সারের গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। ইতিমধ্যে অনেক সুফল পাওয়া গিয়াছে ; আরও সুফল পাওয়া যাইবে, আশা করা যায়। সম্প্রতি মার্‌কুইস্‌ অব্‌ লিন্‌লিথ্‌গোর সভাপতিত্বে কৃষি-সম্বন্ধীয় এক রাজকীয় কমিশন বসিয়াছিল। ভারতবর্ষে কৃষি সম্বন্ধে কি প্রকারে উন্নতি হইতে পারে, তাহা এই কমিশন আলোচনা করিয়া রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। এই রিপোর্টে কমিশন কৃষির উন্নতিকল্পে অনেক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে কৃষি সম্বন্ধে একটি রাষ্ট্রীয় (Imperial) অনুসন্ধান-সভা স্থাপনের প্রস্তাব বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই অনুসন্ধান-সভার কার্য্য হইবে কৃষি-সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা, কৃষি ও পশুচিকিৎসা সম্বন্ধে আবশ্যক সংবাদাদি সরবরাহ ও বিজ্ঞাপন করা এবং কৃষির উন্নতির জন্য সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন করা। এই উদ্দেশ্যসকল কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ভারত গভর্নমেণ্ট রাজস্ব হইতে অর্দ্ধ কোটী টাকা অনুসন্ধান-সভার হস্তে প্রদান করিবেন এবং রাজস্বের বিস্তৃতি অনুসারে অতিরিক্ত অর্থও দান করিবেন। সভার কার্য্যের জন্য একজন বেতনভোগী অভিজ্ঞ সভাপতি নিযুক্ত হইবেন ও দুইজন

বিজ্ঞানবিৎ সভ্য থাকিবেন। এতদ্ব্যতীত ৩৬ জন সদস্য লইয়া এই সভা গঠিত হইবে। আশা করা যায়, কৃষি-অনুসন্ধান-সভার কার্য্য আরব্ধ হইলে এই কৃষিপ্রধান দেশের অনেক কল্যাণ সাধিত হইবে।

শিল্পোন্নতি—কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যাপার এরূপ যে, ইহাতে নিজেরা চেষ্টা না করিলে অন্য কোনও উপায়ে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। পরিশ্রম ও মূলধন না হইলে কৃষি, শিল্প ইত্যাদি ব্যবসায় উন্নতি লাভ করিতে পারে না। কিন্তু ইহা সাধারণ ভাবে বলিতে পারা যায় যে, ব্যবসায় ও বাণিজ্যে উন্নতি করিতে হইলে পরিশ্রম ও মূলধন ব্যতীত অপর কতকগুলি নৈতিক, মানসিক ও সামাজিক গুণ থাকা চাই, যথা—বিশেষ বিশেষ বিষয়ে জ্ঞান ও শিল্পকৌশল, নূতন নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার মত সাহস, সাধুতা, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, দল গঠন করিবার ক্ষমতা, মিলিত ভাবে কাজ করিবার সামর্থ্য, এবং সাধারণ ভাষায় যাহাকে বলে সুশৃঙ্খল ভাবে কাজ করিবার অভ্যাস। অর্থ ও লোকবল দ্বারা প্রত্যেক শ্রমশিল্পকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাহায্য করা গভর্নমেণ্টের পক্ষে সম্ভব নহে ; কিন্তু পরোক্ষ ভাবে গভর্নমেণ্ট সাহায্য করিতে পারেন। সেরূপ সাহায্য কিছু কিছু করাও হইতেছে। তাঁহারা লোককে শ্রমিক শিল্পসংক্রান্ত শিক্ষা দিতেছেন, একথা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে ; এবং ঐরূপ শিক্ষা যাহাতে যথেষ্ট বিস্তৃতিলাভ করে, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য আজকাল গভর্নমেণ্ট নানাপ্রকার কল্পনা করিতেছেন। এক্ষণে বাণিজ্য ও শিল্পের জন্য ভারত গভর্নমেণ্টের দুইটি স্বতন্ত্র বিভাগ হইয়াছে। এই সকল নানাবিধ কারণে গত কয়েক বৎসরের

মধ্যে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোকেরা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক নিঃসঙ্কোচে বাণিজ্য ও শ্রমশিল্প অবলম্বন করিতেছেন। গভর্নমেণ্টও এ বিষয়ে সাহায্য করিতেছেন।। তাঁহারা স্থানীয় বাজারে মাল কিনিতে আরম্ভ করিয়াছেন ; দেশীয় মাল পাইলে অন্য মাল কেনা না হয়, সে দিকেও গভর্নমেণ্টের দৃষ্টি আছে—এবং আরও থাকা আবশ্যক। বাণিজ্য ও শ্রমশিল্প বিষয়ে দেশীয় লোকের চেষ্টা বিদেশীয়দিগের সহিত সমানভাবে আদৃত হওয়া আবশ্যক ; ইহা অপেক্ষা উচ্চতর কোনও অধিকার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। চায়ের ব্যবসায় এতদিন ইয়ুরোপীয়গণের একচেটিয়া ছিল। সম্প্রতি ভাবতবাসীদের অনেকগুলি চায়ের যৌথ কারবার হইয়াছে। খনির ব্যবসায়ও আজকাল ভারতীয়দিগের হস্তে কিছু পরিমাণে আসিয়াছে। কেবলমাত্র দেশীয় মূলধনের দ্বারা কয়েকটি কল-কারখানাও খোলা হইয়াছে। স্বদেশী ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতির পথে গভর্নমেণ্ট বাধা না দিলেও, বিদেশীয় বণিক্‌গণের সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতীয় বাণিজ্য যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেইরূপ ব্যবস্থা করাও অবশ্য কর্ত্তব্য। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে 'ট্যারিফ্ বোর্ড' (Tariff Board) বা শুল্ক-নির্দ্ধারণ-সমিতি নিয়োগ করিয়া গভর্নমেণ্ট দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের সংরক্ষণে যত্নশীল হইয়াছেন।

কৃষি-প্রদর্শনী—কৃষি প্রভৃতি শিল্পের প্রদর্শনী হইতে শিল্পের উন্নতি হয় ; কেননা প্রদর্শনীতে নানাবিধ শিল্পবস্তুজাত দেখিয়া লোকে জ্ঞান লাভ করে। দর্শকদিগের মনে নব নব শিল্পসৃষ্টির কল্পনা উদিত হয় এবং প্রদর্শিত দ্রব্যের বাজার বিস্তৃত হয় অর্থাৎ বিভিন্ন স্থানে এই সকল দ্রব্যের আদর হয়।

এই জন্য গভর্নমেণ্ট এই সকল প্রদর্শনীর অনুমোদন করেন এবং ইহার উদ্যোগীদিগকে সাহায্য ও উৎসাহ দান করিয়া থাকেন। কলিকাতায় একটি বাণিজ্যশালা (মিউজিয়ম) স্থাপিত হইয়াছে।

ভারতীয় শ্রমশিল্প—ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি যে ভারতীয় শ্রমশিল্পের উপর নির্ভর করে, ইহা বলাই বাহুল্য। ১৯১৬-১৮ সালে যে 'ভারতীয় শিল্প-কমিশন' বসিয়াছিল, তাহার মন্তব্যে স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভারতে মৌলিক উপাদান যথেষ্ট থাকিলেও আধুনিক সভ্যদেশে লোকের জীবনযাত্রার পক্ষে যে সকল দ্রব্য আবশ্যক, তাহার এক ভগ্নাংশও প্রস্তুত করিবার সামর্থ্য ভারতের নাই। এ দিকে সন্তোষজনক উন্নতি-লাভ হইতেছে না; কারণ, মাত্র কয়েকটি শিল্প ব্যতীত ভারতীয় কোনও শিল্পই পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত দ্রব্যের নিকট ও সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখে টিকিতে পারে নাই। সম্প্রতি যে অভিজ্ঞতা-লাভ হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, রাজকীয় সাহায্য পাইলে ভারতের জাতীয় শিল্পোন্নতি দ্রুত অগ্রসর হইতে পারে। সংস্কারান্বিত (Reformed) শাসন-তন্ত্রে শিল্পোন্নতির ভার প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, এবং 'হস্তান্তরিত' বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ইহার ফলে, যে নিয়মে দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যে সাহায্য দান করিতে হইবে, যে ভাবে শিল্প-শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে এবং মৌলিক উপাদানের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে যে সকল গবেষণার প্রয়োজন, তাহা স্থির করিবার ভার দেশীয় মন্ত্রি-পরিচালিত সরকারী শ্রমিক বিভাগের উপর অর্পিত হইয়াছে। খনিজ বিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং ও ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে উচ্চ শিক্ষা দিবার

জন্য ভারত গভর্নমেণ্ট বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত ধানবাদে খনি-সম্বন্ধীয় একটি স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড় লাট লর্ড আর্‌উইন্ ঐ স্কুলের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছিলেন। ভারত গভর্নমেণ্টের রাজস্ব হইতে শিল্প-শিক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ চারিটি বৃত্তি দেওয়া হইতেছে।

যাঁহারা প্রয়োজনীয় কল-কৌশলাদি আবিষ্কার করেন, তাঁহারা যাহাতে নিজ নিজ মৌলিক আবিষ্কারের ফল বা লভ্য ভোগ করিতে পারেন, গভর্নমেণ্ট সেইরূপ আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। কোনও ব্যক্তি নিজের আবিষ্কৃত দ্রব্যের বিশিষ্টাধিকার-পত্র (patent) লইলে, অন্য কেহই তাহার অনুকরণ করিয়া সেইরূপ দ্রব্য বাজারে বিক্রয় করিতে পারে না। যদি আবিষ্কর্ত্তাদিগকে রক্ষা করিবার এইরূপ বিধান না থাকিত, তবে লোকে অনায়াসে সেই সকল দ্রব্য জাল করিয়া সস্তা দরে বিক্রয় করিতে পারিত। এরূপ হইলে আবিষ্কর্ত্তাদের পক্ষে লাভ করা সম্ভব হইত না এবং নব নব আবিষ্কারের জন্য প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের কোনও চেষ্টাও থাকিত না। আবিষ্কৃত দ্রব্যের রক্ষা-বিধান করায় মৌলিকতার প্রতি উৎসাহ দান করা হইয়াছে; ইহা শ্রমশিল্পের উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করে।

শুল্ক—বাণিজ্যের সহিত শুল্কের সম্বন্ধ অতি নিকট। ইংলণ্ড বহুকালাবধি অবাধ বাণিজ্যের মূলতত্ত্বটি গ্রহণ করিয়াছেন; অর্থাৎ আমদানী ও রপ্তানীর উপর কোন শুল্ক বা ট্যাক্স ধার্য্য না করাই স্থির করিয়াছেন। উক্ত নীতি কেবল বহির্বাণিজ্যের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, অন্তর্বাণিজ্যের সম্বন্ধে নহে। ভারতবর্ষে রপ্তানীর উপর

যে ট্যাক্স ধার্য্য হইত, তাহা অপেক্ষা আমদানীর উপর অনেক বেশী ছিল। সময়ে সময়ে কোনও কোনও রপ্তানী দ্রব্যকে শুল্ক হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইত। ১৮৭৫ সালে কেবল চাউল, নীল ও লাক্ষার রপ্তানীর উপর শুল্ক ধার্য্য হইয়াছিল। যে সকল আমদানীর উপর শুল্ক ধার্য্য হইয়াছিল, ইংলণ্ডে প্রস্তুত কার্পাসজাত দ্রব্য তাহাদের অন্তর্গত ছিল। ১৮৭৬ সালে ভারতসচিব ঐ সকল শুল্ক তুলিয়া দিবার সঙ্কল্প করেন এবং পর বৎসর ঐ নীতির সমর্থন করিয়া পার্লিয়ামেণ্ট একটি মন্তব্য পাস করেন। ইহার পরবর্ত্তী দুই বৎসরে অনেক আমদানী দ্রব্যের উপর হইতে শুল্ক তুলিয়া দিয়া ভারতবর্ষে উক্ত নীতির প্রবর্ত্তন করা হয়। কয়েক প্রকার কার্পাসজাত দ্রব্যের উপর হইতেও আমদানী শুল্ক উঠিয়া যায়। ১৮৮২ সালে লবণ ও মদ্য ব্যতীত অন্য সকল দ্রব্য হইতেই আমদানী শুল্ক তুলিয়া দেওয়া হয়। লবণ ও মদ্যের উপর শুল্ক রহিয়া গেল; তাহার কারণ, এই দুই দ্রব্য আভ্যন্তরিক শুল্কের (excise duty) অধীন। অস্ত্রশস্ত্রাদি যুদ্ধের উপকরণের উপর পরে রাজনীতিক কারণে শুল্ক ধার্য্য হইয়াছিল। রুষিয়া ও আমেরিকা হইতে যে সকল পেট্রোলিয়ম্ আমদানী হয়, তাহার উপর সামান্য শুল্ক স্থাপিত হইল। এইরূপে এক সময়ে ভারতে আমদানী সম্বন্ধে অবাধ বাণিজ্যনীতি বহুপরিমাণে অনুসৃত হইয়াছিল। কিন্তু ইংলণ্ড ভারতীয় চা ও কফির উপর শুল্ক আদায় করেন। রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে প্রধানতঃ চাউল, চা ও পাটের উপর শুল্ক আদায় করা হয়।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে অর্থের অনটন হেতু ভারত গভর্নমেণ্ট তাঁহাদের নীতির পরিবর্ত্তন করিলেন। অবাধ বাণিজ্যনীতি আংশিকরূপে

পরিবর্ত্তিত হইল। ১৮৭৫ সালের শুল্কতালিকা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া বহাল করা হইল। এই তালিকা অনুসারে মূল্যবান্ ধাতু ভিন্ন অন্য যে সকল দ্রব্য ভারতবর্ষে আমদানী হইত, প্রায় তাহার সমস্ত গুলির উপর শতকরা ৫৲ হিসাবে শুল্ক ধার্য্য ছিল।* "রৌপ্যপিণ্ডের উপর শুল্ক ধার্য্য হইল এবং যে সমস্ত কার্পাসদ্রব্য পূর্ব্বে শুল্কমুক্ত ছিল, সেগুলির উপর শুল্ক স্থাপিত হইল। ১৮৯৬ সালে কার্পাসের সূত্র শুল্কবিমুক্ত হইল। বিদেশ হইতে যে সকল কার্পাস-নির্ম্মিত বস্ত্রাদি আমদানী হইত, তাহার উপর মূল্যের অনুপাতে *(ad valorem)* শতকরা ৩৷৷০ হারে শুল্ক বসিল। দেশীয় কলে প্রস্তুত বস্ত্রের উপরও ঐ হারে আভ্যন্তরিক শুল্ক (excise duty) ধার্য্য হইল।† ১৮১৭ সালে এবং পুনরায় ১৯২১ সালে মূল্যানুপাতে ধার্য্য সমস্ত শুল্ক বাড়াইয়া শতকরা ৭৷৷০ করা হইয়াছিল। আমদানী কার্পাস-বস্ত্রের উপরও এই শুল্ক ধরা হইল। পরে আবার ৭৷৷০ হইতে ১১ করা হইয়াছিল। ১৯২১-২২ সালে যে রাজস্ব-সংক্রান্ত রাজকীয় কমিশন বসিয়াছিল, তাহার সভ্যগণ কার্পাসজাত দ্রব্যের উপর যে ভাবে এবং যে কারণে আভ্যন্তরিক শুল্ক ধরা হইত, তাহার তীব্র নিন্দা করিয়াছিলেন এবং ঐ শুল্ক যাহাতে অবিলম্বে উঠাইয়া দেওয়া হয়, তজ্জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ভারত গভর্নমেণ্ট সে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। গভর্নমেণ্টের অর্থের অভাব ঘটায় বাণিজ্য-শুল্ক-তালিকায় (tariff) কতকগুলি প্রধান পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে।

* সার জন ষ্ট্রাচীর "ভারতবর্ষ,"—১৮৩ পৃষ্ঠা।

† ঐ দ্বাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বাণিজ্য-শুল্ক প্রধানতঃ এই তিন উপায়ে সংগৃহীত হয়:—(১) সাধারণ আমদানী শুল্ক; (২) অস্ত্রশস্ত্র, মদ্য, বিলাসের দ্রব্য, যথা—মোটর গাড়ী, সাইকেল, রেশমের বস্ত্রাদি, চিনি, পেট্রোলিয়ম এবং তামাক প্রভৃতির উপর বিশেষ আমদানী শুল্ক; (৩) কতকগুলি রপ্তানী শুল্ক, যথা—চাউল, পাট ও চায়ের শুল্ক।

কৃষি-ব্যবসায়ীদিগের উপকারের জন্য বিশেষতঃ তাহাদিগকে ঋণদায় হইতে মুক্ত করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট কতকগুলি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। এই সকল উপায়ের মধ্যে একটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ব্যবস্থা এই যে, গভর্ণমেণ্ট গ্রামবাসীদের সমবেত ও ব্যক্তিগত দায়িত্বে টাকা ধার দিতেছেন। কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে এবং বীজ ও চাষের গরু ইত্যাদি কিনিবার জন্য এইরূপ ধার দেওয়া হয়।

কো-অপারেটিভ সোসাইটী—ভারতীয় কৃষি-ব্যবসায়ীর দুরবস্থা দূর করিবার জন্য আর একটি সু-ব্যবস্থা হইয়াছে—দেশে বিবিধ প্রকারের কো-অপারেটিভ সোসাইটী বা সমবায়-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা। ভারতবর্ষে ১৯২৮ সালে প্রায় ৯৬,০০০ সমবায়-সঙ্ঘ হইয়াছিল। কৃষি-ব্যবসায়ীদের মধ্যে যাহাতে মিতব্যয়িতা বাড়ে, তাহারা সমবেত দায়িত্বে যাহাতে অল্প সুদে টাকা ধার পায়, এবং নিজেদের মধ্যে যাহাতে সুবিধাজনক সর্ত্তে টাকা ধার দিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে সমবায়সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা। এই সকল সঙ্ঘ এবং আরও অনেক প্রকার সমিতি, যথা—কৃষি-সম্বন্ধীয় ক্রয়বিক্রয়-সমিতি, সার যোগাইবার সমিতি, জেলেদের সমিতি, তন্তুবায়-সমিতি, সমবায়-ভাণ্ডার (co-operative stores) প্রভৃতি দেশের নানা স্থানে স্থাপিত হইতেছে। বঙ্গদেশে এই সকল

সমিতির সংখ্যা ৬ হাজারের অধিক এবং সমগ্র ভারতবর্ষে ৬১ হাজারের অধিক।

সেভিংস্ ব্যাঙ্ক—লোকের মধ্যে মিতব্যয়িতার অভ্যাস যাহাতে বর্দ্ধিত হয়, তজ্জন্য সেভিংস্ ব্যাঙ্কের ব্যবস্থা হইয়াছে। ১৮৮২-৮৩ সাল পর্য্যন্ত কেবল কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই এই তিন প্রধান নগরে প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কে সেভিংস্ ব্যাঙ্কের কার্য্য হইত। অন্যান্য স্থানে গভর্ণমেণ্টের ধনাগারেই উক্ত কার্য্য হইত। কিন্তু এরূপ প্রণালীতে বিশেষ ফললাভ হয় নাই। অল্পে অল্পে কাজ বাড়িতে লাগিল। ডাকঘরে সেভিংস্ ব্যাঙ্ক খুলিবার পর হইতে দ্রুত পরিবর্ত্তন হইল। আমানতকারীর সংখ্যা এবং আমানতি টাকার পরিমাণ অনেক বাড়িয়াছে। কেবল কৃষিব্যবসায়ীদের জন্যই সেভিংস্ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় নাই; অন্য শ্রেণীর লোকও বহু পরিমাণে ঐ সকল ব্যাঙ্কের সহিত কারবার করে।

প্রজাস্বত্ব—রাইয়ত বা প্রজাগণের হিতার্থ গভর্ণমেণ্ট যে সকল আইন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে প্রজাস্বত্ব-বিষয়ক আইনগুলি উল্লেখযোগ্য। এই সকল আইন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও দেশকালপাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। কিন্তু ইহাদের উদ্দেশ্য এক, অর্থাৎ প্রজাদিগের নিকট হইতে কেহ যাহাতে অযথা কর না লইতে পারে বা অন্য প্রকারে তাহাদিগকে উৎপীড়ন করিতে না পারে, তাহাদের স্বত্ব ও দায়িত্ব যাহাতে নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাহারা যাহাতে সহজে তাহাদের খাজানা দাখিল করিতে পারে, সেই প্রকার ব্যবস্থা করা। সেইরূপ, ভূম্যধিকারীকে প্রজার নিকট হইতে অনায়াসে খাজানা আদায় করিতে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য

করা এবং তাহাদের স্বত্ব-স্বামিত্ব রক্ষা করাও এই সকল আইনের উদ্দেশ্য।

দুর্ভিক্ষ—দুর্ভিক্ষ দেশের একটি ভয়ানক অমঙ্গলের কারণ। অজন্মা হইলে অর্থাৎ খাদ্যোপযোগী শস্য না জন্মিলে দুর্ভিক্ষ হয়। ক্রমাগত অনাবৃষ্টি হইলে বা বন্যায় দেশ ভাসিয়া গেলে 'অজন্মা' হয়। অজন্মা হইলে বা অত্যল্প পরিমাণে শস্য জন্মিলে খাদ্য শস্যের মূল্য বাড়ে; তাহাতে কৃষি-ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য দরিদ্র লোকেরা, যথা—ছোটখাটো শ্রমশিল্পী, বা ব্যবসাদার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই শ্রেণীর লোকেরা অত্যন্ত দরিদ্র; সুজন্মার দিনেও তাহারা সামান্য শস্যই পায়; তারপর তাহাদের বংশবৃদ্ধি, অমিতব্যয়িতা এবং মামলা-মোকদ্দমার জন্য ব্যয় এত বাড়িয়া যায় যে, তাহারা এমনি কিছুমাত্র সঞ্চয় করিতে পারে না। দুর্ভিক্ষের সময়ে, কোনও সঞ্চয় না করায়, তাহারা দারুণ কষ্টে পতিত হয়। দেশে ধান চাউল থাকিলেও, উহারা ক্রয় করিতে অসমর্থ হয়। এরূপ স্থলে অন্যের সাহায্য না পাইলে তাহারা অন্নাভাবে ও রোগপীড়ায় মারা যায়। অতিবৃষ্টি, বা অনাবৃষ্টি বা ঐরূপ কোনও আকস্মিক দুর্ঘটনায় খাদ্য-শস্যের অপ্রাচুর্য্য ঘটে; তার উপর আবার বিদেশে ধান চাউল চালান দেওয়া হয়। দেশের মধ্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে দ্রব্যাদি চালান দেওয়ার সুবিধাও সকল স্থানে নাই। লোকে উচ্চবাচ্য না করিয়া নীরবে কষ্ট সহ্য করে; শেষে কষ্টের চরম সীমায় উপনীত হইলে, সাধারণে জানিতে পায়। তখন গভর্নমেণ্ট এবং জনসাধারণ সাহায্যদানের জন্য অগ্রসর হয়েন।

দুর্ভিক্ষ-নিবারণ—দুর্ভিক্ষ যথাসাধ্য নিবারণ করিবার জন্য গভর্নমেণ্ট যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, এ স্থলে

তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। ঐ সকল উপায়ের মধ্যে খাল কাটানো এবং রেলপথ-নির্ম্মাণ উল্লেখযোগ্য। খাল কাটাইয়া ক্ষেত্রে জল সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করিয়া অনাবৃষ্টিজনিত উৎপাতের আশঙ্কা কমানো হইয়াছে; এবং রেলপথ নির্ম্মাণ করিয়া নানা স্থান হইতে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত স্থানে শস্য-প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়। দুর্ভিক্ষ যখন উপস্থিত হয়, গভর্নমেণ্ট কতক লোকের মধ্যে অন্ন বিতরণ করেন; আর কতক লোককে কাজে খাটাইয়া সাহায্য করিবার অভিপ্রায়ে নানাবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। এই সকল কার্য্যকে 'রিলিফের' কাজ বলে। এই সকল জনহিতকর কার্য্যে (যথা, রাস্তা-নির্ম্মাণ ইত্যাদি) সমর্থ শ্রমসহিষ্ণু লোক দেখিয়া নিযুক্ত করা হয়। দুঃস্থ লোকদিগকে প্রয়োজন মত রাজস্ব হইতে সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং কোনও কোনও স্থলে অল্প সুদে টাকা ধারও দেওয়া হয়। গভর্নমেণ্ট দুঃস্থ লোকদের সাহায্যের জন্য সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহেও সম্মতি দিতে পারেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে ভারতবর্ষে তিন বার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়; দক্ষিণ ভারতে ১৮৭৬-৭৮ সালে প্রথম দুর্ভিক্ষ হয়; পরে ১৮৯৬-৯৭ সালে এবং ১৮৯৯-১৯০০ সালে আবার ঘোর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ১৮৭৬ সাল হইতে দুর্ভিক্ষের বাবত প্রতিবর্ষে গড়ে এক কোটী টাকা খরচ করা হয়। রাজস্বের ক্ষতি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় ধরিলে গভর্নমেণ্টের প্রকৃত খরচ এক কোটীরও অধিক। ১৮৭৮ সালে লর্ড লিটন যখন বড় লাট, তখন দুর্ভিক্ষের সময়ে ব্যয়িত হইবার জন্য বৎসর বৎসর দেড়কোটী টাকা রাজকোষে মজুত রাখিবার ব্যবস্থা হয়। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত

হইলে ঐ মজুত টাকা হইতে জনসাধারণকে সাহায্য করাই প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হয়। অবশিষ্ট যাহা থাকিত, তাহা পূর্ব্বে সাধারণের হিতকর অথচ লাভজনক কার্য্যে ব্যয়িত হইত। ঐ মজুত টাকা না থাকিলে গভর্নমেণ্ট এই সকল কাজের জন্য টাকা ধার করিতে বাধ্য হইতেন। ১৮৮১ সালে ঐ টাকা দুর্ভিক্ষ-নিবারণের বা তাহার উপশমের জন্য যে সকল লোকহিতকর কার্য্য করা হয়, সেই কার্য্যে ব্যয় করা দ্বিতীয় কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হইল। যে সকল কার্য্য দুর্ভিক্ষ হইতে রক্ষা করে এবং যে সকল কার্য্যে অর্থাগম হয়—এই উভয়বিধ কার্য্যের মধ্যে পার্থক্য ক্রমেই অস্পষ্ট হইয়া আসিল এবং যদিও রেলওয়ে সাধারণ শাসন-প্রণালীর অন্তর্গত এবং যদিও দুর্ভিক্ষ নিবারণ করা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য নহে, তাহা হইলেও প্রথমতঃ দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডারের যে টাকা রক্ষাজনক কার্য্যের জন্য মজুত ছিল, তাহা হইতে রেলপথ-নির্ম্মাণে সাহায্য করা হইল। ১৮৯৯ সালের শেষে এই প্রথা রহিত হইল। অতঃপর রক্ষাজনক কার্য্যের জন্য পঁচাত্তর লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে স্থির হইল এবং প্রকৃতপক্ষে দুর্ভিক্ষ হইতে রক্ষার জন্য যে সকল রেলপথ নির্ম্মিত হইবে বা খাল কাটোনো হইবে, কেবল সেইগুলিই রক্ষাজনক কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইল।

সার জন ষ্ট্রাচী ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন, * "গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষে বিদেশীয় বাণিজ্য বহুল পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়াছে। এ দেশের ধনবৃদ্ধির ইহা একটি জাজ্বল্যমান প্রমাণ। ১৮৪০ সালে সমুদ্র-বাহিত বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল

* সার জন ষ্ট্রাচীর "ভারতবর্ষ," ১৮৬ পৃষ্ঠা।

প্রায় ২০,০০০,০০০ পাউণ্ড; ১৮৫৭ সালে অর্থাৎ যে বৎসর ভারতের শাসনভার মহারাণী স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন, তাহার পূর্ব্ব বৎসর সমুদ্র-বাহিত বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৫৫,০০০,০০০ পাউণ্ড; ১৮৭৭ সালে ১১৪,০০০,০০০ এবং ১৯০০-১ সালে প্রায় ১৫২,০০০,০০০ পাউণ্ড। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ যাহা ছিল, ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ এক্ষণে তাহা অপেক্ষা অধিক।" *

* ভারতবর্ষের সমুদ্র-বাহিত বাণিজ্য যে ভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।—

দশ বৎসরের গড়			টাকা
১৮৭৫-৭৬ হইতে ১৮৮৪-৮৫ সাল			
আমদানী	...	...	৬৯, ৫৯, ০০, ০০০
রপ্তানী	...	...	৮৫, ২৩, ০০, ০০০
১৮৮৫-৮৬ হইতে ১৮৯৪-৯৫ সাল			
আমদানী	...	...	৮৩, ১১, ০০, ০০০
রপ্তানী	...	...	১, ১৭, ১৪, ০০, ০০০
১৮৯৫-৯৬ হইতে ১৯০৪-৫ সাল			
আমদানী	...	...	১, ৪৩, ৯২, ০০, ০০০
রপ্তানী	...	...	১, ৭৪, ২৬, ০০, ০০০
১৯০৪-৫ হইতে ১৯১১-১২ সাল			
আমদানী	...	...	১, ৯৭, ৫৩, ০০, ০০০
রপ্তানী	...	...	২, ৩৮, ৩৬, ০০, ০০০

সপ্তম অধ্যায়

বৈষয়িক উন্নতি

পূর্ত্তকার্য্য—ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে যে সকল মূল্যবান্ জিনিষ দিয়াছেন, তন্মধ্যে লোকহিতকর নির্ম্মাণ-কার্য্যগুলি সর্ব্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষগোচর। উন্নতিশীল পাশ্চাত্ত্য দেশে যে সকল কাজ সাধারণতঃ জনসাধারণ করিয়া থাকেন, ভারতবর্ষে তাহা গভর্ণমেণ্টকে করিতে হইয়াছিল। জন ষ্টুয়াট মিল বলিয়াছেন, "কোনও কোনও সময়ে বা কোনও কোনও জাতির বিশেষ অবস্থায়, এমন হইতে পারে যে, প্রজাসাধারণ কোনও হিতকর কার্য্য করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, অথবা ইচ্ছা করিয়াই করে না, সেরূপ স্থলে গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য সেই সকল কার্য্য বা অনুষ্ঠানের ভার নিজেই গ্রহণ করা। কোনও সময়ে বা কোনও স্থলে এরূপ ঘটিতে দেখা যায় যে গভর্ণমেণ্ট যদি রাস্তা, খাল, বন্দর, জল-সেচনের জন্য পয়ঃপ্রণালী, হাঁসপাতাল, স্কুল-কলেজ, ছাপাখানা করিয়া না দেন, তবে এ সকল কিছুই হয় না। সেখানে জনসাধারণ হয় অতি গরীব বলিয়া প্রয়োজনীয় সম্বল সংগ্রহে অসমর্থ, না হয় এ সকলের উপকারিতা বুঝিবার মত বুদ্ধিবৃত্তি হইতে বঞ্চিত ; আর না হয় মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে তাহারা অভ্যস্ত নহে। যে সকল দেশে রাজশক্তি অনিয়ন্ত্রিত বা স্বেচ্ছাচার-সম্পন্ন এবং প্রজাগণ বহুকাল হইতে সেইরূপ শাসনে অভ্যস্ত, বিশেষতঃ যে দেশে শাসনকারী ও শাসিতদিগের মধ্যে সভ্যতা

বিষয়ে বৈষম্য বেশী এবং যে সকল দেশে কোনও অধিক শক্তিশালী ও সভ্যজাতি অন্য এক জাতিকে জয় করিয়া তাহাদিগকে বশে রাখিয়াছে, সেই সকল দেশেই এইরূপ ঘটনা ঘটে।" * মিল যখন ইহা লিখিয়াছিলেন, তখন বোধ হয় ভারতবর্ষের কথা ভাবিতেছিলেন। বস্তুতঃ তিনি যে অবস্থার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, ভারতবর্ষে সেই অবস্থাই ঘটিয়াছে। যে সকল কাজ অন্য দেশে জনসাধারণ করিয়া থাকে, এখানে গভর্নমেণ্টকে সেই সকল কার্য্যের ভার লইতে হইয়াছে।

রাজপথ—ইংরেজ শাসনের পূর্ব্বে এ দেশে রাজপথ অনেক কম ছিল। "দেশীয় কোন রাজা রাজপথ প্রস্তুত করেন নাই। আমাদের শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে রাজপথ নামের যোগ্য কিছু ছিল না বলিলেই হয়। আমাদের পূর্ব্বে যে সকল দেশীয় রাজগণের শাসন ছিল, তাহারা প্রচলিত পথের দুই ধারে গাছ লাগানো বা যেখানে রাস্তা নীচু থাকিত সেখানে মাটী ফেলা ব্যতীত আর কিছু করিতেন না (আমি ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ কমিশনের সভ্যগণের মন্তব্য হইতে উদ্ধৃত করিতেছি)। সে সময়ে যে সকল সেতু ছিল, সেগুলি কোনও বড়লোক বা রাজপুরুষ যশের আকাঙ্ক্ষায় নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।" † এই উক্তি কতকটা অতিরঞ্জিত হইলেও এখন রাজপথ-নির্ম্মাণের ও তাহা রক্ষা করিবার যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, পূর্ব্বে যে সেরূপ ছিল না, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। মাত্র গ্রীষ্ম ঋতুতে

* মিলের "অর্থনীতি," ২য় খণ্ড, ৫৫১ পৃষ্ঠা।

† বাকলাণ্ডের "লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নরের অধীনে বঙ্গদেশ," ১ম খণ্ড, ২০ পৃষ্ঠা।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানে বিনা আয়াসে যাতায়াত করা সম্ভব ছিল। বৎসরের মধ্যে তিন চারি মাস কাল জলপথে ব্যতীত ব্যবসায়-বাণিজ্য সমস্ত বন্ধ থাকিত। লর্ড ডাল্‌হৌসীর সময়ে এই অভাব দূর করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয়। তাঁহার সময়ে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ও পাঞ্জাবে অনেক পাকা রাস্তা ও সেতু প্রস্তুত হইয়াছিল। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের নির্ম্মাণ কার্য্যও এই সময়ে আরব্ধ হইয়াছিল। ক্ষেত্রে জল সরবরাহের জন্য গঙ্গার যে সুবৃহৎ খাল কাটা হইয়াছিল, তাহার উন্মোচন ১৮৫৪ সালে সম্পন্ন হয়। বড়লাট লর্ড ক্যানিংএর শাসনের শেষাবস্থায়, ১৮৬১-৬২ সালে এক বাঙ্গালাদেশেই ১১টি প্রশস্ত রাজপথ ছিল বা নির্ম্মিত হইতেছিল। ইহাদের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় দুই হাজার মাইল হইবে। এই সকল বৃহৎ রাজপথ হইতে সরকারী যে সকল শাখা-উপশাখা বাহির হইয়াছিল, তাহাদের দৈর্ঘ্য ১,১৪৫ মাইল হইবে। কলিকাতা হইতে কর্ম্মনাশা নদী পর্য্যন্ত যে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড প্রস্তুত হইতেছিল, তাহাও প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। *

ভারতবর্ষের রাস্তা বাড়াইবার আবশ্যকতা প্রতিদিনই লোকে বুঝিতে পারিতেছে। বর্ষার সময়ে কতকগুলি কৃষিপ্রধান জেলায় যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। ইহাতে যে ব্যবসায়ের লোকসান হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। যতদিন পর্য্যন্ত 'ট্রাঙ্ক' অর্থাৎ প্রধান রাস্তাগুলির প্রতি রীতিমত যত্ন করা না হয়, ততদিন এই অসুবিধার কোনও প্রতীকার করা যাইতে পারে না। প্রতিবর্ষেই কিছু না কিছু উন্নতি হইতেছে সত্য, কিন্তু

* বাক্‌লাণ্ডের "লেফটেনাণ্ট গভর্নরের অধীনে বঙ্গদেশ," ১ম খণ্ড, ২০ পৃষ্ঠা।

প্রয়োজনের অনুপাতে এ উন্নতির পরিমাণ নিতান্তই অল্প। সরকার ও বোর্ড প্রভৃতি এ দেশে যে সকল পাকা ও কাঁচা রাস্তা রক্ষা করিতেছেন, তাহার মোট দৈর্ঘ্য ২,১৬,০০০ মাইলের অধিক হইবে না। আজকালকার অবস্থা অনুসারে ইতস্তত: যাতায়াত যেরূপ আবশ্যক হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে ভাল রাস্তা আরও বেশী দূর বিস্তৃত না হইলে চলিবে না।

রেলপথ—১৮৪৩ সালে মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ড ষ্টিফেন্‌সন্‌ ভারত গভর্নমেণ্টের নিকট রেলপথ-নির্ম্মাণের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। ১৮৪৯ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্‌ রেলওয়ে কোম্পানীর সহিত এক চুক্তি করেন; তাহাতে উঁহারা ঐ রেল কোম্পানীকে দশ লক্ষ পাউণ্ডের অনধিক ব্যয়ে পরীক্ষার্থ একটি লাইন নির্ম্মাণ করিতে বলেন। ১৮৫১ সালে বর্দ্ধমান ও রাজমহলের মধ্যবর্ত্তী রাস্তা জরিপ করা হয়। পর বৎসরে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত ঐ জরিপ কার্য্য বিস্তৃত হয়। ১৮৫৩ সালে লর্ড ডাল্‌হৌসী ভারতবর্ষে রেল খুলিবার বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করিয়া ডিরেক্টার সভায় এক পত্র প্রেরণ করেন; তাহাতে ডিরেক্টার সভাকে ভারতবর্ষে রেলপথ-বিস্তারে উৎসাহ দিতে পরামর্শ দেওয়া হয়। ১৮৫৬ সালে লর্ড ডাল্‌হৌসী এই সম্বন্ধে তাঁহার শেষ অভিমত ব্যক্ত করেন। ১৮৫৮ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে খোলা হয় এবং ১৮৬২ সালের ডিসেম্বর মাসে ইহা বারাণসী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। প্রায় ঐ সময়ে আরও দুইটি বড় লাইন খোলা হয়—'গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্‌সুলার রেলওয়ে' এবং 'মান্দ্রাজ রেলওয়ে'। প্রথমটি বোম্বাই হইতে পশ্চিম ভারতের মধ্য দিয়া এবং দ্বিতীয়টি মান্দ্রাজ হইতে দক্ষিণ ভারতের

মধ্য দিয়া গিয়াছে। এই সকল লাইন বে-সরকারী কোম্পানীর ব্যয়ে খোলা হইল; গভর্ণমেণ্ট মূলধনের উপর অন্যূন শতকরা ৫ টাকা সুদ দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। বর্ত্তমানে ই. আই. এবং জি. আই. পি. রেলওয়ে গভর্ণমেণ্টের হস্তে আসিয়াছে। গত অর্দ্ধ-শতাব্দীর মধ্যে রেলপথ বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছে। ১৮৭২ সালে রেলওয়ের দৈর্ঘ্য ছিল ৫,৩৬৯ মাইল। ১৯৩০ সালের মার্চ্চ মাসে ঐ দৈর্ঘ্য প্রায় ৪২,০০০ মাইল হইয়াছে। কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, রেলওয়ে সম্বন্ধে ভারতবর্ষ এখনও অন্যান্য দেশের পশ্চাতে রহিয়াছে। ভারতবর্ষে প্রায় ৩২ কোটী লোকের বাস; ইহাদিগকে ৪২ হাজার মাইল রেলওয়ে লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছে; আর ইংলণ্ড যদিও আয়তনে ও লোক-সংখ্যায় ভারতবর্ষের তুলনায় অনেক ছোট, তথাপি ইংলণ্ডে ৫০,০০০ মাইল রেলপথ আছে। আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে ২ লক্ষ ৫০ হাজার মাইল রেলপথ আছে। অতএব ভারতবর্ষে যে আরও রেলপথ-বিস্তারের আবশ্যকতা আছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

মোটর—অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে মোটর গাড়ীর বহু প্রচলন হইয়াছে। অনেক স্থলে মোটর গাড়ী, মোটর 'লরি' ও মোটর 'বাস' ট্রামওয়ে ও রেলওয়ের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে। রেলওয়ের ধারে ধারে যেখানে প্রশস্ত রাজপথ আছে, সেখানে মোটর 'বাস' চলিতেছে এবং যাত্রীর অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছে। অবশ্য সুদূর গমনের পক্ষে এখনও রেলগাড়ীই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক যান। তাহা হইলেও মোটর গাড়ীর যেরূপ দ্রুত উন্নতি ও বহু প্রচলন হইতেছে, তাহাতে মনে হয় ভবিষ্যতে অনেক স্থলে মোটর রেলগাড়ীর স্থান গ্রহণ করিবে।

অনেক স্থলে বহু ব্যয়সাধ্য রেলপথ-নির্ম্মাণ অপেক্ষা মোটরের প্রচলন বাঞ্ছনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে।

এরোপ্লেন্—বায়ব পোত বা এয়ারশিপ্ ও এরোপ্লেন্ বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে মানুষের পক্ষে শূন্যে উড্ডীয়মান হওয়া অসম্ভব বলিয়াই পরিগণিত হইত; কিন্তু এক্ষণে ইহা সম্ভবপর হইতেছে। শুধু আমোদ বা বিলাসের জন্য নহে, যাত্রী ও ডাক লইয়া এক্ষণে বহু স্থলে বায়ব যান গমনাগমন করিতেছে। ১৯২৭-২৮ সালে অন্যূন ৯ খানি বায়ব পোত ইয়ুরোপ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল বা ভারতবর্ষের উপর দিয়া উড়িয়া গিয়াছিল। অতি অল্প সময়ে এই সকল যন্ত্র নদী, গিরি, সাগর লঙ্ঘন করিয়া যাইতে পারে বলিয়া, মনে হয় যে অদূর ভবিষ্যতে বায়ব যান সভ্যজাতিসমূহের মধ্যে একটি উৎকৃষ্ট যান বলিয়া গণ্য হইবে। ১৯২৯ সাল হইতে ভারতবর্ষ ও বিলাতের মধ্যে বায়ব যানে ডাক পাঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আজকাল ডাক আসিতে মাত্র ৭ দিন লাগে। ক্রমে আরও কম সময় লাগিবে আশা করা যায়। এই সকল ডাকের জাহাজে যাত্রীও লওয়া হয়। সময়ে সময়ে যে বিপদ্ ঘটে না, তাহা নহে। কিন্তু এই সকল দুর্ঘটনার সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে। কলিকাতার উপকণ্ঠে দমদমায় বায়ব পোতের ষ্টেশন নির্ম্মিত হইয়াছে। বোম্বাই নগরেও বায়ব ষ্টেশনের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে গয়া সহরেও ঐরূপ একটি ষ্টেশনের জন্য স্থান লওয়া হইয়াছে। করাচী, কলিকাতা, বোম্বাই এবং দিল্লীসহরে বায়বযান-সমিতি (Light Aeroplane clubs) গঠিত হইয়াছে। এই সকল সমিতির উদ্দেশ্য যাহাতে সাধারণে অল্প ব্যয়ে বায়ব যান ব্যবহার

করিতে পারে, বায়ব যানের যাহাতে উন্নতি হয় এবং এ দেশের লোক যাহাতে উড্ডয়নের কৌশল ক্রমশঃ অবগত হইতে পারে। শেষোক্ত উদ্দেশ্যে দেশীয় শিক্ষার্থিগণকে বৃত্তি দিয়া বিলাতে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। চাওলা নামক একজন ভারতবাসী সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে উড্ডয়ন করিয়া ৭,৫০০ টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

টেলিগ্রাফ—টেলিগ্রাফের তারও লর্ড ডাল্‌হৌসীর সময়ে প্রথম বসানো হয়। এখন যেখানে যেখানে রেলওয়ে লাইন গিয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাফ লাইনও গিয়াছে। ১৯২৯-৩০ সালে টেলিগ্রাফ তারের বিস্তৃতি ১,০২,০০০ মাইল হইয়াছে; ইহাতে পাঁচ লক্ষ মাইলেরও অধিক দীর্ঘ তার লাগিয়াছে। ঝড়ে টেলিগ্রাফ তারের অত্যন্ত ক্ষতি হয়; ঝড়ে তারের উপর গাছ পড়িলেও তার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। বন্যায়ও অনেক সময়ে টেলিগ্রাফের থাম ফেলিয়া দেয়; এতদ্‌ব্যতীত টেলিগ্রাফ তারের পরম শত্রু আছে পক্ষী। কাকেরা সমান্তরাল ভাবে ব্যবস্থিত তারের উপর থামের গায়ে বাসা বাঁধিতে পছন্দ করে। ইহাতে কাকের বসবাস করিবার সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু টেলিগ্রাফের অত্যন্ত ক্ষতি হয়।

টেলিফোন—যাহারা বড় বড় সহরে বাস করেন, তাঁহারা টেলিফোনের বিষয় অবগত আছেন। টেলিফোনে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সাংকেতিক সংবাদ পাঠাইতে হয় না। টেলিফোনের এক প্রান্ত হইতে সহজভাবে কথা কহিলেই অপর প্রান্ত হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার সুবিধা এই যে, দূরত্বের ব্যবধান সত্ত্বেও পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিতে পারা যায় এবং তখনই

তখনই কোনও বিষয়ের প্রত্যুত্তর পাওয়া যায়। টেলিগ্রাফ অপেক্ষাও শীঘ্র সংবাদ পাওয়া যায় বলিয়া বাণিজ্যের ও রাজ-কার্য্যের জন্য টেলিফোনের উপকারিতা ক্রমশঃ সকলেই উপলব্ধি করিতেছেন। টেলিফোনের বিস্তৃতিও দ্রুত বাড়িতেছে। ১৯২৭ সালের জানুয়ারী মাসে কলিকাতা হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত টেলিফোন খোলা হয়। এক্ষণে কলিকাতা হইতে দিল্লী হইয়া বোম্বাই পর্য্যন্ত টেলিফোনের তার গিয়াছে। বোম্বাই হইতে দিল্লী পথে কলিকাতা একহাজার সাতশত মাইলেরও উপর! এত দূরের লোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে পারা কম সুবিধার বিষয় নহে। এখনও কথা সুস্পষ্ট ভাবে শুনিতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু শীঘ্রই এ অসুবিধা দূরীভূত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বিনা-তার টেলিগ্রাফ—তারের সাহায্যে যখন দূরবর্ত্তী স্থানে সংবাদ-প্রেরণের উপায় উদ্‌ভাবিত হইয়াছিল, তখনই তাহা লোকের মনে প্রভূত বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। এক্ষণে বিনা তারেও সংবাদ প্রেরিত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে বিনা তারে সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য বোম্বাইয়ের নিকট স্যাণ্টাক্রুজ, করাচী, ডায়মণ্ড হারবার ও অন্যান্য স্থানে ষ্টেশন খোলা হইয়াছে। ইহাতে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে সংবাদ-প্রেরণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ইয়ুরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকার সহিতও সংবাদ-বিনিময়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। বে-তারের সাহায্যে Broadcasting বা বহুবিস্তারের ব্যবস্থা হইয়াছে; অর্থাৎ এক স্থানে কোনও বক্তৃতা বা সঙ্গীত হইলে বে-তারে বাহিত হইয়া তাহা অতি দূরবর্ত্তী স্থানেও বহু ব্যক্তি কর্ত্তৃক একই সময়ে শ্রুত হয়। কলিকাতায় 'রেডিও' বা

বহুবিস্তারের ষ্টেশন থাকায় অনেক সঙ্গতিপন্ন লোক স্ব স্ব গৃহে বসিয়া সঙ্গীত, অভিনয়, বক্তৃতাদি শুনিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

জরিপ—বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এবং বিভিন্ন কারণে দেশে নানারূপ জরিপ করা হইয়াছে। ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্য-সংগ্রহের জন্য ধারাবাহিক অনুসন্ধান চলিয়াছে। ইহার অধিকাংশই ইংরেজ আমলে হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে আকবরের রাজত্বকালে তৎকর্ত্তৃক শাসিত ভারতের রাজস্ব, লোকসংখ্যা ও দ্রব্যজাতের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল এবং আইন-ই-আকবরীতে বিভিন্ন সুবা বা প্রদেশ-সংক্রান্ত নানা বিষয়ে যে বিবরণী পাওয়া যায়, তাহাকে সর্ব্বপ্রথম 'জরিপ' বা অনুসন্ধানের চেষ্টা বলিতে পারা যায়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের তুলনায় ঐ জরিপের কোনও যথার্থতা বা সম্পূর্ণতা ছিল না। আকবরের অনুসন্ধানের ফল কোনও মানচিত্র বা ম্যাপে প্রকটিত হয় নাই। ম্যাপ প্রস্তুত করিবার সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা করিয়াছিলেন একজন ফরাসী ভূগোলবিৎ—ডি য়্যানভিল। ইনি সেই সময়কার সমস্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করিয়া ১৭৫১-৫২ খৃষ্টাব্দে একখানি ম্যাপ অঙ্কন করিয়াছিলেন। মেজর জেম্স্ রেনেল এই বিষয়ক জ্ঞানের আরও বিস্তৃতি সাধন করিয়াছিলেন; ইনি ক্লাইভের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। ইঁহাকে 'ভারতীয় ভূগোলের স্রষ্টিকর্ত্তা' বলা হয়। জরিপ কালে তাঁহার নিজের যে অভিজ্ঞতা-লাভ হইয়াছিল, তাহা তিনি ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে 'বঙ্গদেশের মানচিত্রে' প্রকাশিত করেন। তাঁহার 'হিন্দুস্থানের মানচিত্রের উপকরণ' ১৭৮৮ সালে বাহির হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষের দুইখানি মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছিল; একখানি মাদ্রাজে কর্নেল কল্ ও অপরখানি

বোম্বাইয়ে কর্নেল রেনল্ড্‌স্‌ কর্তৃক অঙ্কিত। কিন্তু ঐ ম্যাপ দুইখানি প্রকাশিত হয় নাই এবং উহা এক্ষণে আর পাওয়া যায় না।

১৮০০ সালে কর্নেল ল্যাম্ব্‌টন্‌ মান্দ্রাজ গভর্নমেণ্টের সম্মতি অনুসারে ও উৎসাহে দক্ষিণ-ভারতে এক অভিনব প্রণালীর 'ভৌগোলিক জরিপ' আরম্ভ করেন। ১৮০২ সালে ভারতবর্ষে 'ত্রিকোণমিতিক জরিপ' অর্থাৎ ত্রিভুজের সাহায্যে জরিপ প্রবর্ত্তিত হয়। ১৮১৮ সালে ঐ জরিপ গভর্নর জেনারলের কর্ত্তৃত্বাধীনে আইসে এবং উহার প্রধান কার্য্যালয় কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়। ১৮২৩ সালে কর্নেল ল্যাম্ব্‌টনের মৃত্যু হয়, কিন্তু তিনি যে প্রণালীর প্রবর্ত্তন করেন, অদ্যাপি তাহার অনুসরণ করা হইতেছে। বিখ্যাত ত্রিকোণমিতিক জরিপের ফলে পৃথিবীর আকারের সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হওয়া গিয়াছে।

চুম্বকের সাহায্যে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের যে জরিপ হইয়াছিল, উহা একটি খাঁটি বৈজ্ঞানিক জরিপ। রয়েল সোসাইটীর দ্বারা ঐ সোসাইটীর সদস্য অধ্যাপক রুকার ১৮৯৭ সালে ইহার প্রবর্ত্তন করেন। প্রকৃতপক্ষে ১৯০১ সালে ইহার আরম্ভ হয়।

স্থানপরিচয়-সংক্রান্ত জরিপ—স্থান সংক্রান্ত বিবরণ-সংযুক্ত এক প্রকার জরিপ আছে; মান্দ্রাজের কয়েক স্থল ব্যতীত ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ও ব্রহ্মদেশের অধিকাংশ স্থলে উহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু এরূপ জরিপ উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে কেহ জানিত না। কর্নেল কলিন্‌ ম্যাকেঞ্জি যে সময়ে দক্ষিণ-ভারতে বিখ্যাত ত্রিকোণমিতিক জরিপের প্রবর্ত্তন করেন, প্রায় সেই সময়ে ইহার আরম্ভ হয়। ত্রিকোণমিতিক জরিপে স্থানপরিচয়-সংক্রান্ত জরিপের সাহায্য হইয়াছিল। প্রথম প্রথম

যে সকল জরিপ হইত, তাহার সঙ্গে প্রায় একটি স্মারক বিবরণ প্রকাশিত হইত। ঐ বিবরণে জরিপকৃত স্থানের আয়-ব্যয় প্রভৃতি বিষয়-সংক্রান্ত সংবাদ, ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত ও নানাবিধ বর্ণনা সন্নিবেশিত হইত। জরিপ কার্য্য ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিতেছে। প্রথমতঃ দেশীয় রাজ্যগুলিতে ও ইংরেজ অধিকৃত 'নন-রেগুলেশন' প্রদেশে জরিপ কার্য্য হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দির মধ্যভাগের পূর্ব্বে ইহা ধারাবাহিকরূপে অনুষ্ঠিত হয় নাই; গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ ইহার কার্য্য বিশেষ ভাবে দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি ভারতবাসিগণ জরিপ করিতে শিখিয়াছে; বর্ত্তমানে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে ভারতীয়েরাও থাকে। অন্যান্য বিভাগের ন্যায়, 'ভারতীয় জরিপ বিভাগ' ভারতীয় এবং প্রাদেশিক এই দুই শাখায় বিভক্ত। প্রথম শাখায় সাধারণতঃ রয়েল ইঞ্জিনীয়ার বা ভারতীয় সৈন্যদল হইতে লোক নিয়োজিত হয়েন; দ্বিতীয় অর্থাৎ প্রাদেশিক শাখায় যে সকল লোক লওয়া হয়, তাঁহারা এই দেশেই নিযুক্ত হয়েন। যোগ্য হইলে উচ্চশাখার কয়েকটি পদেও প্রাদেশিক শাখার লোককে নিযুক্ত করা যাইতে পারে এতদ্ব্যতীত একটি নিম্ন শাখাও আছে; তাহাতে প্রায় ভারতীয়েরাই নিযুক্ত হয়েন।

বন-জরিপ—১৮৭২ সালে স্থানপরিচয়-সংক্রান্ত জরিপের একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়, উহার নাম বন-জরিপ। উহা ১৯০০ সালে ভারতীয় জরিপ বিভাগের সহিত মিলিত হয়।

সীমান্তে ও সীমান্তের বাহিরে জরিপ—ভৌগোলিক তত্ত্বানুসন্ধান ও সীমান্ত-নির্দ্ধারণের জন্য ভারতের বাহিরেও সময়ে সময়ে জরিপ করিতে হইয়াছে। ১৮৭৮-৮০

সালের আফগান যুদ্ধের ও 'আফগান-সীমা-কমিশনের' সময়ে ঐরূপ জরিপ করা হইয়াছিল। সীমান্ত বা সীমান্তের বহির্ভাগে যে জরিপ হয়, তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমীনের দল বা 'সীমা-কমিশনের' কোনও কর্ম্মচারী বা সীমান্ত অভিযানের দ্বারা সম্পাদিত হয়। "আফ্রিকাস্থ নায়াসালণ্ড, ইউগ্যাণ্ডা, আবিসিনীয়া হইতে আরম্ভ করিয়া পারস্য ও আফগানিস্থানের মধ্য দিয়া, নেপাল ও তিব্বতের অধিকাংশ স্থান বাদ দিয়া, এই জরিপের কার্য্য ব্রহ্মদেশের উত্তর ও পূর্ব্ব সীমান্ত পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছে বলা যাইতে পারে।"*

আবিষ্কার, ভৌগোলিক তত্ত্বানুসন্ধান ও জরিপের জন্য ভারতীয়দিগকে শিক্ষা দিবার কল্পনা কাপ্তেন মণ্টগমারি হইতে জন্মলাভ করে। তিনি তখন কাশ্মীরের জরিপে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, ভারতের সীমান্তের বহির্ভাগে এমন সকল স্থান আছে, যাহার আবিষ্কার ও ভৌগোলিক জ্ঞানলাভ অত্যাবশ্যক। অথচ সে সকল স্থানে ইংরেজগণের প্রবেশাধিকার নাই। সেইজন্য তিনি স্থির করিলেন যে "হিন্দুকুশ, বক্ষু বা চক্ষু নদীর (Oxus) উপত্যকা এবং তুর্কীস্থান আবিষ্কার করিতে পাঠানদিগকে পাঠাইতে হইবে; এবং তিব্বত ও চীন সাম্রাজ্যের প্রান্তভাগে ভুটিয়া ও তিব্বতীয়দিগকে নিযুক্ত করিতে হইবে।"†

রাজস্ব-সংক্রান্ত জরিপ—রাজস্ব-সংক্রান্ত জরিপের দ্বারাই স্বভাবতঃ সমস্ত বন্দোবস্তের কার্য্য এবং সমগ্র রাজস্ব-সংক্রান্ত রাজকার্য্য পরিচালিত হইয়া থাকে। ১৮২২ সালে যমুনার পশ্চিমে দিল্লী, পাণিপথ ও রোটক জেলায় এই

* "ইম্পিরিয়াল গেজেটীয়ার," ৪র্থ খণ্ড, ৪৯৭ পৃষ্ঠা।

† " " " ৪৯৯ পৃষ্ঠা।

জরিপ সর্ব্বপ্রথমে আরব্ধ হয়। ১৮৪৭ হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিশ বৎসর কাল পাঞ্জাব, অযোধ্যা, সিন্ধু, মধ্যদেশ ও বঙ্গের জরিপ চলিয়াছিল। ইহা কর্নেল থুইলিয়রের রাজস্ব-জরিপ আমলে সম্পাদিত হইয়াছিল। রাজস্ব-জরিপ তিন প্রকার—(১) স্থান-পরিচয়-সহকৃত জরিপ; (২) গ্রামের জরিপ; (৩) রাজস্বের পরিমাণ স্থির করিয়া তাহা রেজেষ্ট্রি-ভুক্ত করিবার জন্য যে জরিপ হয়। শেষোক্ত জরিপে, জেলার মধ্যে যে সকল ভূসম্পত্তি আছে, তাহার পরিমাণ, বিবরণ ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় থাকে। এগুলি ১৮৭১ সালে প্রবর্ত্তিত হয়। ভারতবর্ষের কয়েকটি জেলায় ও প্রদেশে বে-সরকারী জরিপের উপর নির্ভর করিয়া বন্দোবস্তের কার্য্য করা হইয়াছে। ভারত গভর্নমেণ্টের রাজস্ব-জরিপ উচ্চ ও নিম্ন কেন্দ্র এই দুই ভাগে বিভক্ত। উচ্চ কেন্দ্রের মধ্যে পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও সিন্ধু; নিম্ন কেন্দ্রের মধ্যে বাঙ্গালা (পূর্ব্ববঙ্গ সহ), আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা এবং ব্রহ্মদেশ। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে স্বতন্ত্র কর্ম্মচারীর দ্বারা রাজস্ব-জরিপ সম্পাদিত হইয়াছে। ত্রিকোণমিতিক জরিপ, স্থান-পরিচয় সংবলিত জরিপ এবং রাজস্ব-জরিপ প্রথমে পৃথক্ ছিল। ১৮৭৮ সালে উহাদিগকে একত্র করিয়া 'ভারতীয় জরিপ' বিভাগ (Survey of India) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে যখন যেখানে জরিপের প্রয়োজন হয়, সেইখানেই পাঠান যাইতে পারে। এই বিভাগ 'সার্ভেয়ার জেনারল' নামক উচ্চপদস্থ অধ্যক্ষের অধীন হইল।

'ভারতীয় জরিপের' অন্তর্গত যে জরিপ তাহা ব্যতীত আরও কয়েক প্রকার জরিপ আছে, যথা—(১) সামুদ্রিক জরিপ;

(২) ভূতত্ত্ববিষয়ক জরিপ ;—এই বিভাগের প্রথম উদ্দেশ্য ভারতের ভূতত্ত্ব-বিষয়ক ম্যাপ প্রস্তুত করা। (৩) উদ্ভিদ্-তত্ত্ব বিষয়ক জরিপ—এই জরিপের দ্বারা অনেক প্রকার উদ্ভিদ্ সংগৃহীত হইয়াছে। ভারতীয় গমের কিসে উন্নতি হয়, ইক্ষুর রোগ কি প্রকারে বিনষ্ট হয়, কার্পাসের চাষ কি প্রকারে সফল হইতে পারে, এই বিভাগ সেই সকল বিষয়ের গবেষণায় নিযুক্ত আছে (৪) পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় জরিপ—এই জরিপ যে বিভাগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সে বিভাগ প্রাচীন কীর্ত্তি-সংরক্ষণ, মৃত্তিকা-খনন, ক্ষোদিত লিপির নকল এবং এইরূপ অন্যান্য কার্য্যে ব্যাপৃত আছে। ১৯০৫-৬ সালে প্রায় ১,২০০ ক্ষোদিত লিপি নকল করা হয় এবং আগ্রা, আজমীর, দিল্লী ও লাহোরের মোগল আমলের প্রাচীন কীর্ত্তি-সংরক্ষণে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। লর্ড কার্জন তাঁহার শাসনকালে প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষণ সরকারী কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন এবং সেই সময় হইতে উহা ঐ ভাবেই চলিয়া আসিতেছে।

কল কারখানা—কল কারখানা ভারতবর্ষে অপেক্ষাকৃত আধুনিক ব্যাপার। ১৮৫১ সালের পূর্ব্বে ভারতে কাপড়ের কল ছিল না। সম্প্রতি অনেকগুলি কল হইয়াছে—বোম্বাই অঞ্চলেই বেশী। তাহাদের সংখ্যা ও কার্য্যক্ষেত্র দিন দিন বাড়িতেছে। ঐ সকল কল হইতে উৎপন্ন দ্রব্য কেবল ভারতে নহে, জাপান, চীন এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশে ব্যবহৃত হইতেছে। বঙ্গদেশে পাটের কলও বৃদ্ধি পাইতেছে এবং বহু শ্রমজীবীর অন্ন জোগাইতেছে। পাট ও পাট হইতে প্রস্তুত দ্রব্য ক্রমেই অধিক পরিমাণে কলিকাতা হইতে রপ্তানী হইতেছে।

উত্তর ভারতে যে সকল পশমী দ্রব্যের কল আছে, তাহার অবস্থা দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছে। কাগজের কলও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং উহাতে লাভ হইতেছে। বঙ্গ ও ব্রহ্মদেশে চাউলের ও কাঠের কল ক্রমেই সংখ্যায় বাড়িতেছে ও কার্য্য-ক্ষেত্রের বিস্তার করিতেছে। খনির ব্যবসায় ও দ্রব্যনির্ম্মাণ ব্যবসায় দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছে। একটি সরকারী মন্তব্যে লিখিত হইয়াছে, "বাঙ্গালার বন্দরসমূহে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে; তাহা হইলেও কল কারখানা ও খনির যেরূপ প্রাচুর্য্য হইয়াছে, তাহা বাণিজ্যের উন্নতিকেও হীনপ্রভ করিয়াছে। এই সকল কল কারখানা হওয়াতে প্রধান নগরগুলি এক একটি প্রকাণ্ড শ্রমশিল্পবহুল স্থানে পরিণত হইয়াছে। গঙ্গা বাহিয়া উত্তর দিকে যাইতে যাইতে যে দৃশ্য দেখা যায়, সংখ্যার দ্বারা তাহার কোনও আভাসই দেওয়া সম্ভব নহে। গঙ্গার উভয় তীরে সুদীর্ঘ চিমনীগুলি দাঁড়াইয়া আছে এবং নদীর প্রতি বাঁকে দেখিতে পাওয়া যায়, কুঠি বা কারখানার সারি বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে।" চায়ের জন্য যে সকল কারখানা হইয়াছে, সেগুলি বাদ দিলেও, বড় বড় কারখানার সংখ্যা ১৮৯১-৯২ সালে ৮৯১ ছিল। ১৯০০-০১ সালে ঐ সংখ্যা ১,৭১৮ হইয়াছিল। ১৯২৬ সালে কল কারখানার সংখ্যা হইয়াছিল ৭,২৫১ এবং কল কারখানার লোক-সংখ্যা হইয়াছিল ১৫ লক্ষেরও উপর। কল কারখানাগুলিকে অন্যূন ৫০ শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে; তাহার মধ্যে হাড় গুঁড়াইবার কল, সিমেণ্টের কারখানা, গালার কারখানা, তৈলের কল, মাটীর বাসনের কারখানা, টালি, চিনি ও চামড়ার কারখানা, চাউল ও ময়দার কল, রেশমের

কারখানা, দড়ির কারখানা ইত্যাদি আছে। ইয়ুরোপে যে মহাসমর বাধিয়াছিল, তাহার অবসানে এই সকল কল কারখানার সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বাঙ্গালায় যে সমস্ত শ্রমশিল্প-ব্যবসায় আছে, তাহার বিস্তৃত বৃত্তান্ত সার জন কামিংএর বিবরণে পাওয়া যায়। ঐ লেখক বলিয়াছেন, "যে সকল কারখানায় বৃহৎ কলের প্রয়োজন, সেগুলি প্রধানতঃ কলিকাতার নিকটে ভাগীরথীর উভয় তীরে অবস্থিত। এগুলি ইয়ুরোপীয়গণের মূলধনে ও ইয়ুরোপীয়গণের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। গভর্নমেণ্ট নিজেই বহু শ্রমজীবী নিযুক্ত করিয়া থাকেন এবং নিজেদের কারখানায় বহুবিধ দ্রব্য নিৰ্ম্মাণ করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইছাপুরের অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা, দমদমার বারুদের কারখানা, কাশীপুর ও ইছাপুরের গোলাগুলির কারখানা, কাঁচড়াপাড়া, বেলেঘাটা, শিয়ালদহ ও চিৎপুরের রেলওয়ে কারখানা, খিদিরপুরের জাহাজের কারখানা, আলিপুরের জামাকাপড়ের কল, ভবানীপুরের টেলিগ্রাফ-সামগ্রীর ভাণ্ডার, পাটনায় আফিং ও আফিঙের বাক্সের কারখানা, এবং ডিহিরী, মেদিনীপুর, কটক ও কলিকাতার খাল সম্বন্ধীয় ভাণ্ডারের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

"বাঙ্গালা দেশে কত প্রকার কল কারখানা আছে, তাহা অনেকেই ধারণা করিতে পারেন না। এই সকল কারবারে দেশের মূলধন আরও অধিক পরিমাণে নিয়োজিত হইতে পারে 'বাণিজ্য-সংক্রান্ত সংবাদ' বিভাগ কলকারখানার তালিকা প্রস্তুত করিবার সময় মাত্র সেইগুলি ধরিয়াছেন, যাহাতে ৫০ জন বা তাহার বেশী শ্রমিক নিযুক্ত আছে। সেরূপ ভাবে ধরিলেও আমরা দেখিতে পাই যে, বাঙ্গালা দেশে ১৯০৫ সালে যে সকল কল

কারখানা ব্রিটিশ ভারতের আয়-ব্যয় ও বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় তালিকাভুক্ত হইয়াছিল, তাহা অনেক বিভিন্ন প্রকারের ; যথা—

(১) বয়ন-সম্বন্ধীয় :—তূলা হইতে বীজ ছাড়াইবার কল, কাপড়ের কল, পাটের কল, গাঁট বাঁধিবার কল, দড়ির কারখানা, রেশমের সূতা নাটাইবার কল।

(২) খনিজ-সম্বন্ধীয় :—কয়লার খনি, লোহার খনি, অভ্রের খনি, অভ্র চেরাইয়ের কারখানা, সোরা পরিষ্কার করিবার কারখানা এবং পিতল ঢালাইয়ের কারখানা।

(৩) যান-বাহন-সম্বন্ধীয় :—পোত-নির্ম্মাণ-স্থল, রেলওয়ে ও ট্রামওয়ের কারখানা।

(৪) বিবিধ :—হাড় চূর্ণ করা, সিমেণ্টের কারখানা, রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা, মদের ভাঁটি, দুধের কারবার, ময়দার কল, বরফ এবং সোডা লেমনেড ইত্যাদির কারখানা, চিনির কুঠি, গ্যাসের কারখানা, নীলের কুঠি, কেরোসিনের টিনের কারখানা, গালার কুঠি, কাগজের কল, চীনা মাটীর বাসনের কারখানা, ছাপাখানা, সাবানের কারখানা, চামড়ার কারখানা, টালির কারখানা, এবং বিবিধ সরকারী ও বে-সরকারী কারখানা।"

কারখানা-সংক্রান্ত আইন কল কারখানায় যে সকল মজুর খাটে, তাহাদের বাসস্থান ও অন্যান্য সুবিধার জন্য গভর্নমেণ্ট সতত চেষ্টা করিতেছেন। ১৯২২ সালে কারখানা-সংক্রান্ত আইনের সংশোধন হইয়াছিল। নূতন যে কারখানা আইন (Factories Act) হইল, তাহাতে অনেকগুলি উন্নতি সাধিত হইয়াছে ; তন্মধ্যে সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টার অধিক কেহ কাজ করিতে পারিবে না ; ১২ বৎসরের কম বয়সের কোনও বালককে

মজুর নিযুক্ত করা হইবে না এবং স্ত্রীলোকদিগকে রাত্রিতে কাজ করিতে দেওয়া হইবে না, ইত্যাদি নিয়মগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই আইনের ফলে 'ফ্যাক্টরী' শব্দ অনেক ব্যাপক অর্থে গৃহীত হইল এবং যে সকল কারবার বা কারখানাগুলিকে পূর্ব্বে ফ্যাক্টরীর মধ্যে ধরা হইত না, সেগুলিও এই আইনের অধিকারভুক্ত হইল। ১৯২৩ সালে আরও কতকগুলি ছোটখাটো পরিবর্ত্তন হইল।

খনিজ পদার্থ—ভারতবর্ষের খনিজ পদার্থের মধ্যে সোণা, কয়লা, লৌহ, কেরোসিন, লবণ, সোরা, ম্যাঙ্গানীজ, অভ্র, চুণী, পান্না প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে টাটার লোহার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহা শিক্ষিত, উৎসাহশীল ভারতবাসীদের ব্যবসায়বুদ্ধির পরিচায়ক ও স্বদেশের কল্যাণ-কামনার কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ।

১৯০১ সালের খনি-সংক্রান্ত আইন ব্রিটিশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত। খনি-সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য এই আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ১৯০৬ সালে এই আইনের নিয়মাধীন প্রায় নানা প্রকারের ৭৫০টি খনি ছিল। ইহার মধ্যে তিন শতের অধিক কয়লার খনি; সেগুলি প্রধানতঃ বাঙ্গালা দেশে অবস্থিত।

খনির কাজ, বিশেষতঃ কয়লার খনির কাজ, ভারতে বড় বেশী দিন প্রচলিত হয় নাই। কিছুদিন পূর্ব্বেও, লোকেরা জীবিকার জন্য কেবল খনির কার্য্যের উপর নির্ভর করিতে ভরসা করিত না; অবসর মত অন্যান্য কাজও করিত। কিন্তু এই অবস্থা ক্রমেই চলিয়া যাইতেছে। যেরূপ বোধ হইতেছে, তাহাতে খনির কাজের জন্য শীঘ্রই একটি নূতন জাতি গড়িয়া

উঠিবে। ভারতীয়েরা যে খনি-সম্বন্ধীয় অনেক কাজে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারে, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

'ভারতীয় খনি-সংক্রান্ত আইন'ও (Indian Mines Act) বহু পরিমাণে সংশোধিত হইয়াছে। ১৯২৩ সালে যে নূতন আইন হইয়াছে, তাহার ফলে নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। ১৩ বৎসরের কম বয়সের কোনও বালককে খনির কাজে নিযুক্ত করা বা তাহাদিগকে মাটীর নীচে কাজ করিতে দেওয়া নিষিদ্ধ; বয়স্ক লোকদিগকে সপ্তাহে খনির উপরে ৬০ ঘণ্টা এবং মাটীর নীচে ৫৪ ঘণ্টার বেশী খাটানো নিষিদ্ধ; আর সপ্তাহে একদিন বিশ্রামের জন্য দিতেই হইবে। 'মাইন' (খনি) শব্দকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করায় আইনের প্রয়োগ-স্থল বাড়িয়া গিয়াছে। এই আইনের বলে গভর্নমেণ্ট স্ত্রীলোকদিগকে মাটীর নীচে কাজ করিতে দিতে নিষেধ করিতে পারেন।

পতিত জমির উদ্ধার—ভারতবর্ষে যে সকল পতিত জমি আছে, তাহা আবাদ করিবার জন্য ব্রিটিশ শাসনের প্রথম হইতেই চেষ্টা চলিতেছে। গভর্নমেণ্ট এ বিষয়ে প্রজাগণকে নানাপ্রকারে উৎসাহ দান করিয়া থাকেন।

পুষ্করিণী ও কূপ খনন করিয়া পানীয় জলের ব্যবস্থা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গভর্নমেণ্ট না করিলেও, অনেক স্থলে গভর্নমেণ্টের উৎসাহে হইয়াছে বলা যায়। বে-সরকারী লোকে কূপ, পুষ্করিণী কাটাইলে গভর্নমেণ্ট তাহাতে উৎসাহ দিয়া থাকেন; এবং ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড প্রভৃতিকে সময়ে সময়ে ঐ কার্য্য করিতে বাধ্য করিয়া থাকেন।

দেশরক্ষা—জলপথে বা স্থলপথে যেখানে বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা আছে, গভর্নমেণ্ট দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সেই

সকল স্থান সুরক্ষিত করিয়াছেন। কলিকাতা ও বোম্বাই নগরে অর্ণবপোত-নির্ম্মাণের কারখানা হইয়াছে। ঐ দুই সহরে এবং মান্দ্রাজ, চট্টগ্রাম ও করাচী নগরে পোতাশ্রয় প্রস্তুত হইয়াছে। কলিকাতা হইতে দক্ষিণে কয়েক ঘণ্টার পথ গেলেই, ডায়মণ্ড হার্‌বার নামক বন্দর পাওয়া যায়। সব বন্দরেই জাহাজ হইতে সহজে নামিবার জন্য 'জেঠী' নির্ম্মিত হইয়াছে। নদীতেও ষ্টীমারে উঠিবার নামিবার বিশেষ সুবিধা ছিল না; আজকাল ঘাট প্রস্তুত করিয়া দেওয়ায় অনেক সুবিধা হইয়াছে। অনেক বড় বড় সেতু নিম্মিত হইয়াছে, যথা—রোরী লক্কড় সেতু, যমুনার সেতু, শোণের সেতু, গঙ্গার উপর জুবিলি সেতু, কাশীতে ডফ্‌রীন সেতু, শাড়ায় হার্ডিং সেতু এবং কলিকাতার নিকট সুবৃহৎ বালি-সেতু। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক সেতু নির্ম্মিত হইতেছে, অথবা নির্ম্মাণের কল্পনা হইতেছে।

বন-বিভাগ—এ দেশের কল্যাণের জন্য গভর্নমেণ্ট যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন, তন্মধ্যে বন-রক্ষার ব্যবস্থা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই উদ্দেশ্যে অনেক আইন পাস হইয়াছে এবং গভর্ন-মেণ্টের একটি স্বতন্ত্র বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে। গত শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বনজঙ্গল সম্বন্ধে কোনও ব্যবস্থাই ছিল না; তাহার ফলে যে কোনও লোক বনের কাঠগুলি নিজ নিজ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিয়া লাভবান্ হইত; অথচ সে কাঠ বাজারে বিক্রয় করিতে পারিলে দেশের পক্ষে অনেক অর্থাগম হইতে পারিত। অন্য অনেক স্থলে বন্য জমি কৃষিযোগ্য করিবার উদ্দেশ্যে লোকে ঘাসে আগুন ধরাইয়া দিত; সেই আগুনে বহুদূর পর্য্যন্ত জঙ্গলের বড় বড় গাছ পুড়িয়া যাইত। হিমালয়ের সানুদেশ

হইতে গাছ কাটিয়া লওয়ায় পাহাড়ের গাত্র অনাবৃত হইয়া পড়িত এবং যখন বন্যা হইত, তখন নিম্নস্থ সমতলের বহু ক্ষতি হইয়া যাইত। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এই বিষয়ের প্রতীকার আরব্ধ হইয়াছে; বর্ত্তমানে আর ঐ প্রকারের ক্ষতি হইতে পারে না। দেশের সর্ব্বত্র বনজঙ্গল-রক্ষার্থ এবং বড় বড় বৃক্ষের উৎকর্ষ-সাধনের উদ্দেশ্যে একটি সরকারী বিভাগের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। *

এই নীতি ভারতবর্ষে অনুসৃত হইলে যে অশেষ সুফল হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। কারণ ব্রিটিশ-ভারতের আয়তনের একপঞ্চমাংশ অর্থাৎ প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইল বনবিভাগের অধীন। ভারতীয় অরণ্য হইতে গভর্ন-মেণ্টের অনেক রাজস্ব আদায় হয়। ১৯২২-২৩ সালে প্রায় ১ কোটী ৫৬ লক্ষ টাকা লাভ হইয়াছিল। ১৯২৫-২৬ সালে এই লাভ আড়াই কোটী টাকার উপর দাঁড়াইয়াছিল। বড় বড় গাছ বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হইলে এবং বনবিভাগের কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হইলে আয় বাড়ে। নূতন নূতন বাজারে ভারতীয় কাষ্ঠ-বিক্রয় এবং নূতন নূতন কাজে উহা লাগাইতে পারা, জঙ্গল হইতে গাছ কাটিয়া বাহির করিবার প্রণালী এবং উহা কার্য্যে লাগাইবার প্রণালীর উৎকর্ষসাধন ও অপেক্ষাকৃত অল্প প্রয়োজনের নানা বস্তু বন্য দ্রব্য হইতে যাহাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়—এই সমস্ত বিষয়ে ব্যবস্থা করিয়া ভারতীয় বনজঙ্গল হইতে বহুপরিমাণে রাজস্ব উৎপন্ন করা যাইতে পারে। সুতরাং এ দিকে ভবিষ্যৎ উন্নতির যথেষ্ট অবসর রহিয়াছে। অনেক প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট তাঁহাদের নিজ নিজ

* সার জর্জ্জ চেস্‌নীর "ভারতীয় রাজনীতি," তৃতীয় সংস্করণ ১৬০ পৃষ্ঠা।

প্রদেশের উন্নতির পক্ষে আপাততঃ যে সকল কর্ম্মচারী নিয়োগ করা আবশ্যক, তাহা করিয়াছেন। 'ভারতীয় শ্রমিক শিল্প কমিশনে'র মন্তব্যের ফলে, দেরাদুনের 'আরণ্য অনুসন্ধানালয়' (Forest Research Institute) অনেক বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। তথায় অনেক বিষয়ের অনুসন্ধানে সুফল পাওয়া যাইতেছে। দেরাদুনের ফরেষ্ট কলেজে অনেক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি কার্য্য করিতেছেন। তাঁহারা বন-সম্বন্ধীয় শিল্প-সংক্রান্ত তথ্য, কাষ্ঠ পরীক্ষা করা, উহাকে শক্ত ও কঠিন করা, বেশী দিন স্থায়ী করা ও কাষ্ঠ হইতে কাগজ প্রস্তুত করা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন।

পয়ঃপ্রণালী—উত্তর-ভারতে খাল কাটিয়া জল সরবরাহ না করিলে চলে না; সেখানে ইহার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। ব্যবস্থাও অতি চমৎকার হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে (দোয়াব) বড় বড় খাল কাটানো হইয়াছে। ঐ সকল খালের দ্বারা গঙ্গা ও যমুনা হইতে জল বাহিত হয়। দুইটি বড় খাল গঙ্গার জল ক্ষেত্রে লইয়া যায়; আর হিমালয় হইতে যমুনা যে জল লইয়া আসে, তাহার প্রায় সমস্তটা তিনটি ছোট খালের দ্বারা বাহিত হয়। পৃথিবীতে যত খাল আছে, তাহার মধ্যে ভারতবর্ষের খালই সব চেয়ে বড়। বিহারে শোণ নদ হইতে খাল কাটানো হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে উত্তর-প্রদেশের ন্যায় খালের প্রয়োজন হয় না; কাজেই এখানে কয়েকটি ছোট ছোট খাল কাটানো হইয়াছে মাত্র। উড়িষ্যায় অনেকগুলি বড় বড় খাল আছে। পাঞ্জাবে সিরহিন্দ্ নামক খাল শতদ্রুর (Sutlej) জল বহন করে। চন্দ্রভাগা (Chenub) হইতেও একটি খাল কাটা হইয়াছে। এ দেশের মধ্যে পাঞ্জাবের খাল-বিভাগই

সর্ব্বাপেক্ষা বড়। মধ্য ও দক্ষিণ-ভারতের অনেক স্থলে হ্রদ বা জলাধার হইতে জল সরবরাহ হয়। মান্দ্রাজে গোদাবরী ও কৃষ্ণার জল-সরবরাহের জন্য এক উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, উহা যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের প্রণালী হইতে স্বতন্ত্র। "নদী সমুদ্রে পড়িবার পূর্ব্বে তিনটি 'ব'দ্বীপের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রত্যেকটি 'ব'দ্বীপের উপরিভাগে নদীর এ-পার হইতে ও-পার পর্য্যন্ত বাঁধ বা 'আনিকাট' দিয়া জল কাটা-খালে চালাইয়া দেওয়া হয়। এই কাটা-খালের কোনও কোনওটিতে নৌকা চলে।" তাঞ্জোরে কাবেরী নদীর 'ব'দ্বীপে এইরূপ প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে। ইংরেজাধিকৃত ভারতে খাল ও পয়ঃপ্রণালীর মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৬৭,০০০ মাইল হইবে। যে সকল ভূমিতে ঐ খালের জল সরবরাহ হয় তাহার পরিমাণ ২ কোটী ৬৫ লক্ষ একর। ক্ষেত্রে জল সরবরাহ করা যে অত্যন্ত আবশ্যক, তাহা গভর্নমেণ্ট প্রণিধান করিয়াছেন। লর্ড কার্জ্জনের সময় হইতে এই বিষয়ে গভর্নমেণ্টের বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। এ দিকে অনেক উন্নতির আশা করা যায়। শাসনসংস্কার-প্রবর্ত্তনের ফলে, খাল কাটানো একটি প্রাদেশিক বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এ বিষয়ে প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট যাহাতে আবশ্যক মত অর্থ অবাধে ব্যয় করিতে পারেন, তাঁহাদিগের প্রতি সে ক্ষমতাও দেওয়া হইয়াছে। ১৯০১ হইতে ১৯০৩ সাল পর্য্যন্ত যে 'ভারতীয় পয়ঃপ্রণালী কমিশন' বসিয়াছিল, তাহার মন্তব্য এক্ষণে ধীরে ধীরে কার্য্যে পরিণত করা হইতেছে।

স্বাস্থ্য—দেশে স্বাস্থ্যের উন্নতি করিবার ভার গভর্নমেণ্ট লইয়াছেন ; অর্থাৎ সাধারণের স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল থাকে, এবং

এ বিষয়ে যাহাতে আরও উন্নতি হয়, তৎসম্বন্ধে সমস্ত ব্যবস্থা করিবার ভার গভর্নমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা 'চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিভাগ' স্থাপিত করিয়াছেন; হাঁসপাতাল, ঔষধালয় ও পাগলা-গারদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জন্মমৃত্যুর তালিকা-সংগ্রহ এবং সাধারণ স্বাস্থ্য-রক্ষা ও টীকা দিবার ব্যবস্থা, চিকিৎসা সম্বন্ধে আইন-ঘটিত ব্যাপার সম্পর্কে ব্যবস্থা, রোগবীজ-পরীক্ষা ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধানের ব্যবস্থা গভর্নমেণ্ট করিয়াছেন। বিদেশ হইতে কোনও সংক্রামক ব্যাধি এ দেশে প্রবেশ না করিতে পারে, সে বিষয়ে গভর্নমেণ্ট সর্ব্বদা সতর্ক রহিয়াছেন। প্রত্যেক বন্দরে স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থা আছে: পরীক্ষা না করিয়া কোনও জাহাজের আরোহী বা নাবিককে তীরে নামিতে দেওয়া হয় না। চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্য প্রাদেশিক রাজধানীগুলিতে পূর্ব্বেই চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। ১৭৭৯ সালে মান্দ্রাজে একটি 'সাধারণ হাঁসপাতাল' স্থাপিত হয় এবং ১৮০০ হইতে ১৮২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আর ৪টি হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতায় 'প্রেসিডেন্সী জেনারল হাঁসপাতাল' ১৭৯৫ সালে এবং মেডিকেল কলেজ (জ্বর চিকিৎসার জন্য) ১৮৫২-৫৩ সালে স্থাপিত হয়। কয়েক বৎসর হইল কলিকাতার উত্তর পল্লীতে 'বেলগেছিয়া মেডিকেল কলেজ' স্থাপিত হইয়াছে। বে-সরকারী মেডিকেল কলেজ-স্থাপনের এই প্রথম উদ্যম বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বঙ্গের গভর্নমেণ্ট বড় বড় নগরে স্থানীয় লোকের যত্ন দেখিলে ও উপযুক্ত ডাক্তার পাওয়া গেলে, হাঁসপাতাল ও ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। পরে, যে পরিমাণ চাঁদা স্থানীয় লোক দিতে প্রস্তুত,

সেই অনুসারে তাঁহারা ডাক্তার নির্ব্বাচন করিয়া দিতে এবং ঔষধ ও যন্ত্রাদি সরবরাহ করিতে সম্মত হইলেন। মিউনিসিপ্যালিটী ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড হওয়ার পর হইতে, স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষেরা চিকিৎসার ব্যবস্থা সম্বন্ধে অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯০২ সালে প্রধান রাজধানীগুলিতে যে সকল চিকিৎসালয় ছিল, তাহা ব্যতীত ইংরেজাধিকৃত ভারতে প্রায় ২,৪০০ সরকারী হাঁসপাতাল ও চিকিৎসালয় * এবং ৫০০ বে-সরকারী স্বাধীন চিকিৎসালয় ছিল। এতদ্ব্যতীত পুলিস, রেলওয়ে প্রভৃতির সংস্পৃষ্ট বিশেষ চিকিৎসালয় ছিল ৫০০। বোম্বাই, ব্রহ্মদেশের উপরিভাগ এবং মধ্যপ্রদেশ ব্যতীত অন্য স্থানে গভর্ণমেণ্ট খুব কম হাসপাতালই নিজ ব্যয়ে চালাইয়া থাকেন। প্রায় সমস্ত প্রদেশেই মিউনিসিপ্যালিটী ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের দ্বারা অধিকাংশ চিকিৎসালয় পরিচালিত হয়। কোথায়ও কোথায়ও গভর্ণমেণ্ট অর্থ দিয়া, কর্ম্মচারী দিয়া এবং অন্য ভাবে সাহায্য করেন। সাধারণতঃ হাঁসপাতালের যিনি অধ্যক্ষ হয়েন, গভর্ণমেণ্ট নিজ কর্ম্মচারীর মধ্য হইতে কাহাকেও সেই পদের জন্য দিয়া থাকেন; তাঁহার বেতন স্থানীয় সংগৃহীত অর্থ হইতে দেওয়া হয়। † ১৯০২ সালে এইরূপে সাধারণ চিকিৎসালয় হইতে প্রায় ২ কোটী ৬৫ লক্ষ লোকের চিকিৎসা হইয়াছিল। এই সংখ্যা হইতে অবশ্য ঠিক কত লোকের চিকিৎসা হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায় না; কেননা একই লোক বৎসরের মধ্যে বহুবার হয়ত চিকিৎসার জন্য আসিয়াছিল। সম্প্রতি স্ত্রীলোকের চিকিৎসার জন্য লেডি ডাক্তার এবং তাঁহার নিম্নস্থ কর্ম্মচারীদের

* ১৯১০ সালে এই প্রকার প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ২,৬৮৫।

† "ইম্পিরিয়াল গেজেটীয়ার," ৪র্থ খণ্ড, ৪৬২ পৃষ্ঠা।

শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। স্থানীয় হাঁসপাতালে দেশীয় ধাত্রী-দিগের শিক্ষার সুব্যবস্থা হইয়াছে। ১৮৮৫ সালে লেডি ডফ্‌রিন "ভারতীয় স্ত্রীলোকের চিকিৎসার জন্য জাতীয় সমিতি"র প্রতিষ্ঠা করেন; ঐ সমিতি অনেক ভাল কাজ করিয়াছেন। এই সমিতি স্বেচ্ছাদত্ত দান ও গভর্নমেণ্টের সাময়িক সাহায্য দ্বারা ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ১৯০১ সালে এই সমিতিকর্ত্তৃক পরিচালিত হাঁসপাতালে অথবা আশ্রমে প্রায় কুড়ি লক্ষ রমণী ও শিশু চিকিৎসা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৯০১-১৯০২ সালে লেডি কার্জ্জন দেশীয় ধাত্রীগণের শিক্ষার্থ প্রায় ৭ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। লেডি মিণ্টো শুশ্রূষাশ্রমের জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। লেডি হার্ডিং 'কটেজ হাঁসপাতালে'র প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অনেক ভদ্র গৃহস্থ যাঁহারা কোনও প্রকারেই হাঁসপাতালে যাইতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারাও এই 'কটেজ হাঁসপাতালে' যাইতে আপত্তি করিতেছেন না। লেডি হার্ডিং দিল্লীতে স্ত্রীলোকের জন্য একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া যান।

শিশু-মৃত্যু—ভারতবর্ষের সাধারণ স্বাস্থ্য-রক্ষা-সম্পর্কে শিশু-মৃত্যু একটি গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গণিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রতি বৎসর এ দেশে ন্যূনাধিক ২০ লক্ষ শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সম্প্রতি ইহার প্রতীকারের জন্য মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। লেডি চেম্‌স্‌ফোর্ড "সমগ্র ভারতীয় মাতৃত্ব ও শিশুমঙ্গল-পরিষদে"র প্রতিষ্ঠা করেন। লেডি রেডিং উৎসাহের সহিত এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; তিনি যে "জাতীয় শিশু সপ্তাহ" নামে একটি প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাহাতে

বহু লোকে আগ্রহের সহিত যোগ দিতেছে। পুনা সেবাসদন-সমিতি, জাতীয় সেবা-পরিষৎ, ভারত সেবক-সমিতি প্রভৃতির ন্যায় হিতকরী সভা-সমিতিগুলি এই অকালমৃত্যু-নিবারণের চেষ্টায় ব্যাপৃত হইয়াছেন। লেডি রেডিং দেশীয় ডাক্তার ও শুশ্রূষাকারিণী আরও অধিক সংখ্যায় তৈয়ার করিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; তাহাতে কালে অনেক সুফলের সম্ভাবনা আছে।

চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা—স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে হইলে, রোগ ও তন্নিবারক ঔষধ সম্বন্ধে নানা অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক। ১৯২৩ সালের শেষ ভাগে কলিকাতায় চিকিৎসকদের এক সম্মিলন হইয়াছিল। অনেক সরকারী ডাক্তার এই সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। এই সম্মিলনের আলোচনার ফলে ভারত গভর্নমেণ্ট কালাজ্বরের উৎপত্তি ও বিস্তার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য বিশেষজ্ঞদের এক কমিশন বসাইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে যে কুষ্ঠরোগ-প্রতীকার সমিতি আছে, লর্ড রেডিং ভারতে তাহার একটি শাখা স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই রোগের বিরুদ্ধে রীতিমত সংগ্রাম করিবার জন্য সকলে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। কলিকাতায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রোগ-চিকিৎসার জন্য সার লেনার্ড রজার্সের চেষ্টায় যে কলেজ স্থাপিত হইয়াছে (School of Tropical Medicine), সেই কলেজ ঐ সমস্ত রোগের বিষয় বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিতেছেন। ১৯২৭ সালের শেষভাগে এই কলেজে 'সুদূর প্রাচ্য সম্মিলনে'র এক অধিবেশন হইয়াছিল। ভারতীয় রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক এই সম্মিলনে (Congress) সমবেত হইয়াছিলেন।

পশু-চিকিৎসা—পশু-চিকিৎসালয়ের সংখ্যাও বাড়িতেছে এবং অনেকে ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেছেন। ভ্রমণকারী পশু-চিকিৎসক আছেন; তাঁহারা গ্রামে গ্রামে গমন করিয়া পশুর চিকিৎসা করেন। এই সকল ডাক্তার ১৯১১-১২ সালে ৯৭,৬৭৪টি গ্রামে গিয়াছিলেন এবং ৪,৬৫.৭৩৬টি পশুর রোগ চিকিৎসা করেন। পীড়িত ও অসমর্থ পশুর জন্য দয়ালু ব্যক্তিরা পিঁজরাপোল স্থাপন করিয়াছেন। গৃহপালিত পশুদের রক্ষা ও উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে।

বাতুলাশ্রম—১৮৫৮ সালের আইন অনুসারে বাতুলাশ্রম বা পাগলা-গারদ স্থাপিত হয়। এই সকল গারদে পাগলদিগকে রাখিবার এবং নারোগ হইলে তাহাদিগকে মুক্তি দিবার ব্যবস্থা আছে। এ সকল আশ্রম পরিদর্শকদিগের কর্ত্তৃত্বাধীন রাখা হইয়াছে। সমস্ত পাগলা গারদ গভর্নমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত। ছোট ছোট গারদগুলি কমাইয়া মান্দ্রাজ বোম্বাই, বাঙ্গালা, যুক্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবে কতকগুলি বড় পাগলা-গারদ স্থাপন করিবার সঙ্কল্প হইয়াছে। ১৯১১ সালের লোকগণনায় সাড়ে একত্রিশ কোটী লোকের মধ্যে ৮১,০০৬ জন উন্মাদ বলিয়া উল্লিখিত আছে। *

* চারিবারের লোকগণনায় বাতুলের সংখ্যা

৮১,০০৬	৬৬,০০৫	৭৪,২৭৯	৮১,১৩২
অর্থাৎ এক লক্ষের মধ্যে ২৬ জন উন্মাদ।	২৩ জন	২৭ জন	২৫ জন

কুষ্ঠাশ্রম—কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসা ও বাসের জন্য কয়েক স্থানে কুষ্ঠাশ্রম নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৮৯০-৯১ সালে কুষ্ঠরোগের বিষয় তদন্ত করিবার জন্য এক কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল। পুনরায় এ সম্বন্ধে তদন্ত চলিতেছে। কুষ্ঠরোগীরা প্রকাশ্য রাজপথে দয়ার উদ্রেক করিবার জন্য তাহাদের ক্ষতস্থান খুলিয়া রাখিতে না পারে, খাদ্যদ্রব্য-বিক্রয় প্রভৃতি ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে না পারে এবং সাধারণের ব্যবহার্য্য পুষ্করিণী ও কূপ ব্যবহার করিতে না পারে, তজ্জন্য আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে কমিশন পরামর্শ দিয়াছেন। "বর্ত্তমানে ভারতে কুষ্ঠাশ্রমের সংখ্যা ৭৩; ইহাতে প্রায় ৫ হাজার কুষ্ঠরোগী আছে। সমস্ত কুষ্ঠরোগীর মধ্যে শতকরা ৪·৭ জন মাত্র এই সকল কুষ্ঠাশ্রমে বাস করে।"*

মহামারী—চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য-বিভাগের একটি প্রধান কর্ত্তব্য মহামারী-নিবারণ। যখন যেখানে কলেরা, বসন্ত, সংক্রামক জ্বর প্রভৃতি মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই সেখানে অভিজ্ঞ চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া পাঠানো হয়; তাঁহারা রোগীর শুশ্রূষা, রোগনিবারণের ব্যবস্থা এবং রোগোৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করেন। প্লেগ, বেরিবেরি, কালাজ্বর এবং সম্প্রতি ইনফ্লুয়েঞ্জা ও হুকওয়ার্ম নামক রোগ প্রতিষেধের নিমিত্ত নানা উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। চিকিৎসা ও বীজাণু সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান হইয়াছে। ক্ষিপ্ত শৃগাল-কুক্কুরাদি কর্ত্তৃক দষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য কসৌলিতে "ভারতীয় পাস্তুর চিকিৎসালয়" স্থাপিত হইয়াছে। ইহা একটি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান হইলেও গভর্নমেণ্ট হইতে সাহায্য পাইয়া থাকে। যাহারা কসৌলি হইতে বহুদূরে

* ১৯১১ সালের সেন্সাস্ রিপোর্ট।

বাস করে, তাহাদের জন্য মান্দ্রাজে কুনুর নামক স্থানে ১৯০৭ সালে আর একটি 'পাস্তুর চিকিৎসালয়' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার পরে শিলংএ আর একটি হইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতায় গ্রীষ্ম-প্রধান দেশজ ভেষজ-শিক্ষালয়ে এই প্রকারের চিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়াছে। ব্রহ্মদেশেও একটি চিকিৎসালয়-স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে; তাহাতেও ক্ষিপ্ত কুকুরাদি-দষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। ভারতবর্ষের অনেক স্থলে জন্ম-মৃত্যু রেজেষ্ট্রী করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বসন্ত-নিবারণের জন্য টীকা লওয়া অধিকাংশ স্থলে অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে; টীকা না লইলে দণ্ডনীয় হইতে হয়। কলেরা, প্লেগ, ডিপ্থিরিয়া ও যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে টীকা লওয়ার উপকারিতা ক্রমশঃ লোকে বুঝিতে পারিতেছে। বস্তী অর্থাৎ যেখানে কতকগুলি কুঁড়ে ঘর আছে, তাহার উন্নতিকল্পে রীতিমত চেষ্টা চলিতেছে। কলিকাতার জনাকীর্ণ স্থান সমূহের উন্নতির জন্য, ১৯১১ সালে "কলিকাতার উন্নতি-সংক্রান্ত আইন" পাস হইয়াছিল। এ বিষয়ে বোম্বাই সহর কর্তৃক প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করা হইয়াছে। ১৯১২ সালের ২রা জানুয়ারী "কলিকাতার উন্নতি-বিধায়ক-সমিতি" (Calcutta Improvement Trust) স্থাপিত হইয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়

প্রজাসাধারণের (Citizen) অধিকার

প্রজার অধিকার—কোনও দেশের অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক নানাপ্রকার সুবিধা থাকা সত্বেও সেই দেশবাসীর অবস্থা ভাল বলিয়া স্বীকার করা যায় না, যদি সাধারণ প্রজা বা নাগরিকের (citizen) কতকগুলি মুখ্য রাষ্ট্রীয় অধিকার না থাকে। মানবজাতির সমাজে উচ্চাসন লাভ করিতে হইলে, প্রত্যেক জাতির কতকগুলি সাধারণ অধিকার থাকা আবশ্যক। শাসন-পরিষদে প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন ও স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা, যোগ্যতা অনুসারে সর্ব্বোচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবার অধিকার প্রভৃতি সমস্ত সভ্যজাতিই ভোগ করিয়া থাকে। ইংরেজ শাসনে ভারতবাসী এই সকল অধিকার লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র। ইংরেজেরা স্বদেশে যে সকল অধিকার ও সুবিধা উপভোগ করেন, বা তাঁহাদিগের যে সকল উপনিবেশ আছে, সেই উপনিবেশবাসীদিগকে যে সকল অধিকার দেওয়া হইয়াছে, ভারতবাসী সেই সকল অধিকার পাইতে ইচ্ছা করেন। এই সকল উদ্দেশ্যে আইনসঙ্গত উপায়ে রাজনীতিক আন্দোলন করিবার অধিকার ভারতবাসীর আছে। রাজকীয় বিচারালয়ে সকল জাতিরই তুল্য অধিকার। ইংরেজ ও ভারতবাসী যাহাতে সমানভাবে বিচার প্রাপ্ত হইতে পারে, তজ্জন্য ১৯২৩ সালে 'জাতীর বৈষম্য বিষয়ক আইন' (Racial Distinctions Bill)

পাস হয়। উহার ফলে বিচার-স্থলে ইংরেজ ও ভারতবাসী সমান বলিয়া গণ্য হইবেন, এইরূপ বিহিত হইয়াছে।

'সিভিল সার্ভিস'—সামরিক কার্য্য ব্যতীত অন্য রাজকার্য্যে 'ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে'র লোকেরাই প্রায় সমস্ত সর্ব্বোচ্চপদে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টাররা স্বেচ্ছামত সিভিল সার্ভিসের লোক বিলাত হইতে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইতেন, ১৮৫৩ সালে এই ক্ষমতা উঠিয়া যায় এবং প্রকাশ্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা লোকনিয়োগের ব্যবস্থা হয়। ইংরেজরাজের যে কোনও প্রজা এই পরীক্ষা দিতে পারে। ভারতবাসীরাও সুতরাং এই পরীক্ষা প্রদানে অধিকারী। এ বিষয়ে যে কমিশন বসিয়াছিল, লর্ড মেকলে তাহার একজন সদস্য ছিলেন। যাহাতে প্রতিযোগিতার দ্বারা সিভিল সার্ভিসের লোক নিযুক্ত করা হয় এবং ভারতবাসী ও ইংরেজ যাহাতে প্রতিযোগিতায় প্রবেশের তুল্য অধিকার প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে সকল পদ কেবল সিভিল সার্ভিসের লোকদিগকেই দিতে হইবে, তাহার তালিকা 'ভারত শাসন সংক্রান্ত আইনে' সন্নিবেশিত হইয়াছে; যথা,—ভারত গভর্নমেণ্টের কতকগুলি বিভাগের সেক্রেটারী, জেলার জজ, কতকগুলি প্রদেশের ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও কালেক্টর, জয়েণ্ট্ ও এসিষ্টাণ্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও কালেক্টর, রেভিনিউ বোর্ডের সভ্য ও সেক্রেটারীগণ, রাজস্ব ও শুল্ক কমিশনারগণ, ইত্যাদি। সামরিক ব্যতীত অন্য রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা,—'ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস'—বিলাতে ও ভারতে নিযুক্ত; প্রাদেশিক ও নিম্নতম কর্ম্মচারী—প্রধানতঃ ভারতবাসীদের মধ্য

হইতে নিযুক্ত। সিভিল সার্ভিসের লোকের নীচেই প্রাদেশিক সার্ভিসের কর্ম্মচারী দেশের শাসন ও বিচার-বিভাগের উচ্চ পদগুলি অধিকার করেন। তন্নিম্ন পদগুলিতে অধস্তন বিভাগের কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়েন।

উচ্চপদে ভারতবাসী—লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে উচ্চপদে ইয়ুরোপীয়গণকে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে ও ইংরেজদিগের দৃষ্টান্তে ভারতীয়গণ সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মের উপযুক্ত হইয়াছেন। গভর্নমেণ্টও ক্রমেই তাঁহাদিগকে শাসনসংক্রান্ত দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করিতেছেন।

সার জন ষ্ট্রাচী ১৯০৩ সালে লিখিয়াছিলেন, "যে ৮৬৪টি পদে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের লোক সাধারণতঃ নিযুক্ত হয়েন, সেগুলি ও অন্যান্য সমস্ত নিম্নতর পদ যাহাতে দেশীয় কর্ম্মচারীরাই বেশীর ভাগে নিযুক্ত হয়েন সেগুলি, বাদ দিলে শাসন ও বিচার-বিভাগে প্রায় ৩,৭০০ প্রধান পদ আছে; ইহার মধ্যে ১০০ জন মাত্র ইয়ুরোপীয়। ......রাজস্ব ও ভূমিস্বত্ব সম্বন্ধে যাবতীয় কার্য্য দেশীয় কর্ম্মচারিগণের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। শাসন সম্বন্ধীয় অধিকাংশ কার্য্যই তাঁহারা নির্ব্বাহ করেন। আপীল আদালত ভিন্ন সমস্ত দেওয়ানী আদালতে দেশীয় জজেরাই বিচারকার্য্য করেন। হাইকোর্টেও অনেক দেশীয় জজ বিচারাসনে বিরাজ করিতেছেন। শাসন ও বিচার-বিভাগে নিযুক্ত এদেশীয় উদ্ধতন কর্ম্মচারীদিগকে যেরূপ বেতন দেওয়া হয়, এক ইংলণ্ড ব্যতীত, ইয়ুরোপের অন্য কোনও দেশেই সেরূপ হয় না।" *

* ষ্ট্রাচীর 'ভারতবর্ষ', তৃতীয় সংস্করণ, ৮৩-৮৮ পৃষ্ঠা।

সম্প্রতি ভারত গভর্নমেণ্ট ও প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের কোনও কোনও বিভাগে, সেক্রেটারী ও সহকারী সেক্রেটারীর কার্য্যে দেশীয় লোক নিযুক্ত হইতেছেন। তিন জন ভারতবাসীকে ভারত-সচিবের পরিষদের সভ্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। বড়লাটের শাসন-পরিষদেও (Executive Council) তিন জন ভারতবাসী সভ্য হইয়াছেন। প্রাদেশিক শাসন-পরিষদের সভ্য এবং মন্ত্রীর পদে দেশীয়েরাই নিযুক্ত হইতেছেন। এড্‌ভোকেট জেনারল, গভর্নমেণ্ট পক্ষের কৌসুলী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌ চান্সেলারের পদেও বহু ভারতবাসী মনোনীত হইয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্টে অনেকগুলি দেশীয় জজ রহিয়াছেন। এ সকলের মধ্যে, প্রাদেশিক লাট সাহেবের পদে এবং সহকারী ভারত-সচিবের পদে পরলোকগত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের (লর্ড সিংহ) নিয়োগই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

চিকিৎসা-বিভাগ—'চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিভাগে'র কর্ম্মচারী নিম্নোক্ত ভাবে বিভক্ত, 'ইম্পিরিয়াল সার্ভিস' বা ভারতীয় চিকিৎসা-বিভাগ, সামরিক ও অ-সামরিক সহকারী ডাক্তার এবং হাঁসপাতালের সহকারী ডাক্তার। ভারতীয় চিকিৎসা-বিভাগে ভারতবাসীরা নিযুক্ত হইতে পারেন। মুখ্যতঃ ইহা একটি সামরিক বিভাগ এবং এই বিভাগের কর্ম্মচারীরা সৈন্যাধ্যক্ষের অন্তর্ভূত। এ দেশের সৈন্যদলেই ইঁহাদিগকে কর্ম্ম করিতে হয়। ইয়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময়ে জনকতক ভারতবাসী ডাক্তারকে এইরূপে সৈন্যাধ্যক্ষের পদ দেওয়া হইয়াছিল। সামরিক এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনেরা সাধারণতঃ ইয়ুরোপবাসী বা এ দেশবাসী শ্বেতাঙ্গ (Eurasians) এবং অ-সামরিক এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন ও

হাঁসপাতালের সরকারী ডাক্তার সাধারণতঃ ভারতবাসীরাই নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

ইঞ্জিনিয়ারিং—ইঞ্জিনিয়ার-পদে নিযুক্ত হইবার পক্ষে এ দেশবাসীর আইনতঃ কোনও বাধা নাই। তবে সাধারণতঃ এই কার্য্যে বিলাতে উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারেরাই নিযুক্ত হইয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে কতকগুলিকে রয়েল বা রাজকীয় ইঞ্জিনিয়ার বলে; অপর যাঁহারা কুপার্স্ হিল কলেজে শিক্ষিত তাঁহাদিগকে সিভিল অর্থাৎ অ-সামরিক ইঞ্জিনিয়ার বলে। কুপার্স্ হিল কলেজ সম্প্রতি উঠিয়া গিয়াছে। গভর্নমেণ্টের বাড়ী, ঘর, রাস্তা, পয়ঃপ্রণালী ও রেলওয়ে নির্ম্মাণের জন্য যে সরকারী ইঞ্জিনিয়ার বিভাগ আছে, সেই বিভাগে যাহারা উচ্চপদস্থ তাঁহাদিগকে চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার, সুপারিণ্টেণ্ডিং, এক্সিকিউটিভ এবং সহকারী ইঞ্জিনিয়ার বলে। ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এই সকল উচ্চ পদে ও এই বিভাগের সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের নীচে প্রাদেশিক ইঞ্জিনিয়ার। ইঁহারাও ভারতীয় কলেজে শিক্ষিত। ইঁহারাও উচ্চতর বিভাগে নিযুক্ত হইতে পারেন। নিম্নপদস্থ ইঞ্জিনিয়ার ও সুপারভাইজার এই দেশের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পাস করা লোকেরাই হইয়া থাকেন।

আইনব্যবসায়ী, চিকিৎসক ও ইঞ্জিনিয়ারগণ সরকারী চাকুরী করিয়াও স্বাধীনভাবে স্ব স্ব ব্যবসায় করিতে পারেন। গভর্নমেণ্ট কেবল যে এরূপ করিতে অনুমতি দিয়াছেন, তাহা নহে; বরঞ্চ এরূপ কার্য্য করিতে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করিতে যে এ দেশবাসীর তাদৃশ ইচ্ছা ছিল না, তাহা পূর্ব্বে একটি অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং ও ব্যাবহারিক শিল্প শিক্ষা করিতে এ দেশের যুবক-বৃন্দের যাহাতে আগ্রহ হয়, তজ্জন্য গভর্নমেণ্ট বিশেষ উৎসাহ দান করিয়া থাকেন।

আইনব্যবসায়ী—আইনব্যবসায়ীরা কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—ব্যারিষ্টার, ভকীল বা হাইকোর্টের উকীল, এটর্নি, এবং নিম্ন আদালতের উকীল ও মোক্তার। এ দেশীয়েরা ব্যারিষ্টার হইতে পারেন, এবং আইনব্যবসায়ের অন্যান্য বিভাগের জন্যও এ দেশবাসীদিগকে শিক্ষা দান করিবার ব্যবস্থা বহুদিন হইতেই করা হইয়াছে। অন্যান্য প্রদেশে যেরূপ কতকগুলি উকীল 'এড্‌ভোকেট' হইতে পারেন, বাঙ্গালায়ও সেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে।

দেশীয় চিকিৎসক—কেবল যে সুশিক্ষিত পাস করা ডাক্তারেরাই চিকিৎসা ব্যবসায় করিতে পারেন, তাহা নহে। দেশীয় প্রণালীতে চিকিৎসা করিবার জন্যও নানা শ্রেণীর চিকিৎসক রহিয়াছেন। সেইরূপ গভর্নমেণ্টের লাইসেন্স পান নাই এমন ব্যক্তিও ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করিতে পারেন। ১৯১২ সালে 'বোম্বাই মেডিকেল আইন' পাস হওয়াতে চিকিৎসকদিগের লাইসেন্স পাইবার পক্ষে সুবিধা হইয়াছে। এই আইনের ফলে একটি চিকিৎসা-পরিষৎ বা মেডিকেল কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত এবং যোগ্য চিকিৎসকের নাম রেজেষ্টী করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বৈদ্য ও হাকিমগণ যাহাতে অবাধে চিকিৎসা ব্যবসায় করিতে পারেন, তৎপ্রতিও লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। বঙ্গদেশেও ঐরূপ একটি আইন হইয়াছে।

এমন কতকগুলি পদ আছে, যাহাতে কোনও বেতন নাই; কিন্তু সম্মান আছে। যেমন অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট,

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও লোকাল বোর্ডের সভ্য, ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য (Fellow)। যে কেহ এই সকল পদে নির্ব্বাচিত বা মনোনীত হইতে পারেন। তবে প্রার্থীদের পদানুরূপ যোগ্যতা থাকা চাই।

অভাব-অভিযোগ—প্রজাদিগের অভাব-অভিযোগ দরখাস্তের দ্বারা প্রধান রাজপুরুষগণের গোচরে আনয়ন করা, কোনও নূতন অধিকার পাইবার জন্য প্রার্থনা করা, বা ঐ উদ্দেশ্যে সভাসমিতি আহ্বান করা, অথবা জনসাধারণের হিত-পক্ষে কোনও বিষয়ের মীমাংসার জন্য সভা করিয়া আন্দোলন করা—এ সকল প্রজাদিগের অতি মূল্যবান্ অধিকার। ইংলণ্ডের মত দেশেও প্রজাগণকে অনেক চেষ্টা করিয়া তবে এই সকল অধিকার পাইতে হইয়াছে। ভারতবাসিগণকে এই সকল অধিকার পাইতে বিশেষ কষ্ট করিতে হয় নাই। প্রথম হইতেই গভর্নমেণ্ট ও জনসাধারণ ধরিবা লইয়াছেন যে, প্রজাসাধারণের এই অধিকার রহিয়াছে। কোনও নিষেধ না থাকিলেই মনে করা হয় যে, অধিকার আছে। কতকগুলি বিশেষ স্থলে এই অধিকার সঙ্কুচিত বা প্রত্যাহৃত হইতে পারে। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, অন্য স্থলে অবাধে এই অধিকার পরিচালিত হইতে পারে। আইন-বিরুদ্ধ কোনও সভা আহূত হইলে, বা কোনও সভায় শান্তি-ভঙ্গের সম্ভাবনা ঘটিলে বা অন্য কোনও কারণে সভা অসংযত হইয়া উঠিলে বিশেষ আদেশের দ্বারা সেই সভা বন্ধ করা যাইতে পারে। কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অবস্থায়, পুলিস এবং ম্যাজিষ্ট্রেট প্রকাশ্য সভার এবং শোভাযাত্রার স্থান-কাল বিশেষ আদেশ-প্রচারের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট

করিয়া দিতে পারেন। গভর্নমেণ্টের নিকট যে সকল দরখাস্ত করা হয়, তাহা উপযুক্ত ভাষায় লেখা না হইলে এবং উপযুক্ত কর্ম্মচারীর দ্বারা ঐ দরখাস্ত প্রেরণ না করিলে এবং যে রাজপুরুষের নিকটে ঐ দরখাস্ত করিতে হইবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া না লিখিলে, সে দরখাস্ত গৃহীত হয় না। সাধারণ সভায় মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার, দরখাস্ত করিয়া অভাব ও অভিযোগ কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিবার এবং তাহার প্রতিকার প্রার্থনা করিবার যে অধিকার প্রজাসাধারণের রহিয়াছে, তাহা যে এই সকল বাঁধাবাঁধি নিয়ম থাকায় খর্ব্ব হইল, এ কথা বলা যায় না।

সংবাদপত্র—ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব্বে এ দেশে সংবাদপত্র ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার বহুদিন পরে এ দেশে সংবাদপত্র প্রথম প্রচলিত হয়। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ইংরেজ শাসনের পূর্ব্বে প্রজাসাধারণের সম্মিলিত কোনও মত ছিল না, অথবা সর্ব্বসাধারণ-সম্বন্ধীয় কোনও ব্যাপারের আলোচনা বা সরকারী কোনও কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার কোনও উপায় ছিল না। ইংরেজ রাজত্বের ও ইংলণ্ডের জনসাধারণের দৃষ্টান্তে এ দেশে সংবাদপত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। সংবাদপত্রলেখক যে শাসনের প্রতিবাদ করেন, সংবাদপত্র সেই ইংরেজ শাসনেরই ফল। প্রজাসাধারণ যে গভর্নমেণ্টের কার্য্যের সমালোচনা করিতে অধিকারী এবং প্রকাশ্যভাবে তাহার প্রতিবাদ করিতে সমর্থ, ইহা বর্ত্তমান আকারে ইংরেজদিগের নিকট হইতেই শিক্ষা করা গিয়াছে; এবং এ বিষয়ে ইংরেজেরাই প্রথমে পথ দেখাইয়াছেন। শ্রীরামপুরে ইংরেজ মিশনারিরা ১৮১৮ সালের ৩১শে মে তারিখে

প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন।* তখনকার গভর্নর জেনারল লর্ড ময়রা সিকি ডাক মাশুলে ঐ সংবাদপত্রপ্রেরণের আদেশ দিয়া, উহার বহুল প্রচারে যথেষ্ট উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজি সংবাদপত্র সম্বন্ধেও ঐরূপ উদারতা ও অনুগ্রহ দেখাইয়াছিলেন। লর্ড ওয়েলেস্‌লী সংবাদপত্রের প্রবন্ধাদি মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে, তাহা পরীক্ষান্তে অনুমতি দিবার যে প্রথা (censorship) প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহা লর্ড ময়রা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ যে সকল বিষয় আলোচনা করিতেন বা যে সকল ব্যক্তির কার্য্য সমালোচনা করিতেন, তিনি তৎসম্বন্ধে কঠোর নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই তিনি সম্পাদকগণকে নির্ব্বাসন দণ্ড দিতেন। কিন্তু এই ভাবের প্রথম মোকদ্দমা যখন সুপ্রীম কোর্টে উপস্থিত হইল, তখন সুপ্রীম কোর্ট 'কলিকাতা জার্নালে'র সম্পাদককে অপরাধী সাব্যস্ত করিতে অস্বীকার করিলেন। গভর্নর জেনারলও দেখিলেন যে, তাঁহার কার্য্যের অপ্রিয় সমালোচনা করিবার অপরাধে একজন সম্পাদককে নির্ব্বাসন করিলে কলঙ্কের ভাগী হইতে হইবে। সুতরাং সম্পাদকগণের সম্বন্ধে নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা কেবল কাগজে-কলমেই রহিল এবং সংবাদপত্র বস্তুতঃ স্বাধীন হইল।† কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ১৮৩৫ সালের পূর্ব্বে প্রদত্ত হয় নাই। ঐ সালে গভর্নর

* 'কেরির জীবনচরিত ও যুগ' (মার্শম্যান এবং ওয়ার্ড লিখিত), ২য় খণ্ড (১৮৫৯), ১৬৩ পৃষ্ঠা; পি. এন. বসুর 'হিন্দু সভ্যতা,' ৩য় খণ্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা।

† মিল ও উইল্‌সনের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস,' অষ্টম খণ্ড, ৪১৫ পৃষ্ঠা; পি. এন. বসুর 'হিন্দু সভ্যতা,' ৩য় খণ্ড, ৫০ পৃষ্ঠা।

জেনারল সার চাল্‌স্‌ মেট্‌কাফ্‌ লর্ড মেকলের বিশেষ নির্ব্বন্ধপূর্ণ প্রযত্নে সম্পাদকগণকে নির্ব্বাসন করিবার ক্ষমতা ভারত গভর্নমেণ্টের হস্ত হইতে উঠাইয়া লয়েন। লর্ড লিটনের আমলে, ১৮৭৮ সালের আইন দ্বারা দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রসমূহ কোনও কোনও অবস্থায় শাসন-বিভাগের কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইতে পারিবে এবং রাজদ্রোহসূচক কোনও মন্তব্য প্রকাশ করিলে, সেই সংবাদপত্র যে মুদ্রাযন্ত্রে ছাপা হইবে, তাহা প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের আদেশে বাজেয়াপ্ত হইতে পারিবে, এইরূপ বিহিত হইয়াছিল। কিন্তু এই আইন লর্ড রিপন কর্ত্তৃক রহিত হয়। লর্ড মিণ্টোর আমলে সংবাদপত্র-সম্বন্ধীয় আর একটি আইন পাস হয়। কিন্তু লর্ড রেডিং সে আইন রহিত করিয়াছিলেন।

মুদ্রাযন্ত্র—আজকাল মুদ্রাযন্ত্র একটি প্রকাণ্ড ও ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত। মুদ্রাযন্ত্র স্বাধীন। মুদ্রাযন্ত্র স্বাধীন বলিতে ইহা বুঝায় না যে, যে কেহ যাহা খুসী সংবাদপত্রে ছাপাইয়া প্রকাশ করিতে পারেন। ন্যায়ধর্ম্ম ও সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হইলে, স্বাধীনতা সর্ব্বত্রই কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলিতে বাধ্য। আধুনিক দার্শনিকগণের মধ্যে যাঁহার মত সর্ব্বাপেক্ষা উদার, তিনিও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, প্রত্যেকে যাহা খুসী, তাহাই করিতে পারিবে, যতক্ষণ সে অন্যের অধিকার বা স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ না করে। অর্থাৎ প্রত্যেকে অপরের স্বাধীনতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিজের স্বাধীনতা উপভোগ করিবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, লেখনীর স্বাধীনতা ততক্ষণ স্বীকার করিতে পারা যায়, যতক্ষণ সম্মান ও সুনাম সম্বন্ধে প্রত্যেকের যে অধিকার

রহিয়াছে, তাহা নষ্ট করিতে কাহারও লেখনী উদ্যত না হয়। একজনের মানহানি করিতে কাহারও স্বাধীনতা নাই। হত্যা করিবার জন্য উত্তেজিত করিতে কাহারও স্বাধীনতা নাই। কারণ, যাহা খুসী লিখিবার স্বাধীনতা সকলেরই আছে, এ কথা যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বাঁচিয়া থাকিতে সকলেরই যে অন্ততঃ সেটুকু অধিকার আছে, তাহা স্বীকার না করিলে চলিবে কেন? সামাজিক শৃঙ্খলা যদি রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, গভর্নমেণ্টের প্রতি অকারণ বিদ্বেষ বা বিদ্রোহের ভাব প্রচার করিতে কাহারও অধিকার নাই। স্বাধীনতার এই সকল বাধা বা নিয়মের বাধ্যতা না থাকিলে সমাজের কোনও কল্যাণ হইতে পারে না; সম্ভবতঃ সমাজ টিকিতেই পারে না। ক যদি খ-কে হত্যা করিবার জন্য একজনকে উত্তেজিত করিতে পারে, তবে খ-ও ক-য়ের হত্যার জন্য এইরূপ করিতে পারে; কারণ সকলেরই অধিকার সমান। এরূপ করিলে, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা ঘটে মাত্র। সুতরাং ভারতের মুদ্রাযন্ত্র স্বাধীন এ কথা বলিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, সে স্বাধীনতা কোনও প্রকারে অন্যায়রূপে সীমাবদ্ধ নহে। স্বাধীনতা কখনও অসীম হইতে পারে না। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে এবং অন্যান্য কয়েকটি বিশেষ আইনে স্বাধীনতার সীমার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রজাসাধারণের অধিকার সম্বন্ধে একটি সাধারণ নিয়ম মনে রাখিতে হইবে। প্রজাবর্গ কোনও অধিকারের উপযুক্ত হইলে, না চাহিতেও অনেক সময়ে সে অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। প্রজাগণ সেই অধিকারের অপব্যবহার করিলে, তাহা উঠাইয়া লওয়া হয়, অথবা সঙ্কুচিত করিয়া দেওয়া হয়। সর্ব্বদেশেই,

এমন কি, ইংলণ্ডের মত সর্ব্বাংশে স্বাধীন দেশেও প্রজার অধিকারের ইতিহাস ঐ একই রূপ হইয়াছে ও হইবে। কোনও একটি অধিকার প্রদত্ত হইলে, এমন বুঝিতে হইবে না যে, ইহা সর্ব্বকালের জন্য এবং সর্ব্বাবস্থায় প্রযোজ্য; পরন্তু ইহা সদ্ব্যবহার-সাপেক্ষ। সভা হইলেই যদি তাহা দাঙ্গাহাঙ্গামায় পরিণত হয়, তবে সভা করিবার অধিকার সংযত না করিয়া উপায় নাই। সর্ব্বদেশেই এইরূপ নিয়ম। অন্যান্য অধিকার সম্বন্ধেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। নূতন অপরাধের সৃষ্টি হইলে, নূতন আইন করিতে হয়; এবং স্বাধীনতার অপব্যবহার করিলে সে স্বাধীনতা খর্ব্ব করিতেই হয়। কোন ব্যক্তি বা জাতিকে যে অধিকার দেওয়া হয়, তাহা সেই ব্যক্তির নিজের বা সেই জাতিবিশেষের উপকারে আইসে না, যদি তাহার দ্বারা অপর ব্যক্তি বা জাতির অপকার বা বিঘ্ন ঘটে। রাজ্যে সাধারণ কল্যাণের জন্যই অধিকার প্রদত্ত হয়। সাধারণের অহিত-সাধনের সম্ভাবনা ঘটিলে, অধিকার বা স্বাধীনতা কখনই থাকা উচিত নহে।

নবম অধ্যায়

ইংরেজ শাসনের প্রকৃতি ও ফল

শান্তি—পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায় হইতে উপলব্ধ হইবে যে, ইংরেজ শাসন কত বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বহু-বিস্তৃত। শান্তিই ইংরেজ শাসনের প্রত্যক্ষ ফল এবং সম্ভবতঃ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুবিধা। ভারতের অধিবাসিগণ ইংরেজদিগকে রাজ্যস্থাপনে সহায়তা করিয়াছিল; তাহারা সকলেই শান্তির জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা একটি সুদৃঢ়, পক্ষপাতশূন্য, সুপ্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্রের অভাব বোধ করিতেছিল। ভারতবাসী বুঝিয়াছিল যে, এইরূপ শাসনতন্ত্র না হইলে শান্তির সম্ভাবনা নাই। এ দেশের কোনও কোনও জাতি সাহায্য করিয়াছিল বলিয়াই ইংরেজ জাতি ভারতে রাজ্যস্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন; তখন মুষ্টিমেয় ইংরেজ কর্ত্তৃক এ দেশ শাসিত হইত এবং ইংলণ্ড হইতে এ দেশে সংবাদ প্রেরণ করিতে দীর্ঘ সময় লাগিত। তথাপি সে সময়ে বিদ্রোহের চিহ্নও দেখা যাইত না। তাহাদিগের সহায়তা গ্রহণ করিয়া, তাহাদিগকে রক্ষা করিতে ও শান্তি প্রদান করিতে সমর্থ, এমন এক শাসনতন্ত্র পাইয়া জনসাধারণ প্রকৃতই সুখী ও কৃতজ্ঞ হইয়াছিল। স্বভাবের যে সকল শক্তিপুঞ্জের নিয়ত ক্রিয়ার ফলে জগতের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে, তাহার খোঁজ যেমন কেহ রাখে না, তেমনই বহুদিন শান্তিতে বাস

করিয়া, যে সকল কারণে সেই শান্তি সম্ভবপর হইয়াছে, তাহার কথা লোকে আর মনে করে না। একজন তাহার পরিজন ও সম্পত্তি ফেলিয়া কার্য্যোদ্দেশে বা সখ করিয়া অন্যত্র গেল; কয়েক ঘণ্টা, বা কয়েক দিন বা কয়েক মাস পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সব ঠিক আছে। কাহারও কোনও অনিষ্ট ঘটে নাই, সম্পত্তি যেখানকার সেখানেই আছে, গৃহ কোনও শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় নাই। কোনও পুরুষ বা স্ত্রীলোক হয়ত পদব্রজে বা যানারোহণে মূল্যবান্ বস্ত্র, অলঙ্কারাদি পরিয়া এবং অর্থ সঙ্গে লইয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গেল। পথে কোনও বিপদ্ ঘটিল না; চোর-ডাকাতে তাহার অর্থের বা দেহের কোনও ক্ষতি করিল না। যে ভগ্ন কুটীরে বাস করে সে ব্যক্তিও নিরাপদে প্রতি নিশায় শয়ন করে এবং মনে করে যে, কোনও বিপদের আশঙ্কা নাই। এই যে নিরাপদে ও মনের শান্তিতে লোকে বাস করিতেছে, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ গভর্নমেণ্টের অপ্রতিহত শক্তি ও ন্যায়পরতা। আইন ও শাসনবিধি এরূপ ভাবে গঠিত হইয়াছে যে, যে কেহ অপরাধ করিলে, সে ধৃত হইবে, তাহার বিচার হইবে এবং দণ্ডনীয় হইলে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে। এই কারণে, কেবল যাহারা দুর্ব্বৃত্ত ও পাপাশয়, তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ আইনতঃ দণ্ডনীয় কার্য্যে সাধারণতঃ প্রবৃত্ত হয় না। আইন যদি যথেষ্ট না হয়, শাসনযন্ত্র যদি অকর্ম্মণ্য হয়, বিচারালয় যদি ন্যায়পথভ্রষ্ট বা অনুপযুক্ত হয়, কিংবা যদি সমাজে অপরাধ-প্রবণ লোকের সংখ্যা অধিক হয়, তাহা হইলে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

শৃঙ্খলা—যে উদ্দেশ্যে আইনসমূহ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার কতকটা আভাস পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। এই সকল আইন প্রয়োগ করিবার জন্য যে যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ পরে দেওয়া হইবে। কোনও প্রকারের উন্নতি হইতে হইলে, সামাজিক শৃঙ্খলা চাই। কোনও সমাজের লোক যদি চিরদিন প্রাণহানি বা সম্পত্তি-নাশের আশঙ্কায় বাস করে, তবে সেই সমাজের মানসিক উন্নতি বা কোনও কার্য্য-ক্ষমতা হইতে পারে না; মন অবসন্ন হইয়া পড়ে, পরিশ্রমসাপেক্ষ কার্য্য বন্ধ হয়, সর্ব্ববিধ চেষ্টার মূলপ্রস্রবণ পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া উঠে; সুতরাং সে সমাজ মানসিক, নৈতিক, ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, অর্থনৈতিক বা রাজনীতিক—কোনও প্রকার উন্নতিই করিতে পারে না। কোনও বিষয়ে চিন্তা করিতে হইলে, কোনও কার্য্য করিতে হইলে বা নিজের সমস্ত মনোবৃত্তির উন্মেষ-সাধন করিতে হইলে মনে শান্তি থাকা চাই। ব্যক্তিবিশেষের সম্বন্ধে যে নিয়ম প্রযোজ্য, কোনও জাতির প্রতিও সেই নিয়ম প্রযোজ্য। উন্নতি হইতে হইলে শৃঙ্খলা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। বিশৃঙ্খলায় কোনও রূপ উন্নতিই সম্ভবপর নহে।

ঠগী ও ডাকাতি—সকল দেশেই এমন কতকগুলি পাপ বা অপরাধ আছে, যাহা সাধারণ। এ দেশে ঠগী এবং ডাকাতি দুইটি বিশেষ রকমের গুরুতর পাপ কার্য্য ছিল। কতকগুলি পুরুষ এবং স্ত্রীলোক দলবদ্ধ হইয়া অসহায় লোকের শ্বাসরোধ করিয়া অথবা অন্য উপায়ে প্রাণনাশ করিত এবং তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিত। এই সকল লোককে ঠগ বলিত। সাধারণতঃ পথিকদিগকে একাকী পাইলে ইহারা তাহাদের

প্রাণবধ করিত। ঠগেরা প্রায়ই কথাবার্ত্তায় লোকের সহানুভূতি ও বিশ্বাস উৎপাদন করিত; পরে তাহার গলদেশে রুমাল বা গামছা জড়াইয়া ক্রমেই ফাঁস আঁটিত, ইহাতেই হতভাগ্য পথিকের মৃত্যু ঘটিত। এই প্রকারের পাপকার্য্য এখন প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্ ও ক্যাপ্টেন স্লীম্যান ঠগী-দমনের গৌরব তুল্যরূপে পাইতে পারেন। ঠগেরা পুরুষানুক্রমে পথিক-গণকে হত্যা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত। গোয়েন্দাদিগের সাহায্যে এই ঘৃণিত দলসমূহ ক্রমশঃ নির্ম্মূল করা হইয়াছে।* ডাকাতি একেবারে উঠিয়া যায় নাই বটে, কিন্তু অনেক কমিয়া গিয়াছে। এমন এক সময় ছিল, যখন বঙ্গদেশে ডাকাতি একটি অতি সাধারণ অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইত। যাহারা দলবদ্ধ হইয়া লুঠপাট করে, কিংবা বল-প্রয়োগের সহিত চুরি করে, তাহাদিগকে ডাকাত বলে। ডাকাতি করিবার সময় নরহত্যা ঘটিতেও পারে। ঠগী ও ডাকাতি-দমনের জন্য গভর্নমেণ্টের একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল এবং এক সময়ে ডাকাতি-নিবারণের জন্য একজন কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি কেবল ডাকাতি-দমনেই ব্যাপৃত থাকিতেন।

শাসন-প্রণালীর উচ্চাদর্শ—দস্যুতা প্রভৃতি ভয়ানক ও বিপজ্জনক অপরাধগুলি কেবল আইনের দ্বারা নিবারিত হয় নাই; আইনের দ্বারা কোনও পাপেরই মূলোচ্ছেদ করা যায় না। অধ্যবসায়ের সহিত তদন্ত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে কঠোর শাস্তি-বিধানের দ্বারাই এই সকল অপরাধের নিবারণ

* ইম্পিরিয়াল গেজেটীয়ার, ১৮৮৬, ষষ্ঠ খণ্ড, ৪০৫ পৃষ্ঠা।

হইয়াছে। দেশের সর্ব্বত্র কেবল যে শৃঙ্খলা ও শান্তি স্থাপিত হইয়াছে তাহাই নহে; এমন একটি শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যাহা ন্যায়পরতা ও কার্য্যকুশলতার জন্য সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে শাসন-প্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইবে। এ স্থলে শুধু ইহাই বলা আবশ্যক যে, যেরূপ উচ্চ নৈতিক আদর্শ লইয়া এই শাসন-প্রণালী গঠিত হইয়াছে এবং যেরূপ উৎসাহ ও দক্ষতার সহিত ইহা পরিচালিত হইতেছে, তাহা ইংরেজ শাসনের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয় বলিতে হইবে। ইহাতে অনেক ভাল ভাল ও প্রয়োজনীয় কাজ হইতে পারিতেছে এবং লোকের আদর্শও উন্নত হইতেছে। লোকের মনে প্রণালী অনুসারে ও সময় রক্ষা করিয়া কার্য্য করিবার অভ্যাস বদ্ধমূল হইতেছে; তাহারা সমবেত ভাবে এবং অনুগত হইয়া কাজ করিবার শক্তি লাভ করিতেছে। দেশীয় সিভিল সার্ভিসের কর্ম্মচারিগণ শিক্ষার প্রভাবে এবং ইয়ুরোপীয় রাজকর্ম্মচারিগণের দৃষ্টান্তে কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শাসনকার্য্যে উচ্চ আদর্শ দেখিয়া এ দেশের লোকের মনে এক্ষণে এরূপ উচ্চ ধারণা হইয়াছে যে, ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে কেহই তাহা সহ্য করিতে সম্মত হইবে না। এ সম্বন্ধে ইংরেজী আদর্শকেই এ দেশবাসীরা একরূপ নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা নিজ নিজ ব্যাপারেও এই আদর্শ অনুসরণ করিয়া থাকে। কোনও রূপ উন্নতি বা সংস্কারের প্রয়োজন বোধ হইলে, তাহারা ইংরেজী প্রথায়ই সে উন্নতি বা সংস্কারের জন্য প্রার্থনা করে। সুতরাং ইংরেজ শাসন এ দেশের লোকের শিক্ষার একটি বিপুল দ্বারস্বরূপ হইয়াছে।

গভর্নমেণ্টের কার্য্য—গভর্নমেণ্টকে লোকের জন্য অনেক কিছু করিতে হইয়াছে। জীবিকা-অর্জ্জন কি প্রকারে করিতে হয়, সে সম্বন্ধে শিক্ষাদান হইতে আরম্ভ করিয়া, দেশের কার্য্য ও রাজনীতিক অধিকার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান জন্মাইয়া দেওয়া পর্য্যন্ত সমস্তই তাঁহাদিগকে করিতে হইয়াছে। কৃষি ও শিল্প-শিক্ষার জন্য ইংরেজ গভর্নমেণ্টকে বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছে। মহাজনের হস্ত হইতে কৃষকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে হইয়াছে। অত্যাচারী জমিদার এবং মহাজনের উৎপীড়ন হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করিতে হইয়াছে। জমির উপরে বন-রক্ষা এবং ভিতরে খনির কাজ করা—গভর্নমেণ্টকেই করিতে হইয়াছে। সামাজিক স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে নিয়ম শিক্ষা দিতে, চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নে আকৃষ্ট করিতে, টীকা দেওয়া, নির্ম্মল পানীয়ের ব্যবস্থা ইত্যাদি সাধারণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে গভর্নমেণ্টই অগ্রণী হইয়াছেন। কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া শুধু পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা নহে, স্বদেশের সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতির শিক্ষা-দান; রাজপথ, সেতু, পয়ঃপ্রণালী-নির্ম্মাণ; দাসত্ব-প্রথা ও শিশুহত্যা-নিবারণ; সমগ্র দেশের জমাজমি জরীপ, তথ্যানুসন্ধান ও মানচিত্র প্রস্তুত করা; স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ও জুরিপ্রথা-প্রবর্ত্তনের দ্বারা জনসাধারণকে রাজনীতিক অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সুযোগ-প্রদান; কল-কারখানা-স্থাপন, বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রবর্ত্তন, পুরাতন কীর্ত্তির সংরক্ষণ; এবং ব্যাধি ও কীট হইতে গৃহপালিত পশু ও গাছপালার রক্ষাবিধান করা—এ সমস্তই গভর্নমেণ্টকে করিতে হইয়াছে।

তাহার ফল—গভর্নমেণ্টের এই বিচিত্র কার্য্য-কলাপ দেখিয়া লোকের চরিত্রও নানা ভাবে গঠিত হইতেছে। কেহ-বা স্কুল কলেজে পড়িয়া জ্ঞানলাভ করিতেছে, শিল্প শিখিতেছে বা কার্য্যকরী বিদ্যা আয়ত্ত করিতেছে, কেহ-বা দেশের ও দশের কাজ করিয়া তাহাদের কার্য্যকরী শক্তির উদ্বোধন করিতেছে। অনেকে ইংরেজের শাসন-প্রণালী ও ইংরেজ রাজ-কর্ম্মচারীর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইতেছে। সকলেরই চোখের সম্মুখে একটি নব ভাব-রাজ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। আরামের ধারণা উচ্চতর হইয়াছে, এবং জীবন-যাপনের আদর্শও অনেক উন্নত হইয়াছে। আইনঘটিত বা রাজনীতিক যে সকল অধিকার প্রজাসাধারণের রহিয়াছে, তৎসম্বন্ধে সকলেরই একটি পরিস্ফুট ধারণা জন্মিয়াছে। এখন একজন অতি দীন প্রজা, বা দরিদ্রতম মুটে বা চাকর বুঝিতে শিখিয়াছে যে, তাহারও ন্যায্য অধিকার রহিয়াছে; এবং সে ইচ্ছা করিলেই সে সকল অধিকার পাইতে পারে। যদি কেহ এইরূপ লোকের উপর অত্যাচার করে, বা তাহার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে বা চুক্তি করিয়া সেই চুক্তি অনুসারে তাহার প্রাপ্য তাহাকে না দেয়, তাহা হইলে সে আইনের আশ্রয় লইয়া তাহার প্রতিবিধান করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ। লোকের মনে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যবোধ পরিস্ফুট হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে জীবনের প্রত্যেক ব্যাপার সম্বন্ধে তাহার মনে জিজ্ঞাসা ও সমালোচনার ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। কোনও বিষয় না বুঝিয়া কেহ মানিয়া লইতে চাহে না; সকল বিষয়ে ভাল মন্দ দুই দিক্ বিচার করিয়া দেখিতে চাহে।

কেহ কেহ বলেন যে, সমাজের দিক্ দিয়া দেখিলে এই নূতন ভাবটি যে সম্পূর্ণ সুফলদায়ক বা বাঞ্ছনীয় একথা বলা যায় না।

এই বিষয়ে কোনও মতামত প্রকাশ করা অনাবশ্যক। তবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ব্রিটিশ শাসনে জনসাধারণের চিন্তাশক্তি ও কার্য্যক্ষেত্রের বহু বিস্তার ঘটিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য দেশের সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন চিত্তের সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া দিয়াছে এবং লোকের মনে নূতন নূতন আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আধ্যাত্মিক শক্তি জাগাইয়া তুলিয়াছে। অর্থোপার্জ্জনের নূতন নূতন পন্থা উন্মুক্ত হইয়াছে। লোকে নূতন নূতন কর্ম্ম, জীবিকা, ব্যবসায় ও শিল্পের সন্ধান পাইয়াছে। সাধারণের কার্য্যে জীবন নিয়োজিত করিবার আদর্শ লোকে ইংরেজ শাসন হইতেই শিক্ষা করিয়াছে। এই আদর্শ প্রতিদিন বিস্তার প্রাপ্ত হইতেছে; কারণ ব্যবস্থাপক-সভায়, লোকাল বোর্ড বা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে এবং মন্ত্রিসভায়, সংবাদপত্র-লেখক রূপে বা বক্তা রূপে নানা প্রকারে লোক দেশের এবং দশের কার্য্য করিবার সুযোগ পাইতেছে। পাশ্চাত্ত্য জীবনপ্রণালী ও ভাবধারার সংস্পর্শে আসিবার ফলে এ দেশের লোকের মনে নূতন রকমের নৈতিক ও সামাজিক আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই সকল আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ায় অনেকের মনে সামাজিক জীবনের সম্পূর্ণ সংস্কার-সাধন ও পবিত্রতা-বিধানের উচ্চাশা জাগিয়া উঠিয়াছে।

সার্দ্ধ-শত-বৎসর-ব্যাপী ইংরেজ শাসনের সর্ব্বোত্তম ফল এই যে, লোকের মনে জাতীয় জীবনের উদ্দীপনা জাগিয়া উঠিয়াছে। এই ফল-লাভের জন্য শাসনকর্ত্তৃগণ ও জনসাধারণ উভয়েই গৌরব বোধ করিতে পারেন। বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের অধিবাসিবৃন্দ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত; ইহাদের ধর্ম্ম, ভাষা, আচার, ব্যবহারও ভিন্ন ভিন্ন। এই পার্থক্য একেবারে দূর

হয় নাই বটে, কিন্তু ইংরেজাধিকৃত ভারতে, একই শিক্ষা-প্রণালী (এই শিক্ষা প্রধানতঃ ইংরেজি ভাষার সাহায্যেই প্রদত্ত হয়), একই আইন, একই শাসননীতি হওয়াতে লোকের মতি, গতি, আশা, আকাঙ্ক্ষা, সহানুভূতি প্রভৃতি একই রূপ হইয়া উঠিতেছে। যাহারা ইংরেজি শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, এবং যাঁহারা অন্য কোনও প্রকারে পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীর প্রভাবে বা ইংরেজি প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারা নানা প্রভেদ সত্ত্বেও অন্ততঃ রাজনীতি-ক্ষেত্রে একই জাতিতে পরিণত হইয়াছেন। যখনই তাঁহারা এইরূপ ক্ষেত্রে পরস্পরের সহিত মিশিবার সুযোগ-প্রাপ্ত হয়েন, তখনই তাঁহারা একই জাতীয় জীবনের স্পন্দন অনুভব না করিয়া পারেন না। 'শিক্ষা' কথাটিকে ব্যাপক ভাবে গ্রহণ করিলে, বলিতে হয় যে ইংরেজি শিক্ষায় তাঁহাদিগকে একতার বন্ধনে বাঁধিয়াছে. শিক্ষিত সম্প্রদায় মনে করেন যে, সামাজিক পার্থক্য যতই হউক না, ইংরেজি শিক্ষায় তাঁহাদিগকে পরিণামে এক জাতি করিয়া গড়িয়া তুলিবে এবং তাঁহারা ইহারই প্রভাবে নিম্নতর জাতিদিগকে তুলিয়া লইতে পারিবেন। জাতি ও ধর্ম্মের একতা না থাকিলে কেবল রাজনীতিক একতা ও রাজনীতিক অধিকার-সাম্যের ফলে একটি জাতি কখনও গড়িয়া উঠিতে পারে কি না সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবে ইহা কতকটা ঠিক যে, ইংরেজ-রাজ শিক্ষার প্রভাবে যে একতার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা স্থায়ী হইলে ভারতে একতা বৃদ্ধি পাইবে। স্বায়ত্ত-শাসন-প্রতিষ্ঠান-গুলির ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লোকের রাজনীতিক ক্ষমতার ক্রমশঃ বিকাশ হইবে; এবং যদি শাসিত ও শাসক-সম্প্রদায়ের

মধ্যে বিশ্বাসের ভাব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে এখন যেমন অ-সামরিক বিভাগে দেশীয় লোক নিযুক্ত হইতেছে, সেইরূপ ক্রমশঃ সামরিক বিভাগেও বহুপরিমাণে দেশীয় লোক নিযুক্ত হইতে না পারিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। ইতিমধ্যেই ভারতীয়গণের মধ্য হইতে কতকগুলি সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। বিগত ইয়ুরোপীয় যুদ্ধের পর কতকগুলি সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, যথা—বঙ্গীয় এম্বুল্যান্স (যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকের শুশ্রূষা ও চিকিৎসার জন্য) সৈন্য, বাঙ্গালী পল্টন, ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সৈন্যদল, এবং সম্প্রতি ভারতীয় সৈন্যদলের পশ্চাতে থাকিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য নূতন যে রাষ্ট্রীয় সেনা (Territorial Force) গঠিত হইয়াছে,—এই সকল সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধবিদ্যা অভ্যাস করিবার সুযোগ ভারতবাসিগণকে দেওয়া হইয়াছে। ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষ পরস্পর মিলিত হইয়া কার্য্য করিলে ভারতবাসী কি জ্ঞানে, কি বাহুবলে একটি প্রধান শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইতে পারে। ভারতীয় জীবনের সামাজিক সমস্যাগুলি বিদেশীয় গভর্নমেণ্ট কর্ত্তৃক পূর্ণ হইতে পারে না। এ দেশীয়েরা নিজ নিজ ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু রাজনীতিক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য ভাবে অনুপ্রাণিত জনসাধারণের প্রাণে যখন জাতীয় জীবনের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগিবে এবং যখন তাহারা তাহার অনুপ্রাণনা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিবে, তখনই ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য সমাপ্ত হইবে এবং ভারতেরও নিয়তি সুসম্পূর্ণ হইবে।

দ্বিতীয় ভাগ

ভারতবর্ষের শাসন-পদ্ধতি

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

শাসনতন্ত্র—কোনও দেশের 'শাসনতন্ত্র' অর্থে সেই দেশে শৃঙ্খলা ও শান্তিরক্ষা করিবার জন্য এবং অবাধে উন্নতি ও পরিপুষ্টির পক্ষে যে সকল ব্যবস্থা আছে, তাহাই বুঝায়। যে দেশে এমন একটি সর্ব্বোচ্চ রাজশক্তি নাই, যাহা আদেশ-প্রতিপালনে বাধ্য করিতে ও স্বীয় ব্যবস্থার সংরক্ষণে সমর্থ, সে দেশে শাসনতন্ত্র বা গভর্নমেণ্ট আছে এ কথা বলা যায় না। সর্ব্বোচ্চ রাজশক্তি কোনও একজন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সঙ্ঘ হইতে পারেন। এই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ স্বয়ং অথবা অধীন কর্ম্মচারীর দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন; কিন্তু সমগ্র দেশ তাঁহার বা তাঁহাদের প্রভুত্ব স্বীকার, ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আদেশ প্রতিপালন করা চাই। একদিকে উপযুক্ত রাজশক্তি, অন্যদিকে সেই শক্তির বশ্যতা-স্বীকার—এই দুইটি না থাকিলে 'গভর্নমেণ্ট' হইতে পারে না। 'কন্‌ষ্টিটিউশন্‌' বা শাসননীতি শব্দ অনেক সময়ে সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়; তখন ইহা শাসন-শক্তির পরিমাণ ও প্রকৃতি বুঝায়; আর যেখানে শাসন-শক্তি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত, সেখানে সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন অংশের পরস্পর সম্বন্ধ বুঝায়।

কোনও দেশের শাসন-ব্যবস্থা একদিনে গঠিত হয় না এবং কখনও চিরদিনের মত অটল অচল হইয়াও থাকে না। দেশের চিরপরিবর্ত্তমান প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে এবং লোকের চরিত্র,

ক্ষমতা ও জীবনের গতি অনুসারে ইহাকে মানাইয়া লইতে হয়। লোক যেমন সংখ্যায় বিস্তৃতি লাভ করে এবং তাহাদের নানাবিধ ব্যাপার বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তেমনই শাসন-ব্যবস্থার জটিলতাও বাড়ে। সেইজন্য ইতিহাসের দিক্ দিয়া ইহা ভাল বুঝিতে পারা যায়। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে কেবল বর্ত্তমান শাসনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইবে এবং যেখানে কোন ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের উল্লেখ কৌতূহলপ্রদ হইবে বা যেখানে ঐরূপ উল্লেখের দ্বারা বর্ত্তমান শাসনপ্রণালী বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে, কেবল সেখানেই ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের উত্থাপন করা হইবে।

প্রত্যেক শাসনপ্রণালীর উদ্দেশ্যই শান্তিরক্ষা; কিন্তু কেবল শান্তিরক্ষার দ্বারা কোনও শাসনপ্রণালীর বিচার করা যাইতে পারে না। ঘোর অত্যাচারী ও যথেচ্ছাচারী শাসনতন্ত্রও শান্তিরক্ষায় সমর্থ হয়; আবার দায়িত্বপূর্ণ, সহৃদয় শাসনতন্ত্র হইতেও শান্তিরক্ষা হয়। সুতরাং কোনও শাসনতন্ত্রের দোষ-গুণ বিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে, কি ভাবের শান্তি রক্ষিত হইতেছে এবং কিরূপে সে শান্তি রক্ষিত হইতেছে। দেখিতে হইবে, শাসনযন্ত্রটি শান্তির ও উপদ্রব-শূন্যতার পক্ষে যথেষ্ট কিনা; তাহাতে ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ আছে কিনা; মানুষের মধ্যে ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে কিনা; সেই শাসনযন্ত্রের দ্বারা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিশীলতা, দেশের সমস্ত বস্তুজাতের উৎকর্ষ এবং লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্পাদিত হইতেছে কিনা। এ দেশে গভর্নমেণ্ট এই সকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে নীতি ও উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা এই পুস্তকের প্রথমাংশে বিবৃত হইয়াছে। সেই নীতি এবং সেই সকল ব্যবস্থা কার্য্যে

পরিণত করিবার জন্য যে শাসনযন্ত্র ধীরে ধীরে গঠিত হইয়াছে, তাহারই বর্ণনা এই অংশে প্রদত্ত হইবে।

অন্যান্য দেশে যেরূপ, সেইরূপ ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্রকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা—অ-সামরিক ও সামরিক। যে সকল দেশে কোনও একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায় আছে, সে দেশে 'ধর্ম্মসংক্রান্ত' আর একটি বিভাগ শাসনপ্রণালীর অন্তর্গত বলিয়া ধরা হয়। সাধারণ অ-সামরিক বা 'সিভিল'-বিভাগ আবার তিন ভাগে বিভক্ত,—ব্যবস্থাপক, বিচার ও শাসন। 'ব্যবস্থাপক'-বিভাগ আইন প্রণয়ন ও প্রচার করেন; 'বিচার'-বিভাগের কার্য্য আইনের ব্যাখ্যা ও প্রযোগ করা এবং মোকদ্দমার বিচার করা; 'শাসন'-বিভাগ শান্তিরক্ষা ও গভর্ণমেণ্টের স্থিতির জন্য যে সকল কার্য্য করা আবশ্যক, তাহাই করেন। রাজস্বসংক্রান্ত কার্য্য শাসনবিভাগের অন্তর্নিবিষ্ট করা যাইতে পারে: অথবা 'রাজস্ববিভাগ' বলিযা স্বতন্ত্র একটি বিভাগের সৃষ্টিও হইতে পারে। এ দেশে আর একটি অতি প্রয়োজনীয় বিভাগ আছে, যাহা উল্লিখিত তিনটি বিভাগের মধ্যে গণনা করা যায় না। ইহাকে 'কর্ম্মচারি'-বিভাগ বলা যাইতে পারে। সমস্ত বিভাগে এবং সেক্রেটারীদিগের অফিসে যে সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদিত হয়, তাহা এই বিভাগের অন্তর্গত। শাসন-বিভাগীয় কর্ম্ম প্রধানতঃ এই সকল কর্ম্মচারীর দ্বারাই সম্পন্ন হয়; এতদ্ব্যতীত এই সকল কর্ম্মচারী বিশেষ বিশেষ কার্য্য। যথা—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রেজেষ্ট্রী প্রভৃতি) সম্পাদন করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সামরিক শাসন

ভারতীয় সৈন্য—ভারতের সামরিক ব্যবস্থার অতি সংক্ষিপ্ত ও মোটামুটি বিবরণ মাত্র দিলেই চলিবে। ভারতীয় সেনাদল ধীরে ধীরে গঠিত হইয়া উঠিতেছে। বিভিন্ন সময়ে, তত্তৎ-কালের প্রয়োজন বুঝিয়া, ইহার সংখ্যা ও গঠন-প্রণালীর পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। ১৬৬৯ সালের সনন্দ অনুসারে বোম্বাই নগরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম "ইয়ুরোপীয় পল্টন" গঠিত হয়। সে সময়ে যে সকল সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষ সেই দ্বীপে ছিলেন ও যাঁহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের লইয়া এই পল্টন গঠিত হইয়াছিল। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে মান্দ্রাজে, ঐ নগর-রক্ষার্থ একদল সিপাহী সৈন্য ১৭৪৮ সালে ফরাসীদিগের অনুকরণে গঠিত হয়; এই সময়ে হইতেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতীয় সৈন্য দলের উৎপত্তি ধরা যাইতে পারে।* ঐ সময়ে একদল ইয়ুরোপীয় সৈন্যও গঠিত হয়। ঐ সৈন্যদলের অধ্যক্ষ মেজর ষ্ট্রীঙ্গার-লরেন্সকে ভারতীয় সৈন্যের 'জন্মদাতা' বলা হয়। ১৭৮১ সালে পার্লিয়ামেণ্টে এক আইন পাস হয়, তাহার বলে কোম্পানী সৈন্য নিযুক্ত করিবার অনুমতি পাইলেন, এবং ১৭৯৯ সালের আইনের দ্বারা ইয়ুরোপীয়

* চেস্‌নী-কৃত 'ভারতীয় রাজনীতি,' তৃতীয় সংস্করণ, ২০৫ পৃষ্ঠা।

সৈন্য নিয়োগ ও তাহাদিগকে শাসনে রাখিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েন।* কালক্রমে বাঙ্গালা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ এই তিন বিভাগে তিনটি স্বতন্ত্র সৈন্যদল গঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত দেশীয় রাজন্যদিগের ব্যয়ে এবং তাঁহাদের রাজ্যরক্ষার্থ কতকগুলি করিয়া সৈন্য রাখা হইল। 'বঙ্গীয় সৈন্যদলে' বঙ্গদেশের কোনও সৈন্য ছিল না; ঐ সৈন্যদলের একটি অংশমাত্র বঙ্গদেশে রাখা হইয়াছিল। ১৮৫৬ সালে অর্থাৎ সিপাহীবিদ্রোহের এক বৎসর পূর্ব্বে, অন্য দুই সৈন্যদলের সমষ্টি অপেক্ষাও এই সৈন্যদল সংখ্যায় অধিক ছিল। প্রধানতঃ অযোধ্যার ব্রাহ্মণ, রাজপুত ও মুসলমান এবং কতক পরিমাণে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লোক লইয়া এই সৈন্যদল গঠিত হইয়াছিল। 'বোম্বাই সৈন্যদল' এবং দেশীয় রাজন্যদিগের রাজ্যরক্ষার্থ সৈন্যও ঐ সকল লোক হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। 'মান্দ্রাজী সৈন্যদল' মান্দ্রাজ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছিল। 'পাঞ্জাব সীমান্ত-সেনাদল' স্থানীয় অশ্বারোহী ও পদাতিক লইয়া গঠিত হইয়াছিল। গোলন্দাজ সৈন্যের অধিকাংশই ভারতবাসী ছিল। ১৮৫৬ সালে কোম্পানীর ভারতবর্ষস্থ সৈন্য-মধ্যে, পূর্ব্বোক্ত দেশীয় রাজ্যরক্ষার্থ সৈন্যদল ব্যতীত ৩৯,০০০ ইয়ুরোপীয় সৈন্য ও ২,১৫,০০০ ভারতীয় সৈন্য ছিল।

১৮৫৭ সালে প্রায় সমস্ত 'বঙ্গীয় সৈন্যদল' বিদ্রোহ করে। 'পাঞ্জাব সীমান্ত-সেনাদল' শুধু যে বিশ্বস্ত রহিল, তাহা নহে; বরং বিদ্রোহ-দমনে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল। হায়দারাবাদে রক্ষিত সেনাদল, এবং দুই একটি স্থল ব্যতীত 'মান্দ্রাজ ও বোম্বাই

* ইল্‌বার্টের 'ভারত গভর্নমেণ্ট,' ৬৩ ও ৭৪ পৃষ্ঠা।

সৈন্যদল' অটল রহিল। যখন ইংলণ্ডের রাণী রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন, তখন সমস্ত সামরিক ব্যবস্থারই পরিবর্ত্তন হইল। 'বঙ্গীয় সৈন্যদল' পূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইয়াছিল। স্থানীয় ইয়ুরোপীয় সৈন্য লোপ পাইল এবং ইয়ুরোপীয় পদাতিকের স্থান 'ব্রিটিশ পল্টন' অধিকার করিল। গোলন্দাজ সৈন্য প্রায় সমস্তই ইংরেজ হইল। ইয়ুরোপীয় সৈন্যের সংখ্যা বাড়াইয়া ৬২,০০০ করা হইল এবং ভারতীয় সৈন্যের সংখ্যা হ্রাস করিয়া ১,৩৫,০০০ করা হইল। সিপাহীবিদ্রোহের পূর্ব্বে দেশীয় সৈন্য পুলিসের কার্য্য করিত, কিন্তু এক্ষণে পুলিস বিভাগের সংস্কার হওয়ায়, সিপাহী-সৈন্য সংখ্যায় কমিলেও তাহাতে কার্য্যক্ষম সৈন্যসংখ্যা প্রকৃতপক্ষে বড় বেশী কমিল না।

পুরাতন নামের তিনটি স্বতন্ত্র সৈন্যদল তখনও রহিল। কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে সামরিক কার্য্যদক্ষতা ক্রমেই উন্নত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। 'বঙ্গীয় পদাতিক সৈন্যদল' জাতি অনুসারে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার কোনও দলে ব্রাহ্মণ, কোনও দলে রাজপুত, কোনও দলে জাঠ—এই প্রকারে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। রুষদিগের আক্রমণের আশঙ্কা উপস্থিত হইলে ১৮৮৫ সালে সমগ্র সামরিক ব্যবস্থা পুনরালোচিত হয় এবং ইয়ুরোপীয় ও ভারতীয় সৈন্য অনেক বাড়াইয়া দেওয়া হয়। ১৯০০ সালে সমস্ত রকমের সৈন্যসংখ্যা (সেনানায়ক ও সেনানী ধরিয়া) ২,২৩,০০০ ছিল, তন্মধ্যে ইংরেজ সৈন্য ৭৬,০০০এর কিছু বেশী।*

* ষ্ট্রাচী-কৃত 'ভারতবর্ষ', ৪৪০-৪৪৫ পৃষ্ঠা।

ভারতীয় সৈন্যের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব আইনের দ্বারা সপার্ষদ গভর্নর জেনারলের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। সর্ব্বোপরি অবশ্য রাজার কর্ত্তৃত্ব; ভারত-সচিবের দ্বারা এই কর্ত্তৃত্ব পরিচালিত হয়। প্রধান সেনাপতিই ভারতে সম্রাটের যাবতীয় সৈন্যের কর্ত্তা; তবে শাসন বিষয়ে ইনিও সপার্ষদ গভর্নর জেনারলের অধীন। মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের সৈন্যদল পূর্ব্বে একজন স্থানীয় প্রধান সেনাপতির অধীনে ছিল। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে এক আইন পাস হয়, তদ্দ্বারা ঐ প্রাদেশিক সেনাপতির পদ উঠিয়া যায় এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের গভর্নমেণ্টের উপর যে সৈন্যভার অর্পিত ছিল, তাহা ভারত গভর্নমেণ্টের উপর অর্পিত হইল। ১৮৯৫ সালে ১লা এপ্রিল তারিখে এই আইন অনুসারে সৈন্য-শাসন-সংক্রান্ত ব্যবস্থা সমূহ কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল।*

"১৮৯৫ সাল হইতে ভারতীয় সৈন্য প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং তাহাদিগকে যে যে প্রদেশে স্থাপন করা হইয়াছে, তদনুসারে তাহাদিগকে পাঞ্জাব, বঙ্গ, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ অধ্যক্ষতা (Commands) বলা হয়। ১৯০৩-৪ সালে ব্রহ্মদেশের সৈন্য মান্দ্রাজ হইতে পৃথক্ হওয়ায় একটি পঞ্চম সামরিক বিভাগ হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক বিভাগ আবার কয়েকটি 'সামরিক জেলা'য় বিভক্ত।

"১৯০৪ সালে লর্ড কিচ্‌নার যে সংস্কার ও পুনর্বিভাগ প্রবর্ত্তন করেন, তদনুসারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামরিক সংস্থান বা থানা উঠাইয়া দিয়া বৃহৎ সেনানিবাসে অধিক সৈন্য একত্র রাখিবার ব্যবস্থা

* ষ্ট্রাচী-কৃত 'ভারতবর্ষ', ৪৪৬-৪৪৮ পৃষ্ঠা।

হয়। সমস্ত সৈন্যকে আটটি বিভাগীয় সেনাধ্যক্ষের অধীনে স্থাপন করিয়া 'উত্তর', 'পশ্চিম' ও 'পূর্ব্ব' এই তিনটি প্রধান অধ্যক্ষতায় বিভক্ত করা হয়। সেকেন্দ্রাবাদ ও ব্রহ্মদেশ এই দুই বিভাগীয় সৈন্যদল পূর্ব্বোক্ত কোনও বিভাগের অন্তর্গত না হইয়া প্রধান সেনাপতির অধীনে স্থাপিত হইল।

"১৯০৭ সালে আরও পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। এই বৎসর হইতে উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব্ব অধ্যক্ষতা উঠিয়া গেল এবং তাহার স্থলে ভারতীয় সৈন্য দুইটি অংশে বিভক্ত হইল,—'উত্তর সৈন্যদল' ও 'দক্ষিণ সৈন্যদল'। ইহার প্রত্যেকটি একজন প্রধান সেনাধ্যক্ষের অধীনে স্থাপিত হইল।"*

ইহার পরে, ১৯০৬ সালে সামরিক শাসন-ব্যবস্থায় গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটে। সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তৃত্ব তখনও সপার্ষদ গভর্নর জেনারলের হস্তেই রহিল। তখনও সে কর্ত্তৃত্ব পূর্ব্বের ন্যায় সম্রাট্ ও তাঁহার মুখপাত্র ভারত-সচিবের আদেশাধীন রহিল। কিন্তু পুরাতন সামরিক বিভাগের স্থলে (১) সৈন্যবিভাগ, ও (২) সামরিক সরবরাহ-বিভাগ এই দুইটি হইল। দ্বিতীয় বিভাগের অন্তর্গত যে সকল কার্য্য, তদ্ব্যতীত সৈন্য সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য প্রথম বিভাগের দ্বারা সম্পাদিত হইত। ইহার কর্ত্তৃত্ব ভার ছিল প্রধান সেনাপতির উপর। সেনানিবাস এবং স্বেচ্ছা-সৈন্য-সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য পরিচালন করিবার ভারও প্রথম বিভাগের উপর ছিল। দ্বিতীয় বিভাগ কাউন্সিলের একজন 'সাধারণ সভ্যে'র উপর ন্যস্ত ছিল। সেনা-সংক্রান্ত সমস্ত প্রয়োজনীয় চুক্তি, ভারবাহী জন্তুর সংগ্রহ

* 'পঞ্চসংখ্যক দশমবার্ষিক' বিবরণ, ৩৪০ পৃষ্ঠা।

ও রেজেষ্ট্রী করা ইত্যাদি দ্বিতীয় বিভাগের কার্য্য ছিল। গোলন্দাজ বিভাগ, অশ্ব প্রভৃতি বাহনের ব্যাপার, সেনাদিগের জন্য বাড়ী রাস্তা ঘাট প্রভৃতি নির্ম্মাণ, সৈন্যগণের পোষাক-পরিচ্ছদ, ভারতের রাজকীয় নৌসেনা (Royal Indian Marine) এবং 'ভারতীয় চিকিৎসাবিভাগ' সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য দ্বিতীয় বিভাগ অর্থাৎ সামরিক সরবরাহ-বিভাগের অধীনে নিষ্পন্ন হইত।

"১৯০৯ সালের এপ্রিল মাসে সামরিক সরবরাহ-বিভাগ উঠিয়া যায়। যুদ্ধের সহায়ক কার্য্যগুলি, যথা—কামান-বিভাগ, ভারবাহী অশ্বাদির বন্দোবস্ত প্রভৃতি এই বিভাগ হইতে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের অফিসে চলিয়া গেল। সামরিক সরবরাহ-বিভাগের কার্য্য সৈন্য-বিভাগের উপর অর্পিত হইল এবং সমস্ত ভারতীয় সৈন্যের ভার গভর্ণর জেনারলের সভার অন্যতম সদস্য প্রধান সেনাপতি গ্রহণ করিলেন। ভারত গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বোপরি রহিল।"

ভারতীয় সৈন্যের সংখ্যা গণনা করিবার সময়ে 'প্রয়োজনমত ব্যবহারক্ষম' (Reserve) সৈন্যদিগকে ধরা হয় না। পাঁচ হইতে বার বৎসর কাল যাহারা ভারতীয় সৈন্যের কোনও না কোনও দলে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছে, তাহারা এই রিজার্ভ সৈন্যভুক্ত। ভারতীয় সৈন্যের মধ্যে 'রাষ্ট্রীয় সৈন্য'ও (Territorial Force) গণনা করা হয় না। এতদ্ব্যতীত অতিরিক্ত সৈন্য, যুদ্ধের জন্য সংগৃহীত অস্থায়ী সৈন্য, সামরিক পুলিস এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের অধীন ও বেতনভোগী সৈন্য (Imperial Service Troops) আছে। দেশীয় রাজ্যের সৈন্যদল ভারতীয় সেনানায়ক কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়, কিন্তু ইংরেজ সেনাধ্যক্ষেরা তাঁহাদের কার্য্য পরিদর্শন করেন। শেষোক্ত সৈন্য ব্যতীত দেশীয় রাজন্যবর্গ

স্থানীয় সৈন্যদলও রক্ষা করিয়া থাকেন। শিখ রাজ্যে ও রাজপুতানার রাজ্যসমূহে ভাল সৈন্য আছে। গোয়ালিয়র, হায়দারাবাদ ও কাশ্মীরের সৈন্যকে তাহাদের পরে স্থান দেওয়া যাইতে পারে।

দেশীয় সৈন্যবিভাগে যে সকল ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ আছেন, তাঁহাদিগকে পূর্ব্বে 'ভারতীয় সেনাধ্যক্ষের দল' (Indian Staff Corps) বলা হইত। ১৮৬১ সালে যখন দেশীয় সৈন্যের পুনর্গঠন হয়, তখন বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের প্রত্যেকটির জন্য একটি 'ষ্টাফ্ কোরে'র সৃষ্টি হয়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে এই তিন দল একীভূত হয়। ইহার দুই বৎসর পরে 'ষ্টাফ্ কোর' নাম বদ্‌লাইয়া 'ভারতীয় সৈন্য-বিভাগের কর্ম্মাধ্যক্ষ' এই নাম রাখা হইল। ঐ বৎসর তাঁহাদের সংখ্যা ছিল ২,৭০০। উঁহাদিগকে শুধু যে দেশীয় সৈন্যদলে এবং সামরিক কর্ম্মচারীর পদেই কাজ করিতে হয়, তাহা নহে; অ-সামরিক কার্য্যেও তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করা হয়। রাজনীতিক বিভাগের অধিকাংশ পদে এবং অ-নিয়ন্ত্রিত (Non-regulation) প্রদেশসমূহে শাসন ও বিচার-বিভাগের অনেক কার্য্যে তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করা হয়।

সেনাবিভাগে ভারতবাসী—সিপাহীবিদ্রোহের পর হইতে সেনাবিভাগে ভারতবাসীর প্রতিপত্তি বহুপরিমাণে নষ্ট হইয়াছে। শুধু সিপাহীসৈন্যের সংখ্যা যে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমানো হইয়াছে, তাহা নহে; উচ্চবর্ণের লোককে সহসা সৈনিকের কার্য্যে লওয়া হয় না। ভারতীয় সেনা-নায়কের উন্নতির আশাও অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল। সেনাপতি সার জর্জ্জ চেস্‌নী লিখিয়াছেন, "একটি বিষয়ে

ভারতবর্ষের সৈন্যবিভাগের বন্দোবস্ত অপরিবর্ত্তিত ও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। ভারতবর্ষের অপর সকল বিভাগেই উচ্চপদে নিয়োগের দ্বার ভারতবাসীর পক্ষে উন্মুক্ত হইয়াছে। বিচার-বিভাগের অধিকাংশ কর্ম্মচারীই এ দেশবাসী, উচ্চতম বিচারালয়েও ভারতবাসীর স্থান হইয়াছে, কিন্তু সেনা-বিভাগের দ্বার, অতি অল্পকয়েক স্থল ব্যতীত, অদ্যাপি ভারতবাসীর পক্ষে রুদ্ধ আছে। ভারতবর্ষের সৈন্য সম্বন্ধে বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। এখনও দেশীয় সেনা প্রধানতঃ কৃষক বা ঐরূপ নিম্নশ্রেণীর লোক লইয়া গঠিত। ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষগণ তাহাদিগের উপর সেনাপতিত্ব করেন।......অশ্বারোহী সেনাদলে এ দেশীয় সৈন্যের স্থান আরও নিকৃষ্ট হইয়াছে। কারণ পূর্ব্বে ইহারা ১৫০ বা ২০০ সৈন্যের একটি দলের অধিনায়ক হইতে পারিত; কিন্তু এক্ষণে ঐ সকল দলে ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইয়াছে। এ দেশের অতি প্রাচীন কর্ম্মচারীকে উপেক্ষা করিয়া, একজন অতি অল্পবয়স্ক ইংরেজ কর্ম্মচারীকে সৈন্যাধ্যক্ষ-পদে নিয়োগ করা হয়। সেনা-বিভাগের সম্বন্ধে মহারাণীর ঘোষণাপত্র ব্যর্থ হইয়াছে।......ভারতবর্ষে এরূপ একশ্রেণীর বহু ভদ্রলোক আছেন, যাহারা যুদ্ধব্যবসায়কে একমাত্র অবলম্বনীয় বলিয়া মনে করেন। ইঁহাদের পিতৃপিতামহগণ হয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের অধীনে উচ্চ সামরিক পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইংরেজ আমলে তাঁহা-দিগকে এই একমাত্র রাজকীয় চাকুরী হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। যতদিন এরূপ ব্যবস্থা চলিতেছে, ততদিন মহারাণীর ঘোষণাপত্রের প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইয়াছে, এ কথা বলা যায় না।"

এই ব্যবস্থা এক্ষণে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। ভারতবাসী যাহাতে কয়েকটি উচ্চপদে (King's Commissions) নিযুক্ত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এই বিষয়েও, বিগত ইয়ুরোপীয় যুদ্ধের ফলে অনেক মত-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ইতিমধ্যেই কয়েক জন ভারতবাসী সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। বঙ্গীয় এম্বুল্যান্স সৈন্য, বাঙ্গালী পল্টন, ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সৈন্যদল, বিশেষতঃ নবসংগঠিত রাষ্ট্রীয় সেনাদল (Territorial Force) উন্নতির পথ আরও কথঞ্চিৎ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

'স্যাণ্ডহার্ষ্টে'র রাজকীয় সামরিক কলেজে'র ছাত্র (cadets) হইয়া শিক্ষালাভ করিলে ভারতীয় ভদ্রবংশের যুবকেরা সৈন্যাধ্যক্ষ-পদে (King's Commissions) নিযুক্ত হইতে পারেন। ঐ কলেজে এ দেশীয় ছাত্রের জন্য প্রতি বৎসর দশটি করিয়া স্থান রাখিয়া দেওয়া হয়; এবং যাহাতে উপযুক্ত দশটি ছাত্র নিয়মিত ভাবে পাওয়া যায়, তাহার জন্য দেরাদুনে 'প্রিন্স্ অব ওয়েল্‌সের ভারতীয় সামরিক কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের লোক এই কলেজের স্বল্পপরিসর কার্য্যক্ষেত্রে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক-সভায় প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় যে, স্যাণ্ডহার্ষ্টে'র রাজকীয় সামরিক বিদ্যালয়ের মত একটি প্রতিষ্ঠান এ দেশে স্থাপন করিবার জন্য ভারতবাসী সদস্যেরা গভর্নমেণ্টকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন। গভর্নমেণ্ট কিছুদিন পূর্ব্বে সার এণ্ড্রু স্কীনের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত করিয়াছিলেন; ঐ কমিটি ভারতবর্ষে স্যাণ্ডহার্ষ্টে'র ন্যায় একটি কলেজ স্থাপন করা যাইতে পারে কিনা, তাহা বিশেষভাবে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট

দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ভারতবাসীদিগের সামরিক শিক্ষার জন্য এ দেশে একটি স্যাণ্ডহার্ষ্ট স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। বিলাতের স্যাণ্ডহার্ষ্টেও যাহাতে ভারতীয় শিক্ষার্থী আরও অধিক সংখ্যায় প্রবেশ লাভ করিতে পারে, সে বিষয়েও তাঁহারা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ কমিটি মনে করেন যে, ভারতীয় সেনাদলে ভারতবাসী সেনা-নায়কের সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সাধারণ স্কুল কলেজে ছাত্রগণকে এরূপ ভাবে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক, যাহাতে সৈন্যাধ্যক্ষ হইতে হইলে যে সকল সদ্‌গুণের প্রয়োজন, সেগুলি প্রথম হইতেই ছাত্রেরা অর্জ্জন করিতে পারে। এই সকল মন্তব্য গভর্নমেণ্টের বিচারাধীন রহিয়াছে।

ভারতীয় সেনার মধ্যে আটটি দল যাহাতে পরিণামে ভারত-বাসীদের অধিনায়কতায় পরিচালিত হইতে পারে, ভারত গভর্নমেণ্ট তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই আটটি দলের মধ্যে দুই দল অশ্বারোহী, পাঁচ দল পদাতিক ও একদল অগ্রগামী সৈন্য। যে সকল ভারতবাসী 'রাজার কমিশন' পাইয়া সৈন্যাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদের যোগ্যতা ও কার্য্যকালের পরিমাণ অনুসারে ক্রমে তাঁহাদিগকে এই সকল সৈন্যদলের উচ্চপদে নিয়োগ করা হইবে। আশা করা যায় যে, কালে এই সকল সৈন্যদল হইতেই ভারতের জাতীয় সৈন্যের সূত্রপাত হইবে।

দেশ-রক্ষা—সৈন্যদল-গঠন ব্যতীত অন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, যাহাতে দুর্গাদি-নির্ম্মাণের দ্বারা দেশের সামরিক বল বর্দ্ধিত হইতে পারে। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তেই আক্রমণের আশঙ্কা রহিয়াছে। ঐ সীমান্তের যেখানে যেখানে শত্রু-প্রবেশের আশঙ্কা, সেই সেই খানে দুর্গ নির্ম্মাণ করা

হইয়াছে। রেলপথ দ্বারা ভারতবর্ষের সহিত ঐ সকল স্থানের যোগ রাখা হইয়াছে। প্রধান প্রধান বন্দরে দুর্গ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, এবং উহা আধুনিক কামানের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়াছে। পোতাশ্রয়সমূহ রণতরী এবং টর্পেডো-তরণীর দ্বারা সুরক্ষিত। বোম্বাই, সিমলা, দিল্লী, এলাহাবাদ, কলিকাতা এবং অন্যান্য প্রধান নগরে তারবিহীন টেলিগ্রাফ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক দল গগনচারী সেনা শীঘ্রই গঠিত হইবে, এমন সম্ভাবনা আছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক সঙ্কটপূর্ণ যুগে, যখন ওয়ারেন হেষ্টিংস্ গভর্নর জেনারল ছিলেন, তখন ইংরেজ নৌ-সেনা সমুদ্রে ফরাসীদিগকে পরাভূত করিয়াছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জাহাজগুলি, বাণিজ্যপোত এবং রণপোত—উভয় প্রকারেই ব্যবহৃত হইত। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্ল্‌স ও দ্বিতীয় জেম্‌সের সনন্দ-বলে কোম্পানী রণতরী-নির্ম্মাণ ও রক্ষার অনুমতি পাইয়াছিলেন। ১৮২৯ সালে যখন বোম্বাই নৌ-বহর কলিকাতা নৌ-বহরের সহিত মিলিত হইল, তখনই ভারতীয় নৌ-সেনা গঠিত হইল এই নৌ-সেনা হইতে অনেক উপকার পাওয়া গিয়াছে। ১৮৬২ সালে এই নৌ-সেনা উঠিয়া যায়; কারণ ব্যয়-সঙ্কোচ করা আবশ্যক হইয়াছিল এবং এই মনে করা গিয়াছিল যে ভারতবর্ষের রক্ষার ভার ইংলণ্ডের নৌ-সেনার উপর অর্পিত হওয়া উচিত। তৎপরে বোম্বাই নৌ-সেনা গঠিত হয় এবং ১৮৭৭ সালে এই নৌ-সেনা বাঙ্গালা নৌ-বাহিনীর সহিত মিলিত হয় এবং পরে ইহার নাম হয় "রাজকীয় ভারত-নৌ-সেনা"; ভারতের উপকূলের বন্দরসমূহের সৈন্য ও পণ্যাদি বহন ও রক্ষা করাই উহার কার্য্য। ১৮৯১ সালে ভারতীয় নৌ-সেনার যে সমস্ত টর্পেডো-তরী, কামান-

সমন্বিত জাহাজ প্রভৃতি ছিল, তাহা বিলাতের নৌ-বিভাগের (Admiralty) হস্তে অর্পিত হয়। ইহার কর্ম্মচারী রাষ্ট্র-সচিব কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। জাহাজগুলিকে রণ-সজ্জায় সজ্জিত করিবার ব্যবস্থা আছে। বোম্বাই ও কলিকাতায় ডক্ বা পোতাশ্রয় নির্ম্মিত হইয়াছে। 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া নৌ-বহরে'র খরচ যোগাইবার জন্য ভারত গভর্নমেণ্ট ১৮৯৬-৯৭ সাল হইতে প্রতি বৎসর পনের লক্ষ টাকা বিলাতে পাঠাইয়া থাকেন। এই সকল জাহাজ ভারত গভর্নমেণ্টের সম্মতি-ব্যতিরেকে নির্দ্দিষ্ট সীমার বাহিরে যুদ্ধার্থ প্রেরিত হইতে পারে না। বর্ত্তমান কালে যত দূর দেখা যায়, তাহাতে ভারতবর্ষের লোকের মনে জলশত্রু হইতে দেশরক্ষার প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের (Indian Legislative Assembly) সভ্যগণের উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সমুদ্রে ভারতীয়দিগের যাহাতে প্রতিষ্ঠা হয়, তাহার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছে। নৌ-বিদ্যা যাহাতে ভারতেই শিক্ষা করা যায়, তাহার ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব উঠিয়াছে। ভারতে নৌ-বিদ্যার কলেজ-স্থাপন, 'রাজকীয় ভারত-নৌ-বিভাগে'র উচ্চপদে ভারতীয়দিগের নিয়োগ, জাতীয় বাণিজ্য-বিস্তারে উৎসাহ-প্রদান এবং শিক্ষার্থ জাহাজের জন্য গভর্নমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। ভারতীয় বাণিজ্য-নৌ-বহর প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য ১৯২২ সালে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাহার ফলে, পরবৎসর রাজকীয় ভারত-নৌ-সেনার ডিরেক্টার ক্যাপ্টেন হেড্ল্যামের সভাপতিত্বে একটি কমিটি

বসিয়াছিল। সেই কমিটি যে সকল সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, ভারতবর্ষের জনমত যেমন রাজকীয় ভারতীয় বাণিজ্য-বহর চাহে, তেমনি 'রাজকীয় ভারত-নৌ-সেনা' গঠন করিতেও ব্যগ্র। এই নৌ-সেনা সংগঠিত হইলে, তাহাতে বর্ত্তমান ভারতীয় নৌ-সেনাদলের স্থান হইতে পারে। ভারতের জাহাজ, বন্দর, পোতাশ্রয় প্রভৃতি রক্ষা করিতে হইলে যে একটি নৌ-বাহিনীর দরকার, ইহা কমিটি নিঃসংশয়রূপে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা 'উর্‌সেষ্টার' বা 'কন্‌ওয়ে' জাহাজের ন্যায় একখানি জাহাজ বোম্বাই উপকূলে রাখা আবশ্যক মনে করেন, যাহাতে সেই জাহাজে ভারতীয় যুবকেরা নৌ-চালন-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া উচ্চপদে নিযুক্ত হইতে পারে। 'ডফ্‌রিন' নামে একখানি যুদ্ধ-জাহাজ এই উদ্দেশ্যে আসিয়াছে। কমিটি যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এত দিন গভর্নমেণ্টের বিচারাধীন ছিল। বড় লাট লর্ড রেডিং তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হইবার কিছু পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ভারত গভর্নমেণ্ট একটি ভারতীয় নৌ-সেনা সৃষ্টি করিতে ও তাহার ব্যয় বহন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

উচ্চতর শাসনবিভাগ ও ব্যবস্থাপক-সভা

ভারত-সচিব—১৮৫৮ সালে 'ভারতবর্ষের উৎকৃষ্টতর শাসনে'র জন্য যে আইন পাস হয়, তদনুসারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে ভারত-শাসনের ভার ইংরেজরাজ স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং এইরূপ ব্যবস্থা করা হয় যে, পূর্ব্বে কোম্পানী এবং উচ্চতম শাসন-সমিতির (Board of Control) হস্তে যে ক্ষমতা ছিল, তাহা অতঃপর একজন রাষ্ট্র-সচিব পরিচালন করিবেন। তিনি কতকগুলি বিষয়ে একটি সভার সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিবেন। অন্যান্য রাষ্ট্র-সচিবের ন্যায় ভারত-সচিবও ইংলণ্ডেশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। আইন অনুসারে, ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে তিনিই রাজার পরামর্শদাতা। ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার সদস্যরূপে তিনি পার্লিয়ামেণ্টের নিকট দায়ী এবং পার্লিয়ামেণ্টের প্রতিনিধি স্বরূপ। পার্লিয়ামেণ্টই ভারতের সর্ব্বময় কর্ত্তা।

ইণ্ডিয়া কাউন্‌সিল—ভারত-সচিবের সভা (Council of India) পূর্ব্বে পনের জন সভ্য লইয়া গঠিত ছিল। এক্ষণে এই সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। ভারত-সচিবের ইচ্ছানুসারে সভ্য-সংখ্যা আট হইতে বার পর্য্যন্ত হইতে পারে। সভ্যদিগের মধ্যে অন্ততঃ অর্দ্ধেক এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, তাঁহারা দশ বৎসর কাল ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিয়াছেন এবং নিয়োগের পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন নাই। সভ্যগণ প্রথমতঃ পাঁচ

বৎসরের জন্য নিযুক্ত হয়েন। বিশেষ কারণে এবং রাজকার্য্যানুরোধে আবশ্যক হইলে, তাঁহারা আরও পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইতে পারেন। রাজা পার্লিয়ামেণ্টের উভয় শাখার অভিমত প্রাপ্ত হইলে, কোনও সভ্যকে পদচ্যুত করিতে পারেন। কাউন্সিলের কোনও সভ্য পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য হইতে পারেন না বা ভোট দিতে পারেন না। প্রত্যেক সভ্য বাৎসরিক ১২ শত পাউণ্ড বেতন পান; কাউন্সিলে যে তিন জন ভারতীয় সভ্য আছেন, তাঁহারা ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য অতিরিক্ত ৬ শত পাউণ্ড পাইয়া থাকেন। এই সকল বেতন ইংলণ্ডের রাজস্ব হইতে দেওয়া হইয়া থাকে; পূর্ব্বে ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে দেওয়া হইত।

ভারত গভর্নমেণ্ট সংক্রান্ত যে সকল কার্য্য ইংলণ্ডে নির্ব্বাহিত হয় এবং ভারতবর্ষের সহিত যে পত্র-ব্যবহার হয়, সে সমস্ত ভারত-সচিবের সভাপতিত্বে সম্পন্ন করা ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের কার্য্য।

ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে ব্যয় করা সম্বন্ধে এবং আরও কতকগুলি কার্য্যে ভারত-সচিবের আদেশ ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক। অন্যান্য বিষয়ে ভারত-সচিব কাউন্সিলের মত অগ্রাহ্য করিতেও পারেন। এরূপ স্থলে কোনও সভ্য যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধ মত যুক্তি-সহ লিপিবদ্ধ হইতে পারিবে। সুতরাং এই সভার পরামর্শ দিবার অধিকার আছে, কিন্তু নূতন কিছু প্রবর্ত্তন করিবার অধিকার নাই। ভারত-সচিব কর্ত্তৃক উত্থাপিত না হইলে, যতই প্রয়োজনীয় বিষয় হউক না, কোনও বিষয়েই মতামত দিবার অধিকার কাউন্সিলের নাই। শান্তি অথবা যুদ্ধ কিংবা বৈদেশিক রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ-

বিষয়ে ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা যদি কোন ব্যয় করা পূর্ব্বেই স্থির করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই ব্যয়ের সম্বন্ধে ভারত-সচিব কাউন্‌সিলের মত উপেক্ষা করিতে পারেন।

'ইণ্ডিয়া অফিস' ভারত-সচিবের কার্য্যালয়। ইহা তাঁহার দপ্তরখানা বলিলেও চলে। ইহার মধ্যেও আবার কতকগুলি বিভাগ আছে। প্রত্যেক বিভাগ এক এক জন সেক্রেটারীর অধীন। কাউন্‌সিলও এরূপ ভাবে সমিতিতে বিভক্ত, যাহাতে প্রত্যেক সমিতির অধীনে এক একটি নির্দ্দিষ্ট বিভাগ থাকিতে পারে।

হাই কমিশনার—১৯২০ সালে কাউন্‌সিলের আদেশ-ক্রমে ও সম্রাটের অনুমোদনে 'হাই কমিশনার' নামে একটি পদের সৃষ্টি হইয়াছে। এই কর্ম্মচারী সপার্ষদ ভারত-সচিবের সম্মতিক্রমে ভারতের গভর্নর জেনারল কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয়েন। ইণ্ডিয়া আফিসের যে বৃহৎ ভাণ্ডার আছে, তাহা রক্ষা করা, তাহার হিসাব-পত্র রাখা এবং ভারতীয় ছাত্রবিভাগ পরিচালন করা তাঁহার কার্য্য। লণ্ডনে যে ভারতীয় বাণিজ্যাধ্যক্ষ আছেন, তাঁহার কার্য্যও তিনি পরিদর্শন করেন।

গভর্নর জেনারল—ভারত গভর্নমেণ্টের প্রধান অধ্যক্ষ গভর্নর জেনারল; তিনিই ভারতে রাজার প্রতিনিধি। তিনি সম্রাট্ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয়েন এবং সাধারণতঃ পাঁচ বৎসর কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহার একটি মন্ত্রণা-সভা আছে; তাহাকে কার্য্যনির্ব্বাহক-পরিষৎ (Executive Council) বলা হয়। ইহার সভ্য সম্রাট্ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয়েন; সংখ্যাও সম্রাট্ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হয়। বর্ত্তমানে ইহাতে ৬ জন সভ্য

আছেন; ইহা ব্যতীত প্রধান সেনাপতিও এই সভার সভ্য নিযুক্ত হয়েন।

গভর্নর জেনারলের পরিষদের সভ্যগণ সাধারণতঃ পাঁচ বৎসরের জন্য সম্রাট্ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয়েন। ইঁহাদের মধ্যে তিন জন এমন হওয়া আবশ্যক যে, নিয়োগের পূর্ব্বে তাঁহারা ভারতে অন্ততঃ দশ বৎসর রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং এক জন এমন হইবেন যে, ইংলণ্ড বা আয়র্লণ্ডের ব্যারিষ্টার অথবা স্কট্‌লণ্ডের উকীল সভার সদস্য অথবা কোনও হাইকোর্টে দশ বৎসর ওকালতী করিয়াছেন। অন্য সভ্যগণের যোগ্যতা সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট কোনও নিয়ম নাই। গভর্নর জেনারলের কাউন্‌সিলের সাত জন সভ্যের মধ্যে তিন জন ভারতবাসী।

কাউন্‌সিলের একজন সহকারী সভাপতি নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা গভর্নর জেনারলের উপর অর্পিত হইয়াছে। কাউন্‌সিলের অধিবেশন গভর্নর জেনারল কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট স্থানে হয়। সাধারণতঃ দিল্লী ও সিমলায় ইহার অধিবেশন হয়। এই সকল অধিবেশনে সাধারণের প্রবেশাধিকার নাই।

কাউন্‌সিলের সদস্যদিগের মধ্যে মতভেদ হইলে, সাধারণতঃ অধিকাংশের মতানুসারে কার্য্য হয়; কিন্তু বিশেষ বিশেষ স্থলে গভর্নর জেনারল কাউন্‌সিলের মত উপেক্ষা করিতে পারেন।

ভারত গভর্নমেণ্টের সমস্ত কার্য্য সপার্ষদ গভর্নর জেনারলের কার্য্য বলিয়া উল্লিখিত হয়। শাসন-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য ৭ জন সভ্যের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়া হয়; যথা—(১) আভ্যন্তরীণ (Home) বিভাগ, (২) বাণিজ্য ও রেলওয়ে, (৩) শ্রম ও শিল্প, (৪) শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্তশাসন, (৫) আয়-ব্যয়,

(৬) আইন ও (৭) সৈন্য-বিভাগ। আর একটি প্রধান বিভাগ আছে—বৈদেশিক ব্যাপার। এই বিভাগ স্বয়ং গভর্নর জেনারলের অধীন; সুতরাং ইহার জন্য কোনও পৃথক্ সভ্য নাই। প্রধান সেনাপতি সৈন্য-বিভাগে কর্ত্তৃত্ব করেন।

অপর বিভাগগুলি সম্বন্ধে লক্ষ্য করিতে হইবে:—

(১) আভ্যন্তরীণ বিভাগ—ইহার দ্বারা ইংরেজাধিকৃত ভারতের সাধারণ শাসন-কার্য্য পরিচালিত হয়। আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রনীতি, আইন, বিচার, জেল, পুলিস এবং আরও কতকগুলি বিষয় এই বিভাগে সম্পাদিত হয়।

(২) বাণিজ্য ও রেলওয়ে বিভাগ—বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা এবং লোকের মধ্যে সে সকল বিস্তার করা ইহার কার্য্য। শুল্ক, বন্দর ও বাণিজ্য-জাহাজ প্রভৃতি সংক্রান্ত কার্য্যও এই বিভাগের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। 'রেলওয়ে বোর্ড' এই বিভাগের একটি অংশ। রেলওয়ে বিভাগের কাজ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। দুইটি প্রধান রেলওয়ে—'ই. আই.' ও জি. আই. পি.' রেলওয়ে—ভারত গভর্নমেণ্টের হস্তে আসিয়াছে। রেলওয়ের সমস্ত কার্য্য পরিদর্শন করিবার জন্য গভর্নমেণ্ট একজন চীফ্ কমিশনার নিযুক্ত করিয়াছেন ও 'রেলওয়ে বোর্ড' সৃষ্টি করিয়াছেন।

(৩) শ্রমশিল্প ও শ্রমিক বিভাগ—এই বিভাগ পূর্ব্বে 'বাণিজ্য ও শ্রমশিল্প' বিভাগের অন্তর্গত ছিল। লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে 'বাণিজ্য ও শ্রমশিল্প' বিভাগের সৃষ্টি করেন। ১৯২০ সালে, শ্রমশিল্প-সম্বন্ধীয় কমিশনের নির্দ্দেশ অনুসারে, এই বিভাগ হইতে পৃথক্ করিয়া একটি 'শ্রমশিল্প ও শ্রমিক বিভাগ' প্রবর্ত্তিত হয়। ইহার নাম হইতেই ইহার কার্য্যের পরিচয়

পাওয়া যায়। শ্রমিক-শিল্প সম্বন্ধে সমস্ত কার্য্য ও ভারত গভর্নমেণ্টের শ্রমিক-নীতি-নির্ণয় এই বিভাগের দ্বারা হইয়া থাকে। ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ সম্প্রতি এই বিভাগের অধীনে রহিয়াছে।

(৪) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগ—এই বিভাগ ১৯১০ সালে প্রবর্ত্তিত হয়। শিক্ষা, হাঁসপাতাল, সাধারণের স্বাস্থ্য, মিউনিসিপ্যালিটী, লোকাল বোর্ড, এবং খৃষ্ট-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বিষয়সমূহ এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্তশাসন-সম্বন্ধে ভারত গভর্নমেণ্ট যে নীতির অনুসরণ করিবেন, তাহা নির্দ্ধারণ করাও এই বিভাগের কার্য্য।

(৫) আয়-ব্যয় বিভাগ—এই বিভাগ আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার, রাজকীয় কর্ম্মচারিগণের বেতন, বিদায়, পেন্‌সন প্রভৃতি বিষয় এবং নোট ও ব্যাঙ্কিং-সংক্রান্ত কার্য্য পরিচালন করে। ভারত গভর্নমেণ্টের বাৎসরিক বজেট বা আয়-ব্যয-বিবরণ প্রস্তুত করাও ইহার কার্য্য মধ্যে গণ্য।

১৯২৫ সাল হইতে রেলওয়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব পৃথক্ হইয়াছে। রেলওয়ে বিভাগ প্রতি বৎসর কোটী কোটী টাকা ব্যয় করে। সুতরাং গভর্নমেণ্ট পৃথক্ ভাবে ইহার আয়-ব্যয়-বিবরণ প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিয়া সুবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন।

(৬) ব্যবস্থাপক বা আইন বিভাগ—এই বিভাগ আইন-ঘটিত সমস্ত বিষয়ে তত্ত্বাবধান করে এবং ভারত গভর্নমেণ্টকে ঐ বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক-সভায় যে সকল আইন উপস্থাপিত হয়, তাহার সম্বন্ধে বিবেচনা করা এবং গভর্নমেণ্টের অন্যান্য বিভাগকে আইন-ঘটিত ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া এই বিভাগের কার্য্য।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সভা—১৯১৯ সালের 'ভারত-শাসন আইন' অনুসারে ব্যবস্থাপক-সভার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ব্যবস্থাপক-সভাকে দুই ভাগে বা 'প্রকোষ্ঠে' বিভক্ত করা হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় পরিষৎ (Council of State) নামে একটি 'দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ' বা সভার সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সভা বলিতে এক্ষণে গভর্নর জেনারল, 'রাষ্ট্রীয় পরিষৎ' ও 'ব্যবস্থা-পরিষৎ' (Legislative Assembly) বুঝায়।

রাষ্ট্রীয় পরিষৎ—(১) তেত্রিশ জন নির্ব্বাচিত সভ্য ও (২) সাতাশ জন মনোনীত সভ্য লইয়া এই পরিষৎ গঠিত। শেষোক্ত সভ্যদিগের মধ্যে কুড়ি জনের অধিক রাজকর্ম্মচারী এবং এক জন বেরারের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি গভর্নমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হয়েন। বঙ্গদেশ হইতে এই পরিষদে ৬ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন; তন্মধ্যে ২ জন মুসলমান, ৩ জন অ-মুসলমান এবং ১ জন ইয়ুরোপীয় বণিক্‌দের প্রতিনিধি।

ব্যবস্থা-পরিষৎ—(১) ১০৩ জন নির্ব্বাচিত সভ্য, (২) ২৬ জন মনোনীত সরকারী কর্ম্মচারী এবং (৩) ১৫ জন মনোনীত বে-সরকারী সভ্য (ইহার মধ্যে একজন বেরারের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি) লইয়া ব্যবস্থা-পরিষৎ গঠিত। বঙ্গদেশ হইতে এই পরিষদে ১৬ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়েন; তন্মধ্যে ৬ জন মুসলমান, ৬ জন অ-মুসলমান, ৩ জন ইয়ুরোপীয় বণিক্‌দের প্রতিনিধি এবং ১ জন জমিদারদিগের প্রতিনিধি।

রাষ্ট্রীয় পরিষৎ ও ব্যবস্থা-পরিষদে যে সকল প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়েন, তাঁহাদিগকে সাধারণ বা বিশেষ বিশেষ নির্ব্বাচক-মণ্ডলী নির্ব্বাচন করে। নির্ব্বাচকদিগের যে তালিকা আছে,

তাহাতে নাম ভুক্ত করিতে হইলে, ইংরেজ রাজ্যের প্রজা হওয়া চাই ; উন্মাদগ্রস্ত হইলে, কোনও কোনও অপরাধে অপরাধী হইলে বা একুশ বৎসরের কম বয়স হইলে কাহাকেও নির্ব্বাচক-তালিকা-ভুক্ত করা হয় না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেশীয় রাজ্যের প্রজারাও ভোট দিতে অনধিকারী নহে। বিশেষ নির্ব্বাচক-মণ্ডলীতে ভোট দিবার অধিকার ভিন্ন ভিন্ন রূপ যোগ্যতার উপর নির্ভর করে ; যথা—বণিক্-সভা, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি। এক ব্যক্তি মাত্র একটি সাধারণ নির্ব্বাচক-মণ্ডলীতে ভোট দিতে পারিবে। তবে বিশেষ নির্ব্বাচক-মণ্ডলীতে যাহাদের ভোট দিবার অধিকার আছে, তাহারা সাধারণ নির্ব্বাচনেও ভোট দিতে পারে।

সাধারণ নির্ব্বাচক-মণ্ডলীতে ভোট দিবার অধিকার নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর নির্ভর করে :—

(ক) সম্প্রদায় ;

(খ) বাসস্থান ;

(গ) (১) কোনও বাড়ীর মালিক হইলে বা সেই বাড়ীতে বাস করিলে ; (২) মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স বা সেনানিবাসের হার বা স্থানীয় কোনও হার দিতে হইলে বা ধার্য্য হইলে, (৩) আয়-কর দিলে, (৪) জমাজমি থাকিলে অথবা (৫) স্থানীয় কোনও বোর্ডের সভ্য হইলে, ভোট দিতে পারা যায়।

রাষ্ট্রীয় পরিষদের বা ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্যপদের যোগ্য হইতে হইলে, ঋণ-পরিশোধক্ষম, ইংরেজ রাজ্যের প্রজা, পুরুষ এবং পঁচিশ বৎসরের অন্যূন বয়স হওয়া আবশ্যক। উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি, অন্য ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য বা ওকালতী হইতে পদচ্যুত ব্যক্তি সভ্যপদের যোগ্য নহেন। ঐ দুই পরিষদের সদস্যগণকে

সেই সেই সভায় আসন গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে বশ্যতামূলক শপথ করিতে হয়; অর্থাৎ সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তবে তাঁহাদিগকে আসন গ্রহণ করিতে হয়।

প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় পরিষৎ পাঁচ বৎসরের জন্য ও প্রত্যেক ব্যবস্থা-পরিষৎ তিন বৎসরের জন্য সংগঠিত হয়। গভর্নর জেনারল কোনওটিরই সভাপতি নহেন। কিন্তু তিনি ইচ্ছামত যে কোনও পরিষদে অভিভাষণ করিতে পারেন এবং সেই উদ্দেশ্যে সভ্যগণকে উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ করিতে পারেন। কোনও কোনও অবস্থায় তিনি উভয় পরিষদের স্থিতিকাল কমাইয়া বা বাড়াইয়া দিতে পারেন। তিনি উভয় পরিষৎ আহ্বান করিতে পারেন এবং উহাদের অধিবেশন শেষ করিয়া দিতে পারেন। প্রত্যেক পরিষদের একজন সভাপতি আছেন। রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতি সভ্যগণের মধ্য হইতে গভর্নর জেনারল কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয়েন। ব্যবস্থা-পরিষদের প্রথম সভাপতি গভর্নর জেনারল কর্ত্তৃক ৪ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ ৪ বৎসর পরে ব্যবস্থা-পরিষৎ নিজের সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া লয়। সহকারী সভাপতিও ঐ পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয়েন। গভর্নর জেনারলের কার্য্যনির্ব্বাহক-সভার সদস্যগণ যে কোনও একটি পরিষদের সভ্য মনোনীত হইতে পারেন এবং উভয় পরিষদে বক্তৃতা করিতে পারেন।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সভা যে কোনও ব্যক্তি, যে কোনও আদালত এবং ইংরেজাধিকৃত ভারতের যে কোনও স্থান এবং যে কোনও বস্তুর সম্বন্ধে আইন করিতে পারেন। পার্লিয়ামেণ্ট-কৃত কতকগুলি আইনে (যাহা 'ভারত-শাসন আইনে'র ৬৫ ধারার

২য় উপধারায় উক্ত হইয়াছে) হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার ব্যবস্থাপক-সভার নাই ; অথবা পার্লিয়ামেণ্টের অধিকার বা প্রভুত্ব এবং রাজার প্রতি বশ্যতা সম্বন্ধে কোনও আইন করিবার অধিকার নাই। এই কয়েকটি বিষয় ব্যতীত আর সকল স্থলেই ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সভার আইন করিবার অধিকার অক্ষুণ্ণ আছে। সমস্ত আইন উভয় পরিষৎ কর্তৃক পাস হওয়া আবশ্যক। কোনও আইন যদি এক পরিষদে পাস হয়, কিন্তু অপর পরিষদে ছয় মাসের মধ্যে পাস না হয়, তাহা হইলে গভর্নর জেনারল উভয় পরিষদের একত্র অধিবেশনের আদেশ দিতে পারেন। যখন কোনও আইন উভয় পরিষৎ কর্তৃক পাস হয়, তখন উহা গভর্নর জেনারলের অনুমোদনের জন্য পাঠাইতে হইবে। গভর্নর জেনারল তখন নিম্নলিখিত তিনটি পন্থার একটি অবলম্বন করিতে পারেন :—

(১) তিনি 'বিলে' সম্মতি প্রদান করিতে পারেন। সেরূপ করিলে 'বিল্' আইন বলিয়া গণ্য হইবে। সম্রাট্ উহা রদ না করিলে, উহা চিরদিন বলবৎ থাকিবে।

(২) তিনি সম্মতি নাও দিতে পারেন; সে ক্ষেত্রে উহা 'আইন' হইতে পারিবে না।

(৩) তিনি সম্রাটের অনুমতির জন্য বিল্ রাখিয়া দিতে পারেন। সম্রাট্ সম্মতি না দিলে এবং সে সম্মতি গভর্নর জেনারল কর্তৃক বিজ্ঞাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত, উহা আইন হইতে পারিবে না।

উভয় পরিষদের সভ্যগণ সাধারণ ব্যাপার সম্বন্ধে সংবাদ পাইবার নিমিত্ত প্রশ্ন করিতে পারেন। প্রশ্নের উত্তর দিলে কোনও সভ্য বিষয়টি আরও বিশদ করিবার জন্য অতিরিক্ত

প্রশ্ন করিতে পারেন। জনসাধারণের কল্যাণকর কোনও বিষয়ে প্রস্তাব উপস্থিত করিবার অধিকার সকল সদস্যেরই আছে। উভয় পরিষদেই বক্তৃতা সম্বন্ধে প্রত্যেক সভ্যের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে; তবে তাঁহাকে কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। 'ব্যবস্থা-পরিষদে'র একটি অতিরিক্ত ক্ষমতা আছে—ব্যয় মঞ্জুর করা। এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইলে গভর্নর জেনারল ব্যবস্থাপক-সভার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াও একপ্রকার আইন (Ordinances) করিতে পারেন; ঐ আইন ৬ মাস কাল বলবৎ থাকে।

ভারতবর্ষের প্রদেশসমূহ—ইংরেজাধিকৃত ভারতে ৯টি বড় এবং ৬টি ছোট প্রদেশ আছে। প্রথম ৯টি, যথা—মান্দ্রাজ, বোম্বাই, বাঙ্গালা, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার ও উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, আসাম এবং ব্রহ্মদেশ। ছোট প্রদেশগুলি, যথা—উত্তরপশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ, ইংরেজাধিকৃত বেলুচিস্থান, কুর্গ, আজমীর, আন্দামান এবং দিল্লী।

মান্দ্রাজ ও বোম্বাই পূর্ব্বেকার বাণিজ্যার্থ স্থাপিত কুঠী হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। এক্ষণে ঐ দুইটি গভর্নর-শাসিত প্রদেশ। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে সিন্ধু দেশ বিজিত হইবার পরে উহা বোম্বাই প্রদেশ-ভুক্ত হয়।

আগেকার বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সী ১৭৭৩ সালের আইনের ফলে গভর্নর জেনারল কর্তৃক শাসিত হইত। সে সময়ের ভারতে মাত্র তিনটি প্রেসিডেন্সী ছিল। সামরিক ও রাজনীতিক কার্য্যানুরোধে উত্তরপশ্চিম পর্য্যন্ত বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর বিস্তৃতি ছিল। পরে পার্লিয়ামেণ্টে এক আইন হওয়ায় ১৮৩৬ সালে উত্তরপশ্চিম প্রদেশ স্বতন্ত্র হইল এবং উহা একজন লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নরের অধীনে

স্থাপিত হইল। গভনর জেনারলের আরও ভার-লাঘব হইল, যখন বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যায় একজন লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নর নিযুক্ত হইলেন। ইহার পরে পাঞ্জাব প্রদেশ হইল। ১৮৪৯ সালে বিজিত হইবার পর ইহা একটি শাসন-সমিতি কর্ত্তৃক শাসিত হয় এবং তৎপরে একজন চীফ্‌ কমিশনারের অধীনে স্থাপিত হইল। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর দিল্লী ইহার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ইহা একজন লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নরের শাসনাধীন হয়। এক্ষণে পাঞ্জাব গভর্নরের অধীন। ১৮৫৬ সালে অযোধ্যা ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হয় এবং একজন চীফ্‌ কমিশনারের অধীনে স্থাপিত হয়। পরে ১৮৭৭ সালে সেই স্থলে একজন লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নর উত্তরপশ্চিম প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হয়েন। লর্ড কার্জনের আমলে উত্তরপশ্চিম প্রদেশ এবং অযোধ্যার পুনরায় নামকরণ হইল 'আগ্রা ও অযোধ্যার যুক্তপ্রদেশ'; ইহা এক্ষণে গভর্নরের অধীন। নিম্নস্থ ব্রহ্মদেশ ১৮৬২ সালে একজন চীফ্‌ কমিশনারের অধীনে স্থাপিত হয়। ১৮৮৬ সালে উপরিস্থ ব্রহ্মদেশ যুক্ত হয় এবং ১৮৯৭ সালে সমগ্র ব্রহ্মদেশের উপর একজন লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নর নিযুক্ত হয়েন। ব্রহ্মদেশ এক্ষণে গভর্নরের অধীন। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের কতকাংশ এবং কয়েকটি রাজ্যের উত্তরাধিকারী না থাকায় সেই সকল রাজ্য লইয়া মধ্যপ্রদেশ গঠিত হয় এবং একজন চীফ্‌ কমিশনারের অধীনে স্থাপিত হয় (১৮৬১)। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে নিজামের নিকট হইতে বেরার চিরস্থায়ী ইজারা লইয়া মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পূর্ব্বে বহুদিন পর্য্যন্ত বেরার ইংরেজদের অধিকারভুক্ত ছিল। আসাম ১৮২৬ সালে বিজিত হয় ও বাঙ্গালাদেশের সহিত যুক্ত হয়। পরে আবার

বিযুক্ত হইয়া একজন চীফ্ কমিশনারের অধীনে স্থাপিত হয় (১৮৪৭)। ১৯০৫ সালে যখন বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ হয়, তখন 'পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম' একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ হয় এবং একজন লেফ্টেনাণ্ট গভর্নর ইহার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হয়েন; পশ্চিম বঙ্গও একজন লেফ্টেনাণ্ট গভর্নরের অধীনে স্থাপিত হয়। ১৯১২ সালে এই ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়। এক্ষণে বঙ্গ ও আসামে এক এক জন গভর্নর নিযুক্ত হইয়াছেন। 'বিহার ও উড়িষ্যা' লইয়া যে স্বতন্ত্র প্রদেশ হইল, তাহাতেও একজন গভর্নর নিযুক্ত হইয়াছেন। পাঞ্জাব হইতে কতকগুলি জেলা স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া নিরাপদের জন্য 'উত্তরপশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ' গঠিত হইল (১৯০১)। ১৮৮৭ সালে ইংরেজাধিকৃত বেলুচিস্থান চীফ্ কমিশনারের অধীনে একটি প্রদেশ হইল। কুর্গ ১৮৩৪ সালে যুক্ত হয়; মহীশূরে বড়লাটের যিনি প্রতিনিধি (Resident) আছেন, তিনিই উহা শাসন করেন। আজমীর ১৮১৮ সালে প্রাপ্ত হওয়া যায়; উহাও ঐরূপ রাজপুতানায় বড়লাটের প্রতিনিধি কর্ত্তৃক শাসিত হয়। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে যে কয়েদীদিগের আবাস আছে, তাহা পোর্ট-ব্লেয়ারের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ চীফ্ কমিশনার রূপে শাসন করেন। ১৯১১ সালে যখন দিল্লীতে সম্রাটের দরবার হয়, তখন দিল্লী ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান লইয়া একটি ছোট প্রদেশ হয় এবং উহার ভার একজন চীফ্ কমিশনারের উপর অর্পিত হয়।

১৯১৯ সালের আইন-ঘটিত পরিবর্ত্তন—
'১৯১৯ সালের ভারত-শাসন আইনে' প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের গঠন ও অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। ১৯১৭ সালের ২০শে আগষ্ট ভারত-সচিব মাননীয় মিষ্টার ই. এস. মণ্টেগু মহোদয়

যে উক্তি করিয়াছিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য এই আইন পাস হয়। "ভারত গভর্নমেণ্টের সম্পূর্ণ সম্মতি অনুসারে সম্রাটের গভর্নমেণ্ট এই নীতি অনুসরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন যে, শাসনতন্ত্রের প্রত্যেক বিভাগে উত্তরোত্তর অধিকসংখ্যক ভারতবাসীকে লওয়া হইবে এবং ভারতবর্ষ যাহাতে সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট অংশরূপে দায়িত্বপূর্ণ শাসনকার্য্যে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে পারে, সে জন্য ভারতে স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠানগুলিকে ক্রমে গড়িয়া তুলিতে হইবে।" ১৯১৯ সালের আইন এবং তদন্তর্গত নিয়মাবলী উল্লিখিত নীতি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নানাবিধ পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিয়াছে।

নূতন প্রণালীর প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র— ১৯১৭ সালের ২০শে আগষ্টের বিখ্যাত উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ শাসনপ্রণালীর আদর্শ প্রজাসাধারণের প্রতিনিধিগণের উপর শাসনের ভার ক্রমশঃ অর্পণ করা। এই উদ্দেশ্যে প্রধান ৯টি প্রদেশে (এগুলিকে গভর্নর-শাসিত প্রদেশ বলে) এক প্রকার নূতন শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা লোকের প্রতিনিধিগণের উপর ক্রমশঃ দায়িত্ব ন্যস্ত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই শাসন-প্রণালীতে এক দিকে গভর্নর ও তাঁহার কার্য্যনির্ব্বাহক-সভা—কর্ম্মচারিতন্ত্র, অপর দিকে গভর্নর এবং মন্ত্রীরা—গণতন্ত্র। মন্ত্রীরা ব্যবস্থাপক-সভায় নির্ব্বাচিত সদস্যগণের মধ্য হইতে গভনর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। সপার্ষদ গভর্নর ভারত-সচিবের নিকট,—তথা পার্লিয়ামেণ্টের নিকট—পূর্ব্বের মতই দায়ী রহিলেন। মন্ত্রীরা ব্যবস্থাপক-সভার নিকট দায়ী এবং যত দিন সে সভা তাঁহাদের কার্য্য সমর্থন ও তাঁহাদের

প্রতি আস্থা স্থাপন করিবেন, ততদিনই তাঁহারা মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন। এইরূপ দ্বিবিধ শাসনকে দ্বৈতশাসন (Dyarchy) বলা হইয়াছে। এই দ্বৈতশাসনের জন্য প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—কতকগুলি বিষয় (যথা, ভূমির রাজস্ব, বিচার, পুলিস, বন্দর, রেলওয়ে, সংবাদপত্র, গ্রন্থ ও মুদ্রাযন্ত্রের তত্ত্বাবধান ইত্যাদি) সপার্ষদ গভর্নরের অধিকার-ভুক্ত রহিয়াছে। এগুলিকে 'রক্ষিত' (Reserved) বিষয় বলা হয়। আর কতকগুলি বিষয় (যথা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, শিক্ষা, সাধারণের স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষা, পূর্ত্তকার্য্য, কৃষি, যৌথ কারবার, মৎস্যব্যবসায়, বনজঙ্গল, আবকারী, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ও দাতব্য ধন-ভাণ্ডার, শ্রমশিল্পের পরিপুষ্টি ইত্যাদি) মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ-মতে গভর্নর পরিচালন করেন। এগুলিকে 'হস্তান্তরিত' (Transferred) বিষয় বলা যায়।

এইরূপে প্রাদেশিক শাসন দুই শাখায় নির্ব্বাহিত হইতেছে। প্রত্যেক শাখাই তাহার অন্তর্গত কার্য্যের জন্য দায়ী। প্রত্যেকের কার্য্য এরূপ ভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহার নির্দ্দিষ্ট অংশের জন্য তাহাকে দায়ী করা যায়। অথচ গভর্নর উভয় শাখার সহিত সংস্পৃষ্ট থাকায়, শাসনতন্ত্রের উভয়ার্দ্ধের মধ্যে যোগ রহিয়াছে। প্রয়োজন বোধ করিলে, গভর্নর তাঁহার কার্য্যনির্ব্বাহক-সভার সভ্যগণকে ও মন্ত্রিগণকে একই অধিবেশনে আহ্বান করিয়া পরামর্শ করিতে পারেন। ভবিষ্যতে উন্নতি হইতে হইলে, কর্ম্মচারিবৃন্দের হস্তে যে সকল বিষয়ের ভার রহিয়াছে, তাহা ক্রমশঃ জনগণের প্রতিনিধিদিগের হস্তে ন্যস্ত করিতে হইবে। ১৯১৯ সালের ভারত-আইনে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল যে, পার্লিয়ামেণ্ট কমিশন বসাইয়া দেখিবেন কোন

কোন্ বিষয় এইরূপে 'হস্তান্তরিত' করা যায়। ১৯২৯ সালের মধ্যেই এইরূপ এক কমিশন নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষের রাজনীতিক অবস্থা কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা তদন্ত করিবে, পার্লিয়ামেণ্টের এইরূপ নির্দ্দেশ ছিল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই যাহাতে ঐরূপ কমিশন নিযুক্ত হয়, এ জন্য ব্যবস্থা-পরিষদে ও অন্যান্য স্থলে আন্দোলন হয়। তাহার ফলে ১৯২৭ সালের ৮ই নবেম্বর পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক এক রাজকীয় কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল। সার জন সাইমন এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন। ভারতের শাসন-প্রণালী-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়, শিক্ষার উন্নতি, স্বায়ত্তশাসন-মূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিস্তার প্রভৃতি বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য ইহাদের প্রতি ভারার্পিত হইয়াছিল।

সাইমন কমিশনের সমস্ত সদস্যই ইংরেজ ছিলেন। তাঁহারা পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য। ভারতবাসী কাহাকেও এই কমিশনের সভ্যশ্রেণী-ভুক্ত করা হয় নাই বলিয়া এ দেশে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে তুমুল অন্দোলন উপস্থিত হয়।

বিলাতের শাসনতন্ত্রে পরিবর্ত্তন—ইতিমধ্যে বিলাতের শাসনতন্ত্রে পরিবর্ত্তন ঘটিল। রক্ষণশীল (Conservative) দলের স্থলে শ্রমিক (Labour) দল শাসনভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের পরামর্শমতে রাজপ্রতিনিধি লর্ড আরউইন ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ঘোষণা করেন যে, ভারতে যে স্বায়ত্ত-শাসন-নীতির অনুবর্ত্তন করা হইতেছে, তাহা অদূর ভবিষ্যতে 'ডমিনিয়ন' বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য স্বাধীন রাজ্যের অধিকার (status) প্রাপ্ত হইবে, ইহাই পার্লিয়ামেণ্টের অভিপ্রায়। ক্যানাডা, দক্ষিণ-আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ইংলণ্ডের যে সকল

উপনিবেশ বা দূরস্থিত রাজ্য (ডমিনিয়ন) আছে, সেগুলি আভ্যন্তরীণ শাসন বিষয়ে যেরূপ স্বাধীন, ভারতবর্ষকেও ক্রমশঃ সেইরূপ স্বাধীনতা প্রদান করা হইবে। রাজপ্রতিনিধির ঘোষণায় ইহাও ব্যক্ত হইয়াছিল যে, ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী কি ভাবে পরিবর্ত্তিত করিলে সাধারণের মনঃপূত হইতে পারে, তাহা স্থির করিবার জন্য এ দেশের প্রতিনিধি ও পার্লিয়ামেণ্টের কয়েক জন সভ্য লইয়া ইংলণ্ডে সত্বর একটি গোলটেবিল বৈঠক (Round Table Conference) বা সম্মিলন বসিবে। গোল টেবিল বৈঠকের অর্থ এই যে, এই প্রকার সম্মিলনের সভ্যগণ তুল্যভাবে অকপটে সকল বিষয় আলোচনা করিতে পারেন।

১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডনে এই বৈঠক আরম্ভ হইয়াছিল। ভারতের কতিপয় গণনায়ক এই বৈঠকের সভ্যরূপে গভর্নমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে দেশীয় রাজন্য এবং কতিপয় মহিলাও ছিলেন। প্রথমবারের অধিবেশনে জাতীয় মহাসভার (কংগ্রেসের) কোনও সভ্য যাইতে স্বীকৃত হয়েন নাই। দ্বিতীয় বারে মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করিয়াছিলেন। বড়লাট লর্ড আরউইনের সহিত মহাত্মা গান্ধীর যে সন্ধিমূলক কথাবার্ত্তা হয়, তাহারই ফলে গান্ধীজী গোল টেবিল বৈঠকে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ইহার পরে গোল টেবিল বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সকল বৈঠকে যে সকল বিষয় মীমাংসিত হইয়াছিল, তাহা অবলম্বন করিয়া সম্প্রতি সরকার হইতে এক 'শ্বেত পত্র' (White Paper) প্রকাশিত হইয়াছে। এই দলিলে ভারতবর্ষের

শাসন-প্রণালীতে যে সকল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবে, তাহার প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছে। এই সকল প্রস্তাব পার্লিয়ামেণ্টের গণসভা ও অভিজাত-সভা কর্ত্তৃক মনোনীত এক সমিতি কর্ত্তৃক আলোচিত হইবে। সেই সমিতিতে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিও লওয়া হইবে।

শ্বেত পত্রে যে সকল প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ভারতে এক সম্মিলিত শাসন-তন্ত্র (Federal Government) প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই শাসন-তন্ত্রের কর্ত্তা হইবেন গভর্নর জেনারল। তিনি রাজপ্রতিনিধি রূপে ব্রিটিশ ভারতবর্ষ ও দেশীয় রাজ্য সমূহের উপর আধিপত্য করিবেন। তাঁহার সাহায্যের জন্য কয়েকজন মন্ত্রী থাকিবেন। এই মন্ত্রীরা ব্যবস্থাপরিষদের নিকট দায়ী থাকিবেন। ব্যবস্থাপরিষৎ এখনকার মত দুই ভাগে বিভক্ত হইবে: ব্যবস্থাপক-সভা (House of Assembly) ও রাষ্ট্রীয় পরিষৎ (Council of State)। গভর্নর জেনারল মন্ত্রিগণের পরামর্শ লইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। ব্যবস্থাপক-সভায় ও রাষ্ট্রীয় পরিষদে যে সকল দেশীয় রাজন্য সম্মিলিত শাসন-তন্ত্রে যোগদান করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের প্রতিনিধি থাকিবেন এবং প্রত্যেক প্রদেশ হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবেন। শান্তি-রক্ষা, দেশ-রক্ষা প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে গভর্নর জেনারলের বিশেষ দায়িত্ব থাকিবে। অর্থাৎ সম্রাটের প্রতিনিধি রূপে তিনি ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক মনে করেন, তাহা ব্যবস্থা-পরিষদের এবং মন্ত্রি-সভার পরামর্শ উপেক্ষা করিয়াও করিতে পারিবেন। অন্য সকল বিষয়ে তিনি তাঁহার মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ মানিয়া চলিবেন।

সম্মিলিত ব্যবস্থা-পরিষদে আপাততঃ ১১টি প্রদেশের প্রতিনিধি লওয়া হইবে। এই প্রদেশগুলির মধ্যে উড়িষ্যা ও সিন্ধুপ্রদেশ নূতন গঠিত হইবে। প্রত্যেক প্রদেশে এমন একটি শাসন-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে, যাহা কেন্দ্রীয় শাসন-তন্ত্র হইতে অল্পবিস্তর স্বাধীন। সম্রাটের মনোনীত একজন গভর্নর থাকিবেন ইহার কর্ত্তা। প্রত্যেক গভর্নরের একটি মন্ত্রি-সভা হইবে; এই মন্ত্রি-সভা ব্যবস্থাপরিষদের (Legislature) নিকট দায়ী থাকিবেন। মন্ত্রিগণ গভর্নর কর্ত্তৃক মনোনীত এবং ব্যবস্থাপরিষদের সভ্য হইবেন। প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষৎ কোনও কোনও স্থলে একটি থাকিবে, তাহার নাম হইবে লেজিস্‌লেটিভ্ এসেম্‌ব্লি। কোনও কোনও প্রদেশে (যথা বাঙ্গালা, বিহার ও যুক্তপ্রদেশ) এই ব্যবস্থাপরিষদের দুইটি শাখা থাকিবে : তখন তাহাদের নাম হইবে লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্‌সিল এবং লেজিস্‌লেটিভ্ এসেম্‌ব্লি। ইহার একটি রাষ্ট্রীয় পরিষদের ন্যায় ও অপরটি সম্মিলিত শাসনপরিষদের অধস্তন কক্ষের (Lower Chamber) ন্যায় হইবে। গভর্নর জেনারলের ন্যায় গভর্নরেরও কতকগুলি বিশেষ দায়িত্ব থাকিবে। কিন্তু গভর্নর জেনারলের শাসনতন্ত্রে যেরূপ রক্ষিত ও হস্তান্তরিত বিষয়ের বিভাগ থাকিবে, প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রের সেরূপ থাকিবে না। সমস্ত বিষয় ব্যবস্থা-পরিষদের সম্মতি অনুসারে নির্ব্বাহিত হইবে। কিন্তু গভর্নর নিতান্ত আবশ্যক মনে করিলে তাঁহার 'বিশেষ দায়িত্ব'-ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভা ও ব্যবস্থাপরিষদের পরামর্শ উপেক্ষা করিয়াও চলিতে পারিবেন।

গভর্ণর—যে নয়টি বড় বড় প্রদেশ আছে, তাহার প্রত্যেকটিতে একজন প্রধান শাসনকর্ত্তা বা গভর্নর আছেন। গভর্নরদিগের মধ্যে সকলের মর্য্যাদা বা বেতন একরূপ নহে।

ইঁহাদের নিয়োগের মধ্যে প্রভেদ আছে এবং বেতনও ভিন্ন ভিন্ন। বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের গভর্নরগণ স্বয়ং সম্রাট্ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয়েন। অন্য ৬টি প্রদেশের গভর্নরদিগকে (যথা—আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ ও ব্রহ্মদেশ) সম্রাট্ নিযুক্ত করেন বটে, কিন্তু গভর্নর জেনারলের পরামর্শ লইতে হয়। খ্যাতনামা ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞ, 'সিভিল সার্ভিসের' লোক এবং অভিজ্ঞ ভারতবাসী আইনব্যবসায়ী বা রাজনীতিবিৎ-দিগের মধ্য হইতেই গভর্নর নিযুক্ত হয়েন। একজন শ্রেষ্ঠ ভারতীয় রাজনীতিজ্ঞ লর্ড সিংহ বিহার ও উড়িষ্যার গভর্নর-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই এবং যুক্ত-প্রদেশের গভর্নর বার্ষিক এক লক্ষ আটাশ হাজার টাকা বেতন পান। গভর্নরদিগের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বেতন। পাঞ্জাব এবং বিহার ও উড়িষ্যার গভর্নর প্রত্যেকে বার্ষিক লক্ষ টাকা এবং মধ্যপ্রদেশ ও আসামের গভর্নর যথাক্রমে ৭২,০০০ ও ৬৬,০০০ টাকা বেতন পাইয়া থাকেন।

বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের গভর্নরেরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারত-সচিবের সহিত কোনও কোনও বিষয়ে পত্র-ব্যবহার করিতে পারেন; অন্য গভর্নরদিগের এ অধিকার নাই। সকল গভর্নরই পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হয়েন এবং 'His Excellency' বলিয়া অভিহিত হয়েন। তাঁহাদের ক্ষমতা প্রায় একই রকমের। তাঁহাদের নিয়োগের সময় সম্রাট্ তাঁহাদিগকে যে উপদেশপত্র প্রদান করেন, তাহার দ্বারাই তাঁহারা পরিচালিত হয়েন।

গভর্নরের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সভা—(Executive Council)—গভর্নরের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সভার সভ্যগণ

সম্রাটের স্বাক্ষরিত নিয়োগপত্রের দ্বারা সাধারণতঃ পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হয়েন। এই সভ্য-সংখ্যা ৪এর অনধিক। বাঙ্গালার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সভায় ৪ জন সভ্যই আছেন; তন্মধ্যে ২ জন ইয়ুরোপীয় এবং ২ জন দেশীয়। এ সম্বন্ধে নিয়ম এই যে ৪ জন সভ্যের মধ্যে অন্ততঃ ১ জন ১২ বৎসরের অন্যূন কাল ভারতে সরকারী কার্য্য করিয়াছেন, এমন হওয়া চাই। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সভার একজন সভ্য গভর্নর কর্ত্তৃক সহকারী সভাপতি নিযুক্ত হয়েন

মন্ত্রী—ব্যবস্থাপক-সভায় নির্ব্বাচিত সভ্যদিগের মধ্য হইতে গভর্নর মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের পদ গভর্নরের ইচ্ছাধীন। তাঁহাদের বেতন ব্যবস্থাপক-সভা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হয়। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সভার সভ্যেরা যে বেতন পান, তাহা অথবা তদপেক্ষা কম বেতন ব্যবস্থাপক-সভা স্থির করিয়া দিতে পারেন। আইনে মন্ত্রীদের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট নাই। কোনও কোনও প্রদেশে ৩ জন করিয়া মন্ত্রী আছেন, এবং কোনও কোনও প্রদেশে ২ জন করিয়া আছেন। তাঁহারা 'হস্তান্তরিত' বিষয় পরিচালন করেন; এই পরিচালনের জন্য যে ব্যয়ের প্রয়োজন তাহা ব্যবস্থাপক-সভা মঞ্জুর না করিলে তাঁহারা ব্যয় করিতে পারেন না। সুতরাং মন্ত্রীরা ব্যবস্থাপক-সভার নিকট দায়ী; কারণ ঐ সভার সভ্যগণ প্রশ্ন করিয়া, প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়া এবং হস্তান্তরিত বিষয়ের ব্যয় মঞ্জুর করিবার অধিকার-পরিচালনার দ্বারা মন্ত্রীদিগকে শাসনে রাখিতে পারেন। হস্তান্তরিত বিষয় সম্বন্ধে গভর্নর মন্ত্রীদিগের পরামর্শে পরিচালিত হয়েন।

চীফ্ কমিশনার—সপার্ষদ গভর্নর জেনারলের প্রতিনিধি-স্বরূপ চীফ্ কমিশনারেরা কতকগুলি প্রদেশ শাসন

করেন। বর্ত্তমানে দিল্লী প্রদেশ ও উত্তরপশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ চীফ্ কমিশনারের অধীন রহিয়াছে।

প্রাদেশিক সরকারী দপ্তরখানা—ভারত গভর্নমেণ্টে যেরূপ অনেকগুলি বিভাগ রহিয়াছে, প্রাদেশিক দপ্তরখানায়ও সেইরূপ বিভাগ আছে। প্রত্যেক বিভাগ এক একজন সেক্রেটারীর অধীন এবং প্রত্যেক বিভাগেই বহু অধস্তন কর্ম্মচারী আছেন। রাজস্ব এবং সাধারণ শাসন ব্যতীত অন্য সকল বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রদেশে প্রায় একই প্রকার ব্যবস্থা। বঙ্গদেশে পুলিস, জেল ও রেজেষ্টারী বিভাগের এক একজন ইন্স্পেক্টার জেনারল আছেন, শিক্ষা বিভাগে একজন ডিরেক্টার, অ-সামরিক হাসপাতালের একজন ইন্স্পেক্টার জেনারল, সাধারণ স্বাস্থ্যের একজন কমিশনার, এবং পশুচিকিৎসার একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ আছেন। খালকাটা, সামুদ্রিক বিষয়, গৃহ-নির্ম্মাণ এবং রাস্তাঘাটের এক একজন চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার আছেন, তাঁহারা সেক্রেটারীর কাজও করেন।

গভর্নরের ব্যবস্থাপক-সভা—প্রত্যেক গভর্নর-শাসিত প্রদেশেই ব্যবস্থাপক-সভা আছে। ঐ সভা তিন বৎসরের জন্য আহূত হয়। তিন বৎসর অতীত হইবার পূর্ব্বেও গভর্নর ইচ্ছা করিলে সভা ভঙ্গ করিয়া দিতে পারেন। গভর্নরের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সভার সভ্যগণ এবং মনোনীত ও নির্ব্বাচিত সদস্যগণ লইয়া ব্যবস্থাপক-সভা গঠিত হয়। গভর্নর ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য নহেন; কিন্তু তিনি ঐ সভায় বক্তৃতা দিতে পারেন এবং তদুদ্দেশ্যে সভ্যগণকে উপস্থিতির জন্য আহ্বান করিতে পারেন। ব্যবস্থাপক-সভার সভ্যসংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন

ভিন্ন প্রকার। বঙ্গদেশে ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য-সংখ্যা ১৩৯ জন, মান্দ্রাজে ১২৭, বোম্বাইয়ে ১১১, যুক্তপ্রদেশে ১২৩ আইনে উক্ত হইয়াছে যে, প্রত্যেক ব্যবস্থাপক-সভায় শতকরা ২০ জনের অনধিক সরকারী কর্ম্মচারী সদস্য মনোনীত হইতে পারিবেন এবং শতকরা অন্ততঃ ৭০ জন নির্ব্বাচিত সদস্য হইবেন সুতরাং প্রত্যেক ব্যবস্থাপক-সভায় নির্ব্বাচিত সভ্যের সংখ্যা বেশী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভায় শতকরা ৮০ জনেরও অধিক নির্ব্বাচিত বে-সরকারী সভ্য। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক-সভার প্রথম সভাপতি চারি বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন. চারি বৎসর অতীত হইলে, সভা তাহার নিজের সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া লইয়াছে একজন সহকারী সভাপতিও নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভা—বঙ্গের গভর্ণরের ব্যবস্থাপক-সভা নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ লইয়া গঠিত :—

(১) কার্য্য-নির্ব্বাহক-সভার সভ্যগণ—পদানুরোধে।

(২) ১১৩ জন নির্ব্বাচিত সদস্য।

(৩) এরূপ সংখ্যক সদস্য গভর্ণর কর্ত্তৃক মনোনীত হয়েন যে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সভার সভ্যগণকে লইয়া মোট সংখ্যা ২৩ হয়। এই সকল মনোনীত সভ্য এইরূপ ভাবে লওয়া হয় :—

(ক) ১৮ জনের অনধিক সরকারী কর্ম্মচারী এবং ৬ জনের অনধিক বে-সরকারী সভ্য;

(খ) নিম্নলিখিত শ্রেণীর প্রতিনিধি ২ জন

(অ) ভারতীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়

(আ) গভর্ণরের মতে যাহারা হীনজাতি; এবং

(গ) শ্রমিকদিগের প্রতিনিধি ২ জন।

বঙ্গের ব্যবস্থাপক-সভার নির্ব্বাচিত সদস্যগণ সাধারণ বা বিশেষ নির্ব্বাচক-মণ্ডলী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয়েন। 'সাধারণ নির্ব্বাচক-মণ্ডলী' বলিতে অ-মুসলমান, মুসলমান, ইয়ুরোপীয় অথবা ইয়ুরেশীয় নির্ব্বাচক-মণ্ডলী বুঝায়। বিশেষ নির্ব্বাচক-মণ্ডলী অর্থে জমিদার-গণ, বিশ্ববিদ্যালয়, বণিক্-সম্প্রদায় বা শ্রমিকদিগের নির্ব্বাচক-মণ্ডলী বুঝিতে হইবে। সাধারণ নির্ব্বাচক-মণ্ডলীতে যাঁহারা ভোট দিতে পারেন, তাঁহাদের যোগ্যতা নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর নির্ভর করে :—

(ক) সম্প্রদায় ;

(খ) বাসস্থান ;

(গ) (১) কোনও বাটী দখলে থাকা ; (২) মিউনিসিপালিটি বা সৈন্যাবাসের ট্যাক্স বা কর দেওয়া ; (৩) ১৮৮০ সালের সেস্ আইন অনুসারে সেস্ দেওয়া ; (৪) ১৮৭০ সালের 'গ্রাম্য চৌকীদারী' আইন অথবা ১৯১৯ সালের 'গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন' আইন অনুসারে চৌকীদারী ট্যাক্স বা ইউনিয়নের চাঁদা দেওয়া ; (৫) আয়-কর দেওয়া ; অথবা (৬) সামরিক কর্ম্মে নিযুক্ত থাকা ; বা (৭) জমিজমা থাকা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় বিশেষ নির্ব্বাচক-মণ্ডলীতে ভোট দিবার অধিকার সেই সেই নির্ব্বাচক-মণ্ডলী-সংক্রান্ত নিয়মের উপর নির্ভর করে। যে কোনও ব্যক্তি বাঙ্গালাদেশে বাস করেন এবং সেনেটের সভ্য অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারি 'ফেলো' অথবা সাত বৎসরের অন্যূন কাল গ্র্যাজুয়েট হইয়াছেন, তিনিই বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ব্বাচক-মণ্ডলীতে ভোট দিতে অধিকারী।

স্ত্রীলোকগণকে নির্ব্বাচনের অধিকার প্রদান করা উচিত কিনা, এ বিষয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। এই গুরুতর বিষয়ে এ পর্য্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত স্থির হয় নাই। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক-সভা ইচ্ছা করিলে স্ত্রীলোকদিগকে সেই প্রদেশের নির্ব্বাচক-তালিকাভুক্ত করিয়া লইতে পারেন। প্রায় সকল প্রদেশের ব্যবস্থাপক-সভায় এইরূপ মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে এবং সম্প্রতি মান্দ্রাজে একজন রমণী ব্যবস্থাপক-সভার সহকারী সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

ব্যবস্থাপক-সভার ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য— কতকগুলি স্থল ব্যতীত গভর্নরের ব্যবস্থাপক-সভা তত্তৎপ্রদেশের সুশাসন ও শান্তিরক্ষার নিমিত্ত আইন করিতে পারেন। গভর্নর জেনারলের পূর্ব্বপ্রাপ্ত সম্মতি ব্যতিরেকে কোনও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক-সভা ভারতের সাধারণ ঋণ, রাজকীয় সৈন্যের রক্ষা বা শাসনানুবর্ত্তিতা, বৈদেশিক রাজা বা রাজার সহিত গভর্নমেণ্টের সম্বন্ধ এবং ভারত-গভর্নমেণ্টের সংক্রান্ত কোনও বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রস্তাব করিতে পারেন না। গভর্নর কোনও বিল্ (Bill) পাস হওয়ার পক্ষে সম্মতি না দিতে পারেন, কিংবা ব্যবস্থাপক-সভায় পুনরালোচনার জন্য ফেরৎ পাঠাইতে পারেন, অথবা গভনর জেনারলের বিচারের জন্য রাখিয়া দিতেও পারেন। কোনও বিল্ গভর্নরের ব্যবস্থাপক-সভায় পাস হইলেও গভর্নর জেনারল কর্ত্তৃক অনুমোদিত না হওয়া পর্য্যন্ত আইনে পরিণত হইতে পারে না। গভর্নরের ব্যবস্থাপক-সভায় কোনও আইন পাস হইলে, গভর্নর জেনারল তাহা অনুমোদন না করিয়া অথবা রদ না করিয়া সম্রাটের আদেশের জন্য রাখিয়া দিতে

পারেন। অমাত্যসহ সম্রাট্ সে আইন মঞ্জুর না করিতেও পারেন।

গভর্নর কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁহার ব্যবস্থাপক-সভা ভঙ্গ করিয়া দিতে পারেন। ব্যবস্থাপক-সভা সম্মত না হইলেও তিনি 'রক্ষিত' বিষয় সম্বন্ধে আইন পাস করিয়া লইতে পারেন। গভর্নর এইরূপ প্রকাশ করিতে (certify) পারেন যে, সে বিল্ পাস না হইলে, তিনি সেই বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার দায়িত্ব পরিপূরণ করিতে অক্ষম। এইরূপ আইন গভর্নরের দ্বারা পাস হইতে পারে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু অমাত্য-পরিবেষ্টিত সম্রাট্ কর্ত্তৃক ইহা মঞ্জুর না হইলে আইন বলিয়া গণ্য হয় না। গভর্নর কোনও বিল সম্বন্ধে দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারেন (certify) যে, উহা সেই প্রদেশে শান্তিরক্ষার বা নিরাপদ্ অবস্থার ব্যাঘাত জন্মাইবে। এরূপ করিলে সে বিল সম্বন্ধে আর কোনও কার্য্য হইতে পারিবে না।

আয়-ব্যয় সম্বন্ধে গভর্নরদিগের ব্যবস্থাপক-সভার ক্ষমতা অনেক বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রতি বৎসর বার্ষিক আয়-ব্যয়ের আনুমানিক বিবরণ বা এষ্টিমেট্ ব্যবস্থাপক-সভার নিকট দাখিল করিতে হয়। প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের ব্যয় সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক-সভার নিকট অনুমোদন প্রার্থনা করিতে হয়। ব্যবস্থাপক-সভা ভোটের দ্বারা ব্যয় মঞ্জুর করিলে পর প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে খরচ হইবে। ব্যবস্থাপক-সভা কোনও ব্যয় মঞ্জুর করিতে পারেন অথবা না করিতে পারেন বা ব্যয়ের পরিমাণ কমাইয়া দিতে পারেন; কিন্তু বাড়াইতে পারেন না। কিন্তু প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট ভারত-গভর্নমেণ্টকে যে টাকা প্রদান করেন তাহার, ঋণের যে

সুদ দিতে হয় বা ঋণ-পরিশোধের জন্য যে টাকা রাখিয়া দিতে হয় তাহার এবং কতকগুলি কর্ম্মচারীর বেতন সম্বন্ধে কোনও প্রস্তাব ব্যবস্থাপক-সভায় উপস্থাপিত হওয়া আবশ্যক নহে। 'রক্ষিত' বিষয় সম্বন্ধে কোনও ব্যয় যদি ব্যবস্থাপক-সভা মঞ্জুর না করেন, তাহা হইলেও সপার্ষদ গভর্নর সেই টাকা ব্যয় করিতে পারেন। কিন্তু সেইরূপ স্থলে তাঁহাকে দৃঢ়তার সহিত বলিতে হইবে (certify) যে, তাঁহার পদের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইলে, এই ব্যয় করা একান্ত আবশ্যক।

এই সকল আইন প্রণয়ন ও আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত ক্ষমতা ব্যতীত সাধারণের ব্যাপার সম্বন্ধে সভ্যেরা প্রশ্ন করিয়া সংবাদ পাইতে পারেন। সেই বিষয় আরও বিশদ করিবার জন্য যে কোনও সভ্য অতিরিক্ত প্রশ্ন করিতে পারেন। ব্যবস্থাপক-সভার সভ্যেরা জনসাধারণের ব্যাপার লইয়া গভর্নরের নিকট 'অনুরোধ' হিসাবে প্রস্তাব উত্থাপিত করিতে পারেন। ব্যবস্থাপক-সভায় বক্তৃতা সম্বন্ধে সভ্যদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে; তবে তাঁহাদিগকে কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। এই সকল সভায় সভ্যগণ যদি কিছু বলেন, বা কোনও বিষয়ে ভোট দেন বা সরকারী বিবরণীতে সেই বিষয়ের যদি কোনও বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোনও মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় না।

চতুর্থ অধ্যায়

অধস্তন শাসনবিভাগ

ভারত গভর্নমেণ্টের দ্বারা ও প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের দ্বারা পরিচালিত শাসনবিভাগ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ঐ সকল গভর্নমেণ্টের সহিত যে সকল ব্যবস্থাপক-সভা সংশ্লিষ্ট আছে, তাহারও বিবরণ যথাস্থানে প্রদত্ত হইয়াছে। এক্ষণে এই শাসন-বিভাগের অধস্তন কর্ম্মচারীদিগের কথা বলা আবশ্যক। প্রথমে প্রাদেশিক উপবিভাগ সম্বন্ধে কিছু বলা হইতেছে।

বহুদিন হইতে ভারতবর্ষের প্রদেশসমূহ নিয়ন্ত্রিত (Regulation) ও অ-নিয়ন্ত্রিত (Non-regulation) এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া আসিতেছে। নিয়ন্ত্রিত প্রদেশগুলি সনন্দ আইনের বলে সপার্ষদ গভর্নর জেনারল কর্ত্তৃক যে সকল নিয়ম গঠিত হইত, তদ্দ্বারা শাসিত হইত। অ-নিয়ন্ত্রিত প্রদেশগুলি সপার্ষদ গভর্নর জেনারলের শাসন-মূলক আদেশের দ্বারা শাসিত হইত। নিয়ন্ত্রিত প্রদেশ ও অ-নিয়ন্ত্রিত প্রদেশের মধ্যে পার্থক্য ছিল এই যে, যে আইনের দ্বারা এতদুভয় শাসিত হইত, তাহা বিভিন্ন ছিল এবং যে শাসন-যন্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহারও আকার এবং গঠন-প্রণালী ভিন্ন ছিল। এই প্রভেদ এখন আর দেখা যায় না,—বিশেষতঃ শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইবার পরে এখন আর কোনও প্রভেদই নাই। কিন্তু কর্ম্মচারিগণের নামকরণে (ইহার দৃষ্টান্ত পরবর্ত্তী অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য) এবং শাসন-সংক্রান্ত পদের যোগ্যতা সম্বন্ধে এখনও কিছু কিছু পার্থক্যের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

জেলা—একটি প্রদেশকে কতকগুলি জেলার সমষ্টি বলিয়া ধরা যায়। জেলাগুলি আবার মহকুমায় এবং মহকুমাগুলি আরও ক্ষুদ্রতর কেন্দ্রে বিভক্ত। ইংরেজাধিকৃত ভারতে জেলাই অতি প্রয়োজনীয় বিভাগ। নিয়ন্ত্রিত প্রদেশে (Regulation provinces) এক একটি জেলার উপর এক একজন ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর, এবং অ-নিয়ন্ত্রিত প্রদেশে (Non-regulation provinces) এক একটি জেলার উপর এক একজন ডেপুটী কমিশনার আছেন। ইংরেজাধিকৃত ভারতে প্রায় ২৬৭টি জেলা আছে। গড়ে প্রত্যেক জেলার আয়তন ৪,০০০ বর্গমাইলের উপর এবং লোকসংখ্যা গড়ে ৯,০০,০০০র উপর। "প্রকৃত পক্ষে প্রত্যেক জেলার আয়তন ও লোকসংখ্যায় যথেষ্ট প্রভেদ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, পূর্ব্ববঙ্গের ময়মনসিং জেলায় কিঞ্চিদধিক ৪০½ লক্ষ লোকের বাস এবং ৬,৩৭৪ বর্গমাইল স্থান আছে।"*

পুলিস—জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ জেলার পুলিসের কর্ত্তা। শাসন-যন্ত্রের মধ্যে পুলিস একটি প্রধান বিভাগ। প্রত্যেক জেলার পুলিস ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে পরিচালিত হয়, কিন্তু ইহার সাধারণ গঠনপ্রণালী ১৮৬১ সালের আইনের উপর নির্ভর করে। যে ভাবে পুলিসের কার্য্য সম্পাদিত হইবে, তাহা ফৌজদারী কার্য্য-বিধি আইনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভারত গভর্ণমেণ্ট যে কমিশন নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারা পুলিস বিভাগের সংস্কার আবশ্যক বলিয়া বিবরণ দাখিল করিয়াছিল; সেই বিবরণ অনুসারে গভর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে আদেশ প্রচার করিয়াছেন।

* পঞ্চসংখ্যক দশম বার্ষিক বিবরণ, ৬২ পৃষ্ঠা।

প্রত্যেক প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের অধীনে যে পুলিস থাকে, তাহা প্রায় সমস্ত প্রদেশে একটি মাত্র ফৌজ বলিয়া গণ্য হয়। প্রাদেশিক পুলিস সাধারণতঃ এক জন ইন্‌স্পেক্টর জেনারলের অধীন। প্রতি জেলার পুলিস একজন ডিষ্ট্রিক্ট্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অধীন। তিনি পুলিসের শৃঙ্খলা ও আভ্যন্তরীণ বন্দোবস্তের জন্য দায়ী। অপরাধীর সন্ধান ও দমন এবং শান্তি-রক্ষার বিষয়ে তিনি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীন। প্রত্যেক জেলার পুলিস কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়; প্রত্যেকটি এক একজন ইন্‌স্পেক্টরের অধীন। অনেক প্রদেশে কতকগুলি অতিরিক্ত থানা আছে; সেগুলিকে ফাঁড়ি বলে। প্রত্যেক জেলার সদরে একজন ইন্‌স্পেক্টরের অধীনে কতকগুলি 'রিজার্ভ' পুলিস থাকে। জেলার কোনও স্থানে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা ঘটিলে বা কোনও বিপদ্ উপস্থিত হইলে শেষোক্ত পুলিস সাধারণ পুলিসকে সাহায্য করে।

বঙ্গদেশ, আসাম ও ব্রহ্মদেশের অশান্তিময় সীমান্তে এবং উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশে সামরিক পুলিস ফৌজ রাখা হয়।

প্রত্যেক থানা বা পুলিস ষ্টেশনের অধীনে কতকগুলি করিয়া গ্রাম থাকে। প্রত্যেক গ্রামে এক জন চৌকীদার বা পাহারাওয়ালা আছে। চৌকীদারের প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে অপরাধীর সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া। কিন্তু তাহার আরও অনেক কাজ আছে। প্রত্যেক সহরে থানা ও ফাঁড়ি আছে এবং রাত্রিকালে পাহারার বন্দোবস্ত আছে।

রেলওয়ে পুলিসের ব্যবস্থা জেলা পুলিস হইতে স্বতন্ত্র, কিন্তু উভয়ে একযোগে কার্য্য করে। সাধারণতঃ রেলওয়ে পুলিস

শৃঙ্খলা ও শান্তি-রক্ষায় ব্যাপৃত থাকে। রেলওয়ের সম্পত্তির পাহারা দেওয়া ইহাদের কর্ম্ম নহে। সে সম্পত্তি-রক্ষার ব্যবস্থা রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষগণই করিয়া থাকেন।

বহুদিন পর্য্যন্ত একটি 'ঠগী এবং ডাকাতি বিভাগ' ছিল। ১৯০৪ সালে উহা উঠিয়া যায় এবং তাহার স্থানে ভারত গভর্ণমেণ্টের আভ্যন্তরীণ (Home) বিভাগের অধীনে "কেন্দ্রীয় অপরাধ-সংক্রান্ত সংবাদ" বিভাগ নামে একটি বিভাগ হইয়াছে। রেলপথের নিকটবর্ত্তী স্থানে যে সকল অপরাধী দলবদ্ধ হইয়া চুরি-ডাকাতি করে, তাহাদের সম্বন্ধে, ও অপরাধাসক্ত জাতি বা যে সকল দল কেবল এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায় (অর্থাৎ গৃহ-নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে না), বা যাহারা দলবদ্ধ হইয়া ডাকাতি করে এবং এই প্রকার যে সকল অপরাধীর কার্য্যকলাপ এক প্রদেশে সীমাবদ্ধ নহে, তাহাদিগের সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করা ও যথাস্থানে তাহা প্রেরণ করা উল্লিখিত বিভাগের কার্য্য।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন—স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বর্ত্তমানে শাসন-বিভাগের একটি প্রধান অঙ্গ। ইহা বেশী দিন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যে সকল প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া ইহা কার্য্য করে, তাহাদিগকে মুখ্যতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—মিউনিসিপালিটী এবং অন্যান্য বোর্ড। প্রাদেশিক আইনের দ্বারা ইহাদের প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট হয়; কাজেই ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই ইহা একই প্রকার নহে।

প্রথমতঃ মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে করদাতাদিগের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার প্রথা ১৮৭২, ১৮৭৬ ও ১৮৭৮ সালের আইনের দ্বারা যথাক্রমে বোম্বাই, কলিকাতা ও মান্দ্রাজে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৮১-৮২ সালে লর্ড রিপনের আদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রসার বৃদ্ধি হয়। সহরের ও গ্রামের অধিবাসিগণ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে স্থানীয় ব্যাপারের পরিচালনে ক্ষমতা লাভ করে। ক্রমে প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন-প্রণালী আরও বিস্তৃত হইল এবং অনেক সহরে সরকারী কর্ম্মচারীর স্থানে বে-সরকারী সভাপতি নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা দেওয়ায়, মিউনিসিপালিটীগুলি অধিকতর স্বাধীনতা ও দায়িত্ব লাভ করিল।

সহরের স্বায়ত্তশাসন-ভার মিউনিসিপাল কমিশনারগণের উপর অর্পিত হইয়াছে। মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও কলিকাতায় ইহাদিগকে মিউনিসিপাল কাউন্সিলার বলে। অধিকাংশ মিউনিসিপালিটী-তেই কতকগুলি কমিশনার নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। অবশিষ্ট কমিশনার প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের আদেশানুসারে নিযুক্ত হয়েন। মিউনিসিপালিটীর সভাপতি কখনও কখনও প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হয়েন; বেশীর ভাগে তাঁহারা কমিশনারগণের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। জেলার কালেক্টার বা বিভাগীয় কমিশনার মিউনিসিপালিটীর প্রতি দৃষ্টি রাখেন। মিউনিসিপালিটীর কমিশনারগণ যখন কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করেন, তখন গভর্নমেণ্ট সেই কার্য্য সম্পাদন করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন এবং অযোগ্যতা, ত্রুটী ও ক্ষমতার অপব্যবহার দেখিলে, কমিশনারগণকে কিছুকালের জন্য কর্ম্মচ্যুত করিতে পারেন। মিউনিসিপালিটীর আয়-ব্যয় ও কর্ম্মচারি-নিয়োগের প্রতি গভর্নমেণ্ট দৃষ্টি রাখেন।

মিউনিসিপালিটীর কার্য্য এই কয়েক শাখায় বিভক্ত, যথা—সাধারণের নির্ব্বিঘ্নতা-বিধান, স্বাস্থ্য, যানবাহন এবং শিক্ষা-বিস্তার।

এই সকল শাখার অন্তর্গত কার্য্য বহু ও নানাপ্রকারের; মিউনিসিপালিটী যাহাতে এই সকল কার্য্য করিতে পারেন, তজ্জন্য নানা আইন ও তদন্তর্গত নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ হইয়া মিউনিসিপালিটীর ক্ষমতা অনেক বর্দ্ধিত করিয়াছে। নিম্নলিখিত রূপে মিউনিসিপালিটীর আয় হয়, যথা—চুঙ্গি বা সহরে আনীত দ্রব্যের উপর শুল্ক; গৃহ ও ভূমির উপর ধার্য্য ট্যাক্স; জীবজন্তু, যানবাহন, জীবিকা ও ব্যবসায়ের উপর নির্দ্ধারিত ট্যাক্স; রাস্তা এবং খেয়াঘাটের কর; জল, আলো এবং আবর্জ্জনা-পরিষ্কারের জন্য কর।

কলিকাতা কর্পোরেশনের পুনর্গঠন জন্য ১৯২৩ সালে এক আইন পাস হয়। এই আইনের ফলে কর্পোরেশন অনেকটা গণতান্ত্রিক হয় এবং স্ত্রীলোকের ভোট দিবার অধিকার হয়। সহরের করদাতৃগণ এক্ষণে কাউন্সিলারদিগের মধ্যে দশ ভাগের নয় ভাগ নির্ব্বাচন করেন। মেয়র, ডেপুটী মেয়র, অল্ডারমেন এবং প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ (Chief Executive Officer) কর্পোরেশনের সভ্যগণ দ্বারা নির্ব্বাচিত হয়েন। এ বিষয়ে স্বায়ত্ত-শাসন-বিভাগের তদানীন্তন মন্ত্রী সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্রণী হইয়াছিলেন। সমগ্র বঙ্গদেশের মিউনিসিপালিটীর সংস্কার জন্য একটি বিল প্রস্তুত হইয়াছে; এবং উহা ব্যবস্থাপক-সভায় পাস হইয়াছে।

বোর্ড ও ইউনিয়ন—১৮৮১-৮২ সালে লর্ড রিপনের আদেশে স্থানীয় সমস্ত ব্যাপার-নির্ব্বাহের জন্য সর্ব্বত্র বোর্ডের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে যে আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল, তাহারই অনুসরণে মান্দ্রাজে তিন শ্রেণীর বোর্ড প্রতিষ্ঠা

করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। এই প্রদেশের অনেক স্থলে বড় বড় গ্রামগুলি বা কতকগুলি গ্রামের সমষ্টি লইয়া পল্লীসমিতি বা ইউনিয়ন (Union) গঠিত হইয়াছে। এই সকল পল্লীসমিতি যাহারা পরিচালনা করেন, তাঁহাদিগকে 'পঞ্চায়েৎ' বলে। পঞ্চায়েৎ নাম বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার পরেই 'তালুক বোর্ড'-গুলির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। শাসন-সৌকর্য্যার্থ জেলাগুলিকে যে ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিভক্ত করা হয়, তালুক বোর্ড তাহারই মধ্যে স্থানীয় ব্যাপারসমূহ নির্ব্বাহ করে। পরিশেষে, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড আছে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড জেলার সমস্ত স্থানীয় ব্যাপার নির্ব্বাহ করে। বাঙ্গালা ও অন্যান্য প্রদেশের প্রত্যেক জেলায় এক একটি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড থাকিবে, আইনে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। কিন্তু অধস্তন লোকাল বোর্ড স্থাপন করা প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের ইচ্ছাধীন। বঙ্গের অনেকগুলি জেলায় ইহা স্থাপিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশের যে সকল স্থানে মিউনিসিপালিটী নাই, সেই সকল স্থলে প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট ১৯১৯ সালের 'বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন আইন' অনুসারে অনেকগুলি ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন করিয়াছেন। এই সকল ইউনিয়ন বোর্ডে নির্ব্বাচিত সভ্যের সংখ্যাই বেশী; সভাপতি ও সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা দফাদার ও চৌকীদারদিগকে বহাল ও বরখাস্ত করিতে পারেন, এবং তাহাদের কার্য্য পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রিত করেন। জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া, জলাভূমির জল নিকাশের ব্যবস্থা করিয়া, এবং পুষ্করিণী, কূপ প্রভৃতি খনন করিয়া লোকের স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ সাধন করা, তাঁহাদের কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা

কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে পারেন। তাঁহারা কবর দিবার ও শবদাহ করিবার জন্য উপযুক্ত ভূমির ব্যবস্থা করিতে পারেন; স্থানীয় রাস্তা সমূহ ভাল করা, প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করা এবং চিকিৎসালয় পরিচালন করাও তাঁহাদের কর্ত্তব্য। এই সকল উদ্দেশ্যে তাঁহারা একটি "ইউনিয়ন ধনভাণ্ডার" খুলিয়া তাঁহাদের অধিকার মধ্যে যাহাদের ঘর-বাড়ী আছে, তাহাদের নিকট হইতে কর আদায় করিতে পারেন। এই সকল 'ইউনিয়ন বোর্ড'কে এরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে তাঁহারা 'ইউনিয়ন আদালতে' ছোট ছোট দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন। সুতরাং এই ইউনিয়নগুলি প্রকৃতই স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান; ইহা প্রাচীন কালের পল্লী-সমিতির অভিনব রূপ।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে নির্ব্বাচন-প্রথা বিভিন্ন রূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের জেলাসমূহের সকল স্থানেই লোকাল বোর্ড গঠিত হইয়াছে। এই সকল লোকাল বোড ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অন্যূন অর্দ্ধেক সভ্য নির্ব্বাচন করিতে পারেন। যে সকল জেলার অবস্থা উন্নত হইয়াছে, সেখানে লোকাল বোর্ডের দুই-তৃতীয়াংশ সভ্য নির্ব্বাচিত হয়েন। অন্য জেলায় সকল সভ্যগণই মনোনীত হইয়া থাকেন। কোন্ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভাপতি নির্ব্বাচিত অথবা মনোনীত হইবেন, তাহা প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট স্থির করেন। বঙ্গদেশে নির্ব্বাচন-প্রথা অনুমোদিত হইয়াছে এবং সাধারণতঃ বে-সরকারী লোক ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইতেছেন।

বোর্ডগুলির প্রধান কর্ত্তব্য স্থানীয় রাস্তাঘাট রক্ষা করা এবং তাহাদের উন্নতি-সাধন করা। হাঁসপাতাল ও ডাক্তারখানা

রক্ষা করা, জল নিকাশ ও জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা; সাধারণ স্বাস্থ্য-রক্ষা, শিক্ষার বন্দোবস্ত (বিশেষতঃ প্রাথমিক স্তরে); হাট-বাজার নির্ম্মাণ ও রক্ষা করা; দুর্ভিক্ষের সময়ে লোকের সাহায্য করা—এগুলিও বোর্ডের কর্ত্তব্য।

বোর্ডগুলির আয় প্রধানতঃ প্রাদেশিক কর হইতে পাওয়া যায়। আয়ের অন্যান্য প্রধান উপায়—প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে প্রদত্ত অর্থ, খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের আয় এবং শিক্ষা-সম্বন্ধীয় ও চিকিৎসা-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

পঞ্চম অধ্যায়

বিচার-বিভাগ

হাইকোর্ট—ভারতবর্ষে হাইকোর্টই সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়। ১৮৬১ সালে পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক 'হাইকোর্ট আইন' পাস হয়। ঐ আইনের বলে সম্রাট্ বাঙ্গালা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজে হাইকোর্ট স্থাপন করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েন। বিচারকগণ সম্রাট্ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে কার্য্যে বহাল থাকিবেন। ইংলণ্ড বা আয়র্লণ্ডের ব্যারিষ্টার অথবা স্কটলণ্ডের এড্‌ভোকেট-সমিতির সভ্য,—যাঁহারা অন্ততঃ পাঁচ বৎসর ব্যারিষ্টারী করিয়াছেন,—তাঁহারা হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হইতে পারেন। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের লোক, যিনি ১০ বৎসর কর্ম্ম করিতেছেন এবং অন্ততঃ তিন বৎসর জেলার জজের কাজ করিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তিও হাইকোর্টের জজ হইতে পারেন। পাঁচ বৎসর কাল যাঁহারা সবজজ অথবা ছোট আদালতের জজের কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারাও ঐ পদ পাইতে পারেন। হাইকোর্টে দশ বৎসর ওকালতী করিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তিও হাইকোর্টের জজ হইতে পারেন। হাইকোর্টে একজন প্রধান বিচারপতি ও অনধিক পনের জন বিচারপতি সম্রাটের ইচ্ছানুসারে নিযুক্ত হইতে পারেন। প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি লইয়া যে কয়েক জন হইবেন, তাহার অন্যূন একতৃতীয়াংশ ব্যারিষ্টার বা এড্‌ভোকেট হওয়া চাই এবং অন্যূন একতৃতীয়াংশ

সিভিল সার্ভিসের লোক হওয়া চাই। প্রত্যেক হাইকোর্ট অধস্তন আদালতসমূহের পরিদর্শন ও পরিচালন জন্য নিয়ম করিতে পারেন। এই সকল নিয়মাবলী সপার্ষদ গভর্নর জেনারলের অনুমোদনসাপেক্ষ।

উক্ত আইন অনুসারে ১৮৬২ সালে চার্টার বা সনন্দ প্রদত্ত হয়। ১৮৬৫ সালে উহা পুনর্ব্বার প্রদত্ত হয় এবং তদনুসারে বঙ্গ, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৬ সালে ঐরূপ এক সনন্দ অনুসারে এলাহাবাদ হাইকোর্টের সৃষ্টি হয়। ১৯১১ সালে 'ভারতীয় হাইকোর্ট আইন' অনুসারে জজের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া ১৬ হইতে ২০ হইল; ইহাও স্থির হইল যে, দুই বৎসরের অনধিক কালের জন্য 'অতিরিক্ত জজ' নিযুক্ত করিতে পারা যাইবে। এই আইনে প্রয়োজনানুসারে সময়ে সময়ে নূতন হাইকোর্ট স্থাপন করিবার ক্ষমতাও দেওয়া হইল। তদনুসারে ১৯১৬ সালে বিহার ও উড়িষ্যায় একটি হাইকোর্ট হইল, ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবের চীফ্‌কোর্ট হাইকোর্টে পরিণত হইল, এবং ব্রহ্ম দেশে 'রেঙ্গুন হাইকোর্ট' স্থাপিত হইয়াছে। বঙ্গ ও আসামে কলিকাতা হাইকোর্টের অধিকার রহিয়াছে। ইহার দেওয়ানী অধিকার নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত হইতে পারে :—

(১) কলিকাতার মধ্যে ছোট আদালতে বিচার্য্য ক্ষুদ্র মোকদ্দমা ব্যতীত যাবতীয় দেওয়ানী মোকদ্দমার প্রাথমিক বিচারের সাধারণ অধিকার।

(২) অবস্থা বিশেষে অধস্তন আদালতের সমস্ত মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার ও বিচার করিবার অসাধারণ প্রাথমিক বিচারাধিকার।

(৩) ডিষ্ট্রিক্ট জজ ও কোনও কোনও ক্ষেত্রে সবজজদিগের মোকদ্দমার আপীলের বিচার।

(৪) নাবালক, জড়বুদ্ধি ও বাতুল এবং তাহাদের সম্পত্তি সম্বন্ধে বিচারাধিকার।

(৫) দেউলিয়াগণকে অব্যাহতি দিবার অধিকার।

(৬) সামুদ্রিক ব্যাপার, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-যাজক সম্পর্কীয় ব্যাপার, এবং উইলের বলে বা বিনা উইলে সম্পত্তি-প্রাপ্তি-সম্বন্ধীয় মোকদ্দমার বিচারাধিকার।

(৭) গভর্নমেন্টের অধীন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী প্রজাদিগের মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধীয় বিচারাধিকার।

কলিকাতা হাইকোর্টের ফৌজদারী অধিকার নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত হইতে পারে :—

(১) প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটগণ যে সকল মোকদ্দমা দায়রায় সোপর্দ্দ করেন, তাহার বিচারাধিকার। এ সকল মোকদ্দমা জুরীগণের সাহায্যে বিচার করা হয়।

(২) প্রেসিডেন্সী সহরের বাহিরে যে সকল মামলা কোনও বিশেষ কারণে হাইকোর্টে গৃহীত হয়, সেই সকল মোকদ্দমার বিচারের অসাধারণ অধিকার।

(৩) আপীল ও পুনর্ব্বিচারের অধিকার। কোনও বিষয় নিম্ন আদালত হইতে মীমাংসার জন্য প্রেরিত হইলে, তৎসম্বন্ধেও হাইকোর্টের বিচার করিবার অধিকার আছে।

বোম্বাই ও মান্দ্রাজ হাইকোর্টের ক্ষমতা কলিকাতা হাইকোর্টের ন্যায়; এলাহাবাদ হাইকোর্টের কোনও সাধারণ প্রাথমিক বিচারের অধিকার নাই। কেবল সম্রাটের ইয়ুরোপীয় প্রজার

বিরুদ্ধে যে সকল মামলা উপস্থিত হয়, সেই সকল স্থলে উক্ত অধিকার আছে।

ভারতবর্ষে অধুনা একটি চীফ্‌কোর্ট আছে—অযোধ্যা প্রদেশের জন্য সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ সহরে একটি চীফ্‌কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হাইকোর্টের আদর্শেই ইহা গঠিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক-সভা ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সপার্ষদ গভর্নর জেনারল কর্তৃক নিযুক্ত একজন প্রধান বিচারপতি ও কতিপয় জজ লইয়া ইহা গঠিত। অন্যান্য প্রদেশে হাইকোর্ট বা চীফ্‌কোর্টের স্থলে একজন বা একাধিক বিচারক (Judicial) কমিশনার আছেন। ইহারা ভারত গভর্নমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত হয়েন। ইঁহারা অধস্তন আদালত সম্বন্ধে হাইকোর্টেরই মত আপীল-গ্রহণের এবং পুনর্ব্বিচারের ক্ষমতা রাখেন। ভারতবর্ষের অনেকগুলি আইনের দ্বারা তাঁহাদিগের উপর এই সকল ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে। মধ্য প্রদেশ, উত্তরপশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ, কুর্গ, সিন্ধু এবং ছোটনাগপুরে জুডিসিয়াল কমিশনার আছেন।

দেওয়ানী আদালত—প্রত্যেক প্রদেশের অধস্তন দেওয়ানী আদালতের গঠন ও অধিকার বিশেষ বিশেষ আইন ও নিয়মের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট। বঙ্গদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা, আসাম এবং আগ্রা ও অযোধ্যার যুক্ত প্রদেশে এই কয়েক শ্রেণীর আদালত আছে, যথা:—(১) ডিষ্ট্রিক্ট জজের আদালত, (২) অতিরিক্ত জজের আদালত, (৩) সবজজের আদালত ও (৪) মুন্সেফের আদালত। ডিষ্ট্রিক্ট জজ, অতিরিক্ত জজ ও সবজজগণ দেওয়ানী আদালতের গ্রহণযোগ্য সমস্ত নূতন মোকদ্দমা

গ্রহণ করিতে পারেন। সাধারণতঃ হাজার টাকা পর্য্যন্ত দাবীর মোকদ্দমা মুন্সেফেরা বিচার করিতে পারেন। তবে কোনও কোনও স্থলে দুই হাজার টাকা পর্য্যন্ত দাবীর মোকদ্দমা বিচার করিবার অধিকারও তাঁহাদিগের আছে। প্রেসিডেন্সী সহরে ও মফস্বলে ছোট ছোট মোকদ্দমা বিচারের জন্য 'ছোট আদালত' (Small Causes Court) আছে।

সাধারণতঃ প্রত্যেক জেলায় একজন করিয়া দায়রা-জজ (District and Sessions Judge) নিযুক্ত হয়েন। নূতন ও আপীলের মোকদ্দমার বিচার ব্যতীত জজেরা অধস্তন দেওয়ানী আদালতের কার্য্য বিভাগ করিয়া দেন ও তাহাদিগের উপর শাসন-কর্তৃত্ব করেন। এই সকল পদে ভারতীয় বা প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের লোক নিযুক্ত হয়েন।

ফৌজদারী আদালত—হাইকোর্টের অধীন আদালতগুলিতে ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক প্রদেশে কতকগুলি বিভাগ আছে; প্রত্যেক বিভাগে কয়েকটি জেলা আছে। প্রত্যেক জেলায় একজন দায়রা-জজের অধীনে একটি দায়রা আদালত আছে। প্রত্যেক জেলায় একজন করিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন। আবশ্যকমত নিম্ন শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট, যথা—জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বা সবডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইতে পারেন। তাঁহারা সকলেই ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীন। কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়া এক শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন। দণ্ড-প্রয়োগ-ক্ষমতার তারতম্য অনুসারে ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের মধ্যে তিন শ্রেণী আছে;

তদনুসারে ইঁহাদিগকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষমতান্বিত ম্যাজিষ্ট্রেট বলা হয়।

ফৌজদারী আইন বা অন্য আইনসম্মত যে কোনও দণ্ড হাইকোর্ট দিতে পারেন। দায়রার জজও আইনসম্মত সকল দণ্ডই দিতে পারেন; কেবল মৃত্যুদণ্ডের সম্বন্ধে হাইকোর্টের অনুমোদন আবশ্যক। দায়রা আদালতে প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের নির্দ্দেশ অনুসারে 'এসেসর' বা 'জুরী'র সাহায্যে মোকদ্দমার বিচার হইয়া থাকে। জজ এসেসরগণের মত গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন। দায়রার জজ যদি মনে করেন যে, জুরীগণ অসঙ্গত মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি ঐ মোকদ্দমা হাইকোর্টে পাঠাইতে পারেন। হাইকোর্ট জুরীর মত অগ্রাহ্য বা পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। হাইকোর্টের দায়রা-বিচার-কালে নয় জন জুরী থাকেন। অন্যান্য স্থানে স্থানীয় গভর্নমেণ্টের নির্দ্দেশানুসারে ৯এর অনধিক অসমান সংখ্যক জুরী থাকেন। হাইকোর্টের জুরীগণ একমত হইলে, জজ অসম্মত হইলেও জুরীগণের মত গ্রাহ্য করিতে বাধ্য।

সপার্ষদ গভর্নর জেনারলের এবং যে প্রদেশে ঘটনা ঘটে, সেই প্রদেশের গভর্নমেণ্টের দয়া-প্রকাশের বিশেষ অধিকার আছে; ইহার সহিত সম্রাটের দয়া-প্রকাশাধিকারের কোনও বিরোধ নাই।

প্রিভি কাউন্সিল—সম্রাটের একটি বিশেষ অধিকার আছে, যদ্দ্বারা তিনি সমুদ্র-পারের প্রজাদিগের আপীলের বিচার করিতে পারেন। এই অধিকার পার্লিয়ামেণ্টের আইনসমূহের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট ও নিয়মিত হয়। বর্ত্তমানে সম্রাটের এই ক্ষমতা, ১৮৩৩ সালের আইন অনুসারে, প্রিভি কাউন্সিলের বিচার-সমিতি

(Judicial Committee) কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। এই সমিতির নিকট সম্রাট্ সর্ব্ব বিষয়ে পরামর্শ চাহিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষের আপীলসমূহের বিচার, হাইকোর্ট-সম্বন্ধীয় চার্টার ও দেওয়ানী কার্য্যবিধির বিধানও কাউন্সিলের নিয়মাবলী অনুসারে নির্ব্বাহিত হয়। ফৌজদারী মোকদ্দমায় হাইকোর্টের প্রাথমিক বিচারাধিকারের 'রায়', আদেশ বা দণ্ডের বিরুদ্ধে বিলাতে আপীল করিতে হইলে, হাইকোর্টের মত গ্রহণ করিতে হইবে যে, সেই মোকদ্দমা আপীলের যোগ্য কিনা। যে সকল ফৌজদারী মোকদ্দমার আইনঘটিত বিষয়ে হাইকোর্টের মতামত আবশ্যক হয়, সে সকল মোকদ্দমায় আপীলেও হাইকোর্টের পূর্ব্বোক্তরূপ অভিমতের প্রয়োজন। কিন্তু বিচার-সমিতি বা জুডিসিয়াল কমিটি যদি উপযুক্ত মনে করেন, তবে ভারতবর্ষের নিয়মাবলীর অপেক্ষা না করিয়াও তাঁহারা আপীল করিবার বিশেষ অনুমতি দিতে পারেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাজস্ব এবং আয়ব্যয়

(১) আয়

ভূমি-কর—ভারতে রাজস্ব কিয়ৎ পরিমাণে ট্যাক্স হইতে ও কিয়ৎ পরিমাণে ট্যাক্স ব্যতীত অন্য উপায়ে সংগৃহীত হয়। সর্ব্বপ্রকার উপায়ের মধ্যে ভূমি-করই প্রধান। বহু প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখকের মতে ভূমি-কর প্রকৃত পক্ষে ট্যাক্স হইতে উৎপন্ন বলা যায় না। সার জন ষ্ট্রাচী বলেন যে, স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই রাজা জমির উৎপন্নের একভাগ গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। এই অংশকেই তথাকথিত ভূমি-কর বলে। জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্ বলেন যে, ভারতীয় রাজস্বের সর্ব্বাপেক্ষা বেশীর ভাগ কর-স্থাপন ব্যতিরেকেই সংগৃহীত হয়। কারণ যে অর্থ সাধারণের ব্যবহারের নিমিত্ত রাজকোষে প্রদত্ত না হইলেও কোনও ব্যক্তিবিশেষকে দিতে হইত, সেই অর্থ মাঝখান হইতে লইয়াই এই ভূমি-কর পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রজাগণ জমিদারকে খাজনা স্বরূপ যাহা দিত, গভর্নমেণ্ট কেবল সেই অর্থই রাজস্ব স্বরূপ গ্রহণ করেন।

আর একজন লেখক বলেন, 'আধুনিক ভারতের ভূমি-রাজস্ব' স্মরণাতীত কাল হইতে দেশে যে প্রথা বর্ত্তমান ছিল, তাহা হইতে উৎপন্ন এক প্রকারের জাতীয় আয়। বিভিন্ন প্রদেশ যেমন ইংরেজদের শাসনে আসিতে লাগিল, তেমনি মোগল আমলে যে সকল কর ধার্য্য ছিল, তাহাও ক্রমশঃ সুশৃঙ্খলাযুক্ত হইতে লাগিল।

ভারতে ভূমি-করের বন্দোবস্ত মোটামুটী দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয় :—(১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং (২) অস্থায়ী বন্দোবস্ত। শেষোক্ত বন্দোবস্ত আবার দুই প্রকার :—(১) জমিদারী (কোনও কোন প্রদেশে মালগুজারী ও তালুকদারী নামেও কথিত হয়) ও (২) রায়তওয়ারি।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত—বঙ্গদেশে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ভূমি-করের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃষ্টি হয়। গভর্নমেণ্ট দেখিলেন যে, জমিদার নামক এক শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী লোক আছেন, যাঁহারা ভূমি-কর এবং ট্যাক্স আদায় করেন। গভর্নমেণ্ট ইঁহাদিগকেই ভূমির অধিকারী বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ বা খাজনা রূপে যাহা রাজার প্রাপ্য, তাহাই ভূমি-কর নির্দ্দিষ্ট হইয়া চিরকালের জন্য অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল। জমিদারদিগের ভূমি-কর চিরদিনের মত নির্দ্দিষ্ট হইবে কেবল এই উদ্দেশ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হয় নাই; প্রজার জমাস্বত্ব ও খাজনা চিরকালের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইবে, ইহাও উদ্দেশ্য ছিল। বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থলে, যুক্তপ্রদেশ ও মান্দ্রাজের স্থলবিশেষে এবং অন্যান্য কয়েকটি বিক্ষিপ্ত স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত আছে। 'জমিদারী বন্দোবস্তে' জমিদার অথবা ভূম্যধিকারিগণ সরকারের খাজনা দাখিল করেন; তাঁহারা নিজেরাই জমির চাষ-আবাদ করুন বা তাঁহাদের প্রজারাই খাজনা দিয়া জমি চাষ করুক, সদর খাজনা জমিদারকেই দিতে হয়। করস্থাপনের জন্য এক একটি ক্ষেত্রকে একক বলিয়া ধরা হয় না; সমস্ত গ্রামখানিকে একক ধরা হয়। সাধারণতঃ গভর্নমেণ্টের সহিত কৃষকদিগের কোনও আদান-প্রদানের সম্বন্ধ নাই। এইরূপ

বন্দোবস্ত প্রধানতঃ যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যায় প্রচলিত। পাঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশে সাধারণতঃ ২০ বৎসরের জন্য এবং অন্যান্য প্রদেশে ৩০ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত হইয়া থাকে।

রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত—৩০ বৎসরের জন্য যে খাজনা নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা প্রদান করিলেই রায়তওয়ারি বন্দোবস্তে ভূমিতে রায়ত বা প্রজার অধিকার জন্মে। আবাদী বৎসর শেষ হইলেই, প্রজা ইচ্ছা করিলে সমস্ত জমায় অথবা কোনও একটি ক্ষেত্রে ইস্তফা দিতে পারে। প্রজা স্বয়ং ক্ষেত্রের কোনও উন্নতি করিলে, সেই উন্নতির জন্য পুনরায় বন্দোবস্তের সময় তাহার করবৃদ্ধি হইতে পারে না। গভর্নমেণ্টের সম্মতি না লইয়া প্রজা তাহার জমি বিক্রয় করিতে, বন্ধক বা ভাড়া দিতে পারে। প্রজার মৃত্যু হইলে, তাহার সন্তানেরা উত্তরাধিকারের নিয়মানুসারে সে ভূমি ভোগদখল করিতে পায়। এরূপ প্রজা কৃষক-ভূম্যধিকারী এবং ইহার সঙ্গেই গভর্নমেণ্টের সম্বন্ধ। এরূপ বন্দোবস্ত বোম্বাই, ব্রহ্ম, আসাম, বেরার প্রদেশে এবং মান্দ্রাজের অধিকাংশ স্থানে প্রচলিত আছে।

যে সব অঞ্চলে জমিদারী বন্দোবস্ত প্রচলিত, সেখানে ভূম্যধিকারীরা যে খাজনা সংগ্রহ করেন, প্রত্যেক বন্দোবস্তের সময় ভূমি-কর তাহার অর্দ্ধেকের কম নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের অঞ্চলে ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের $\frac{1}{12}$ হইতে $\frac{1}{2}$ অংশ পর্য্যন্ত ভূমি-কর নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

অহিফেন-কর—ভূমি-করের পরেই অহিফেন-কর উল্লেখযোগ্য। অহিফেন-রাজস্ব যে দুই উপায়ে সংগৃহীত হয়, তাহা এই :—গভর্নমেণ্টের অহিফেন-উৎপাদনের একচেটিয়া

অধিকার এবং দেশীয় রাজ্য হইতে যে অহিফেন সমুদ্রপথে রপ্তানী হয় এবং ব্রিটিশ ভারতে যে অহিফেন আমদানী হয়, তাহার কর। আফিঙের গাছ (Poppy) ব্রিটিশ ভারতের সর্ব্বত্রই জন্মে; কিন্তু বঙ্গদেশ এবং যুক্তপ্রদেশের কয়েক স্থল এবং আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র স্থান ব্যতীত অন্যস্থানে গভর্নমেণ্ট ইহার চাষ করিতে অনুমতি দেন না। ঐ দুই প্রদেশে অহিফেনের চাষ গভর্নমেণ্টের অহিফেন-বিভাগ কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। প্রতি বৎসর কি পরিমাণ জমিতে ইহার চাষ হইবে, তাহা ঐ বিভাগ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হয়। যে সকল জেলায় আফিঙের চাষের এইরূপ একচেটিয়া অধিকার রহিয়াছে, সেখানে কৃষকদিগকে আফিঙের চাষ করিতে হইলে লাইসেন্স্ বা অনুমতিপত্র লইতে হয়। লাইসেন্স্ ফিস্ এবং পূর্ব্বোক্ত শুল্ক হইতেই প্রধানতঃ অহিফেন-কর প্রাপ্ত হওয়া যায়। চীন দেশের গভর্নমেণ্ট অহিফেনের আমদানী ও ব্যবহার বন্ধ করিয়া দেওয়ায়, অহিফেন-রাজস্বের ক্রমশঃই হ্রাস হইতেছে।

বন-কর—ইহার পরই বন-বিভাগের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বন-বিভাগের রাজস্ব বাহাদুরি কাঠ ও বনজাত অন্যান্য দ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষের শাসন ইংলণ্ডের রাণী স্বহস্তে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ভারতের মূল্যবান্ ও বিস্তৃত বনানী রক্ষা করিবার কোনও ব্যবস্থাই ছিল না বলিলেও চলে। ভারতের সুবিস্তৃত অরণ্য দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বর্গ মাইল ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ইহা বন-বিভাগের কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত।

দেশীয় রাজ্যের কর—দেশীয় রাজ্য কর্ত্তৃক প্রদত্ত কর হইতেও রাজস্ব-লাভ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে সৈন্য-রক্ষা বা সৈন্য দিয়া সাহায্য করিবার জন্য যে বাধ্যবাধকতা ছিল, এক্ষণে

তাহার পরিবর্ত্তে কর লওয়া হয়। ভারত গভর্ণমেণ্ট সমস্ত দেশের শান্তিরক্ষার যে ব্যবস্থা করেন, তাহার সামান্য প্রতিদান-স্বরূপ দেশীয় রাজারা এই কর দেন।

কর-স্থাপন (Taxation) ব্যতীত রাজস্বের অন্যান্য সাধারণ দফাগুলি এই :—ডাকঘর, টেলিগ্রাফ, রেলওয়ে ও খাল।

কর-স্থাপন দ্বারা প্রধানতঃ নিম্নলিখিত রূপে রাজস্ব পাওয়া যায় :—

(১) লবণ :—লবণ-কর ভারতে প্রস্তুত বা আমদানী লবণের উপর শুল্ক হইতে আদায় হয়। এই শুল্কের পরিমাণ তিন আনা (ব্রহ্মদেশে) হইতে তিন টাকা বার আনা (বঙ্গে) পর্য্যন্ত হইয়াছিল। এক্ষণে এই শুল্ক সর্ব্বত্র মণ প্রতি এক টাকা চারি আনা। শুল্ক ক্রমাগত কমিয়া যাওয়ায় ভারতের সর্ব্বত্র লবণের ব্যবহার বাড়িয়া গিয়াছে। কেবল সাগর-পার হইতেই যে লবণের আমদানী হয়, তাহা নহে; ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লবণ প্রস্তুত হয়। রাজপুতানা ও পাঞ্জাবের লবণের খনি হইতে লবণ পাওয়া যায়। যে সকল বন্দরে লবণ আমদানী হয় ও যে সকল স্থানে লবণ প্রস্তুত হয়, সেই সকল স্থানে শুল্ক আদায় হয়।

কয়েকটি লবণের খনি তত্তৎপ্রদেশের গভর্ণমেণ্টের দ্বারা পরিচালিত হয়। অবশিষ্ট লবণের কারখানাগুলি বে-সরকারী লোকের অধীন। সুতরাং ভারতের লবণের ব্যবসায় গভর্ণমেণ্টের একচেটিয়া নহে। বিদেশ হইতে লবণের আমদানী করিতে কাহাকেও নিষেধ করা হয় না। যে সকল স্থানে শুল্ক আদায় করা অসম্ভব, সেখানে লবণ প্রস্তুত করিতে দেওয়া হয় না—যেমন বঙ্গদেশের সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী স্থান।

এই লবণের শুল্কই একমাত্র কর, যাহা ভারতের জনসাধারণকে বাধ্য হইয়া প্রদান করিতে হয়।

(২) আবগারী (Excise) :—ভারতবর্ষে যে মদ, গাঁজা, কোকেন এবং আফিঙ ব্যবহৃত হয়, তাহা হইতে আবগারী কর সংগৃহীত হয়। ঐ সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিলে যে শুল্ক দিতে হয় এবং বিক্রয় করিতে যে লাইসেন্স্ ফিস্ দিতে হয়, তাহা হইতেই এই কর উৎপন্ন হয়। এই রাজস্ব ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। লোকে বলে যে, এই বিভাগ-পরিচালনে যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং গোপনে মদ চোলাই ও বিক্রয় বন্ধ করিবার যে চেষ্টা হইয়াছে, তাহার জন্যই আবগারী কর বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু অনেকে ইহা স্বীকার করেন না।

(৩) শুল্ক (Customs) :—শুল্ক-বিভাগের রাজস্ব প্রধানতঃ নিম্নলিখিত উপায়ে সংগৃহীত হয়, যথা—(ক) আমদানী দ্রব্যের মূল্যের উপর শতকরা ১১৲ টাকা সাধারণ শুল্ক; (খ) সুরা, মোটর গাড়ী ও পেট্রোলিয়মের উপর বিশেষ শুল্ক; (গ) চাউল, আটা ও পাটের উপর রপ্তানী শুল্ক। ভারতেই প্রস্তুত হউক অথবা বিদেশ হইতে আমদানী হউক, সমস্ত কার্পাসজাত সূতা শুল্ক হইতে মুক্ত; বিদেশ হইতে যে সকল বয়ন করা কার্পাস-বস্ত্র আমদানী হয়, তাহার মূল্যের উপর শতকরা ১১৲ টাকা শুল্ক দিতে হয়। হস্ত-চালিত তাঁতের কাপড়ের শুল্ক লাগে না।

(৪) ষ্ট্যাম্প :—ষ্ট্যাম্প-কর কতক আদায় হয় খত, তমসুক, হুণ্ডী, রসীদ ইত্যাদি ব্যবসায়-সংক্রান্ত দলিল হইতে; আর

কতক আদায় হয় নালিশের আরজী, দরখাস্ত প্রভৃতি যে সকল দলিল আদালতে দাখিল হয়, তাহার ষ্ট্যাম্প হইতে।

(৫) প্রাদেশিক কর:—স্থানীয় উন্নতির উদ্দেশ্যে এই কর ভূমির উপর ধার্য্য হয়, যথা—রাস্তাঘাট মেরামত, স্কুল, হাঁসপাতাল স্থাপন, খাল কাটান ইত্যাদি গ্রামের হিতকর কার্য্যের ব্যয়ের জন্য।

(৬) আয়কর (Income tax):—এই করকে 'সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষ ট্যাক্স' বলা হয়, অর্থাৎ এই কর সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অর্থের দ্বারা প্রদান করিতে হয়। লবণ, সুরা বা কার্পাসজাত দ্রব্য প্রভৃতি জিনিষের উপর যে ট্যাক্স, তাহাকে 'পরোক্ষ ট্যাক্স' বলে। যে দ্রব্যের উপর কর ধার্য্য হয়, সেই দ্রব্য যে ব্যক্তি ক্রয় করে, সেই ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে এই ট্যাক্স দেয়; কেননা ট্যাক্সের জন্য বেশী মূল্য দিয়া তাহাকে দ্রব্য কিনিতে হয়। ঐ মূল্যের মধ্যেই ট্যাক্স অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বতন্ত্র ভাবে টাকা দিয়া ঐ ট্যাক্স আর দিতে হয় না। জন-কর (জন প্রতি যে ট্যাক্স নির্দ্ধারিত হয়) সাক্ষাৎ ট্যাক্স, কারণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে টাকা দিয়া এই ট্যাক্স দিতে হয়। লাইসেন্স্ পাইবার জন্য যে ট্যাক্স দিতে হয়, তাহাও ঐ প্রকারের। আয়-করও একটি সাক্ষাৎ ট্যাক্স; কারণ যে ব্যক্তির ট্যাক্স-যোগ্য আয় আছে, তাহাকে টাকা দিয়া ঐ ট্যাক্স দিতে হয়, অথবা যে ব্যক্তির নিকট হইতে ঐ আয় প্রাপ্য, সে তাহা হইতে ট্যাক্সের টাকা কাটিয়া রাখিয়া দিতে পারে। যে লবণের উপর ট্যাক্স ধার্য্য হইয়াছে, সে লবণ ক্রয় করিবার সময় ক্রেতা বুঝিতে পারে না যে, সে ট্যাক্স দিতেছে; কাজেই সে স্থলে লবণের ঐ ট্যাক্স পরোক্ষ ভাবের কর বলিয়া কথিত হয়।

বেতন, পেন্‌সন্ কিংবা কোম্পানীর কাগজের স্থদ হইতে বাৎসরিক আয় ২,০০০৲ টাকার অধিক হইলে এবং ৫,০০০৲ টাকার কম হইলে প্রতি টাকায় ৫ পাই হিসাবে আয় কর দিতে হয়। অন্যান্য উপায়ে যে আয় হয়, তাহার পরিমাণের অনুপাতে কর দিতে হয়। ২,০০০৲ টাকার কম আয় হইলে আয়-কর দিতে হয় না। ৫,০০০৲ টাকার বেশী আয় হইলে তাহার আয়-কর নিম্নলিখিত হিসাবে দিতে হয়—(১) ৫,০০০৲ টাকা হইতে ৯,৯৯৯৲ টাকা পর্য্যন্ত প্রতি টাকায় ৬ পাই; (২) ১০,০০০৲ টাকা হইতে ১৯,৯৯৯৲ টাকা পর্য্যন্ত ৯ পাই; (৩) ২০,০০০৲ টাকা হইতে ২৯,৯৯৯৲ টাকা পর্য্যন্ত টাকায় ১ আনা; (৪) ৩০,০০০৲ টাকা হইতে ৩৯,৯৯৯৲ টাকা পর্য্যন্ত ১ আনা ৩ পাই; (৫) ৪০,০০০৲ টাকা ও তদূর্দ্ধে টাকায় ১ আনা ৬ পাই। যৌথ কারবারের লাভের উপরেও টাকায় ১ আনা হিসাবে কর দিতে হয়। কৃষি-কার্য্যের আয় বা লাভের উপর কোনও ট্যাক্স ধরা হয় না। সামরিক বিভাগে বার্ষিক ৬,০০০৲ টাকার কম বেতনের কর্ম্মচারীকে কোনও ট্যাক্স দিতে হয় না।

(৭) দলিল রেজেষ্ট্রী করিবার ফিস্:—ইহাতে যৎসামান্যই রাজস্ব আদায় হয়।

(২) ব্যয়

রাজ্য-সংক্রান্ত প্রধান ব্যয়ের দফাগুলি এই :—

(১) অ-সামরিক বিভাগ—নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ইহার অন্তভু‌ক্ত :—(ক) সাধারণ শাসন, (খ) বিচারালয়, (গ) পুলিস, (ঘ) নৌ-বিভাগ, (ঙ) শিক্ষা, (চ) চিকিৎসা, (ছ) রাজনীতিক বিভাগ, (জ) খৃষ্টধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বিভাগ ও (ঝ) অন্য ছোটখাটো বিভাগ,

যথা—ভারতীয় জরীপ, উদ্ভিজ্জ ও ভূতাত্ত্বিক তথ্যানুসন্ধান, আবহবিদ্যা-সম্বন্ধীয় ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক বিভাগ, পরীক্ষামূলক কৃষি, কুলি চালান এবং বিভিন্ন প্রকারের অন্যান্য ব্যয়।

সাধারণ শাসন-বিভাগের ব্যয় বলিতে, বিভাগীয় কমিশনার পর্য্যন্ত সমস্ত শাসন-ব্যাপারের খরচ বুঝায়। বড় লাট, প্রাদেশিক লাট, চীফ কমিশনার, শাসন-পরিষৎ প্রভৃতি সংক্রান্ত সমস্ত খরচ ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(২) বিবিধ অ-সামরিক ব্যয়। সমস্ত রাজনীতিক ও প্রাদেশিক পেন্‌সন্, কাগজ, কলম, কালি ইত্যাদি বাবদ ব্যয় ইহার অন্তর্গত।

(৩) ডাকঘর, টেলিগ্রাফ ও টাকশাল।

(৪) খাল কাটান।

(৫) পূর্ত্ত-বিভাগ; রাস্তা ও অট্টালিকা এই বিভাগের অন্তর্গত।

(৬) গভর্নমেণ্টের ঋণের সুদ। গভর্নমেণ্টের ঋণ দুই প্রকার:—সাধারণ ঋণ ও সরকারী পূর্ত্ত কার্য্যের জন্য ঋণ অর্থাৎ রাস্তা ঘাট বাড়ী প্রস্তুত করিবার জন্য বা ঐ জাতীয় কার্য্য চালাইবার জন্য যে খরচ করা হয়।

(৭) সামরিক ব্যয়। সৈন্য-রক্ষা ও সামরিক কার্য্য-পরিচালনের জন্য যে খরচ করা হয়।

(৮) অসাধারণ ব্যয়। যথা:—(ক) যুদ্ধবিগ্রহ, (খ) দেশ-রক্ষার্থ বিশেষ বন্দোবস্ত, (গ) দুর্ভিক্ষে সাহায্য, (ঘ) রাজস্ব হইতে রেলওয়ে নির্ম্মাণ, (ঙ) দুর্ভিক্ষ-নিবারণের জন্য স্থাপিত অর্থ-ভাণ্ডার হইতে রেল ও খাল নির্ম্মাণ।

যাহাকে Home charges বা বিলাতের খরচ বলে, অর্থাৎ ভারত-শাসনের নিমিত্ত যে অর্থ ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়, তাহা উপরি-

লিখিত দফাগুলির মধ্যে ধরা হইয়াছে। ইহার অধিকাংশই দিতে হয় ইংলণ্ড যে মূলধন ও উপাদান প্রভৃতি যোগাইয়াছেন তাহার জন্য। সুতরাং সেগুলিকে শাসনের ব্যয়ের মধ্যে না ধরিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য-সংক্রান্ত ব্যয়ের মধ্যে ধরাই উচিত।* বিলাতের খরচের মধ্যে কতকাংশ বিলাতবাসী কর্ম্মচারীদের বিদায়ের বেতন ও পেন্‌সনে যায়; অন্যান্য প্রধান বিষয়গুলি এই:—রেলওয়ে-রাজস্ব বাবদ; সুদ ও ঋণের ব্যবস্থা; দ্রব্যাদির ভাণ্ডার; সৈন্য-সংক্রান্ত কতকগুলি খরচ (Effective charges); অ-সামরিক শাসন-বিভাগ ও সামুদ্রিক বিভাগ।

ভারতীয় আয়ব্যয়-সম্বন্ধে শেষ দায়িত্ব পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক সপার্ষদ ভারতসচিবের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। ভারতসচিব আবার ভারতীয় গভর্নমেণ্টের উপর অনেক ক্ষমতা ন্যস্ত করিয়াছেন, যাহার বলে ভারত-গভর্নমেণ্ট নূতন খরচ অনুমোদন এবং নূতন কোনও ছোট পদ সৃষ্টি করিতে পারেন। হঠাৎ প্রয়োজন হইলে ভারত-গভর্নমেণ্ট যে কোনও খরচ করিতে পারেন; তাহার কোনও সীমা নির্দ্দিষ্ট নাই।

ভারতবর্ষ ইংলণ্ড-রাজের শাসনাধীনে আসিবার পরে, ১৮৬০ সালে, গভর্নর জেনারলের মন্ত্রি-সভার প্রথম রাজস্ব-সচিব মিঃ জেম্‌স উইল্‌সন সমস্ত ভারতের আয়ব্যয় যাহাতে সুব্যবস্থিত হয় ও তাহার রীতিমত হিসাব-নিকাশ হয়, সেইরূপ প্রণালী প্রবর্ত্তিত

* ১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দে ১ কোটী ৯০ লক্ষ পাউণ্ডের মধ্যে ১ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড কেবল ইংলণ্ডের প্রদত্ত মূলধনের সুদ ও উপাদানাদির মূল্য বাবদ দেওয়া হইয়াছিল।

করেন। তাহার ফলে ব্রিটিশ ভারতের সমস্ত প্রদেশের রাজস্ব এক ধন-ভাণ্ডার বলিয়া বিবেচিত হইত এবং সপার্ষদ গভর্নর জেনারল অনুমোদন না করিলে ঐ ভাণ্ডার হইতে কোনও খরচ হইতে পারিত না। নূতন ব্যয় মঞ্জুর করিবার কোনও অধিকার প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টকে দেওয়া হইত না।

এরূপ প্রথা একান্ত অনুপযোগী দেখিয়া, ১৮৭১ সালে লর্ড মেয়ো ইহার অসম্পূর্ণতা দূর করিবার জন্য নিয়ম করিলেন যে, প্রাদেশিক শাসন-বিভাগসমূহের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টকে একটা নির্দ্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ করিয়া দেওয়া হইবে; অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজন হইলে প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টকে মিতব্যয়িতা অবলম্বন করিতে হইবে এবং আবশ্যক হইলে স্থানীয় কর ধার্য্য করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। এরূপ প্রথাকে আয়ব্যয়-সম্বন্ধীয় 'বি-কেন্দ্রীকরণ' বলে। ভূমি, ষ্ট্যাম্প, আবগারী, নির্দ্ধারিত কর এবং কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপায়ে সংগৃহীত রাজস্ব ভারত-গভর্নমেণ্ট ও প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের মধ্যে বিভিন্ন অনুপাতে ভাগ করিয়া দেওয়া হইত। অন্য বড় বড় রাজস্বের আকরগুলি হইতে সংগৃহীত অর্থ ভারত-গভর্নমেণ্ট একাই নিজ প্রয়োজনে গ্রহণ করিতেন। নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য (প্রায়ই পাঁচ বৎসরের জন্য) এরূপ একটি বন্দোবস্ত করা হয়, যাহাতে বিশেষ বিশেষ ব্যয়ের জন্য প্রত্যেক প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টকে কতকগুলি রাজস্ব ধরিয়া দেওয়া হয়। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ব্যাপারে অর্থ ব্যয় হয়, যথা :—অ-সামরিক শাসনকার্য্য, ভূমিকর আদায়, আদালত, জেল, পুলিস, শিক্ষা, চিকিৎসা-বিভাগ, রাস্তা ও অট্টালিকা (অ-সামরিক) এবং অন্য কতকগুলি ব্যাপার। এই

রূপে প্রদত্ত রাজস্ব ব্যয় করিবার অধিকার প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের ছিল ; মিতব্যয়ের দ্বারা অর্থ উদ্বৃত্ত হইলে তাহা তাঁহারাই ভোগ করিতে পারিতেন। এই বন্দোবস্তকালে যদি কোনও রাজস্বের পরিমাণ বাড়িত, তাহা হইলে তাহা সমস্ত অথবা আংশিকরূপে প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট পাইতেন। 'মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড' সংস্কারের ফলে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তদনুসারে উল্লিখিত ব্যবস্থা রহিত হইয়াছে। এই সংস্কার-সম্বন্ধীয় বিবরণীর লেখকগণ বলিয়াছেন যে, "ভারত-গভর্নমেণ্ট ও বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের আয়ব্যয় সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ করা আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা একটি প্রস্তাবও সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রধান প্রস্তাব এই যে, কোনও রাজস্বই আর ভাগ করিয়া লইলে চলিবে না। ভূমিকর, খাল, আবগারী এবং আদালতের ষ্ট্যাম্প প্রভৃতি আয় সম্পূর্ণভাবে প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের হস্তে দিতে হইবে। আয়-কর ও সাধারণ ষ্ট্যাম্প হইতে যে রাজস্ব আদায় হইবে, তাহা ভারত-গভর্নমেণ্টের থাকিবে। এই ব্যবস্থায় ভারত-গভর্নমেণ্টের তহবিলে যে অর্থাভাব ঘটিবে, প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টসমূহ সেই ক্ষতিপূরণ করিবেন। এই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ স্থির করিবার জন্য বিবরণীর লেখকগণ নূতন বন্দোবস্তে প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের যে আনুমানিক রাজস্ব হইতে পারে, তাহা ধরিলেন ; এই রাজস্ব হইতে যে অর্থ উদ্বৃত্ত হওয়া সম্ভব, সেই অনুপাতে ভারত-গভর্নমেণ্টকে অর্থ সাহায্য করিতে হইবে। যাহাতে কোনও প্রদেশের উপর এই অর্থ-সাহায্যের ভার অন্যায় ভাবে পতিত না হয়, তজ্জন্য ১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসে একটি সমিতি নিযুক্ত হয়। লর্ড মেসটন ইহার সভাপতি ছিলেন। এই

সমিতি প্রস্তাব করিলেন যে, সাধারণ ষ্ট্যাম্প হইতে যে আয় হয়, তাহা প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট পাইবেন এবং ১৯২১-২২ সালের জন্য নিম্নলিখিত ভাবে প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট ভারত-গভর্নমেণ্টকে নয় কোটী তিরাশী লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন। কি অনুপাতে এই অর্থ প্রদান করা হইবে, তাহাও ঐ কমিটি স্থির করিয়া দিলেন। বঙ্গদেশ শতকরা ১৯, যুক্তপ্রদেশ ১৮, মান্দ্রাজ ১৭, বোম্বাই ১৩, বিহার ও উড়িষ্যা ১০, পাঞ্জাব ৯, ব্রহ্মদেশ ৬½, মধ্যপ্রদেশ ৫, এবং আসাম শতকরা ২½ দিবেন। কমিটি প্রস্তাব করিলেন যে, সাত বৎসর তুল্য ভাবে বাড়াইয়া প্রাদেশিক অর্থ-সাহায্য ঐ অনুপাতে করিতে হইবে।"*

ভারতবর্ষ ইংলণ্ডকে কোনওরূপ কর প্রদান করে না; কিংবা স্বীয় শাসন-ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য ইংলণ্ড হইতে কোনও আর্থিক সাহায্য প্রাপ্ত হয় না। ভারত-সাম্রাজ্য চালাইবার সমস্ত ব্যয় ভারতবর্ষকেই বহন করিতে হয়। ভারত-রক্ষার্থ যে ইংরেজ সৈন্য রাখা হয়, তাহার ব্যয়ও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

* '১৯২০ সালে ভারতবর্ষ', ৭৬-৭৭ পৃষ্ঠা।

সপ্তম অধ্যায়

দেশীয় রাজ্য

ভারতবর্ষ বলিতে কেবল ইংরেজ-শাসিত ভারতের অন্তর্গত প্রদেশসমূহ অর্থাৎ ইংলণ্ডেশ্বর-নিয়োজিত গভর্নর জেনারল বা তাঁহার অধীন কর্ম্মচারীর দ্বারা শাসিত দেশ বুঝায় না, পরন্তু সম্রাটের প্রাধান্য যাহারা মানেন এরূপ দেশীয় রাজন্যগণের রাজ্যও বুঝায়। এই রাজ্যগুলিকে দেশীয় রাজ্য বা Native States বলে; ইহার সংখ্যা বর্ত্তমানে প্রায় ৭০০। ইহাদের আয়তন ও লোকসংখ্যা পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইতে বুঝা যায় যে, এই সকল দেশীয় রাজ্য বহু দূর বিস্তৃত; ভারতের এক তৃতীয়াংশেরও অধিক জুড়িয়া দেশীয় রাজ্য রহিয়াছে। ইহাদের লোকসংখ্যা ভারতের মোট লোকসংখ্যার প্রায় একচতুর্থাংশ।

প্রত্যেক দেশীয় রাজ্যের সম্বন্ধে ইংরেজ গভর্নমেণ্টের প্রাধান্য-সূচক নিম্নলিখিত অধিকার আছে :—

(১) অন্য রাজার সহিত যে সকল সম্বন্ধ, তাহা ইংরেজ গভর্নমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীন।

(২) ইংরেজ গভর্নমেণ্ট রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শান্তি-রক্ষার সম্বন্ধে সাধারণ অথচ সীমাবদ্ধ দায়িত্ব গ্রহণ করেন; এবং

(৩) ইংরেজ রাজ্যের যে সকল প্রজা দেশীয় রাজ্যে বাস করে, তাহাদের নির্ব্বিঘ্নতা-সম্বন্ধে বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

(৪) বৈদেশিক আক্রমণ-নিবারণ ও আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাস্থাপন বিষয়ে ইংরেজ গভর্নমেণ্ট সাহায্য চাহিলে, দেশীয় রাজগণ আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সে সাহায্য করিবেন।

দেশীয় রাজ্যের কোনও আন্তর্জ্জাতিক অস্তিত্ব নাই। অন্য রাজ্যের সহিত কোনও দেশীয় রাজ্য যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারে না। পার্শ্ববর্ত্তী কোনও রাজ্যের সহিত সন্ধি বা অন্য বন্দোবস্ত করিবার ক্ষমতা ইহাদের নাই। এসিয়া, ইয়ুরোপ বা অন্যস্থানের কোনও বৈদেশিক শক্তির সহিত কোনওরূপ রাজনীতিক সম্বন্ধ স্থাপন বা ঐ সম্বন্ধ রক্ষা করিবার অধিকারও নাই।

দেশীয় রাজ্যে শান্তি-রক্ষা করিবার অধিকার ইংরেজ গভর্নমেণ্টের আছে এবং ইহা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। প্রজা বিদ্রোহী হইয়া যাহাতে কোনও দেশীয় রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিতে না পারে, সে সম্বন্ধে ইংরেজরাজ তাঁহাদিগকে একরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন। রাজারাও যাহাতে অসহ্যরূপ কু-শাসন করিতে না পারেন, প্রজাদিগকে এরূপ প্রতিশ্রুতিও সুতরাং দেওয়া হইয়াছে।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া ১৮৭৭ সালে যখন 'ভারত-সম্রাজ্ঞী' উপাধি গ্রহণ করিলেন, সেই সময়ে দেশীয় রাজ্যসমূহের উপর ইংরেজ-রাজের প্রাধান্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হইয়াছিল।

লর্ড ডেল্‌হৌসী 'বাজেয়াপ্ত নীতি'র অনুবর্ত্তন করেন অর্থাৎ এই নিয়ম করেন যে, দেশীয় কোনও রাজার মৃত্যু হইলে যদি উত্তরাধিকারী না থাকে, তবে তাঁহার রাজ্য বাজেয়াপ্ত করা হইবে এবং ইংরেজ গভর্নমেণ্ট সেই রাজ্য দখল করিবেন; কোনও পোষ্যপুত্র রাজা হইতে পারিবে না, এইরূপ আদেশ তিনি প্রচার করেন। ১৮৫৭

সালের বিদ্রোহের পর এই নীতি পরিত্যক্ত হইয়াছিল। সেই ভয়াবহ সঙ্কটের দিনে দেশীয় রাজারা সকলেই বিশ্বস্ত ছিলেন। লর্ড ক্যানিং বলিয়াছিলেন যে, "মাঝে মাঝে দেশীয় রাজ্যগুলি থাকায় ঝটিকার বেগ রোধ করিয়াছিল। তাহা না হইলে ঐ ঝটিকা এক বিশাল তরঙ্গে আমাদের উপর দিয়া বহিয়া যাইত।" লর্ড ক্যানিংএর ভারত পরিত্যাগের পূর্ব্বে প্রত্যেক প্রধান হিন্দু রাজাকে ইংলণ্ডেশ্বরীর নামে এক সনন্দ দেওয়া হইয়াছিল। তাহাতে লিখিত ছিল যে উত্তরাধিকারী না থাকিলে, যদি হিন্দু শাস্ত্র বা বংশের প্রথা-অনুসারে কোনও রাজা দত্তক-পুত্র গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ইংরেজ গভর্নমেণ্ট তাহা মানিয়া লইবেন। মুসলমান রাজন্যগণকেও ঐরূপ আশ্বাস দেওয়া হয় যে, মুসলমান আইন-অনুসারে যে সকল উত্তরাধিকারী বৈধ বলিয়া স্বীকৃত, ইংরেজ গভর্নমেণ্ট তাঁহাদিগকে উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিবেন। এই নীতি এ পর্য্যন্ত ভঙ্গ করা হয় নাই। যেখানে কোনও দত্তক-পুত্র লওয়া হয় নাই, সেখানে ইংরেজ গভর্নমেণ্ট উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া দেন এবং রাজা নাবালক থাকিলে, সে রাজ্যের শাসনের সু-বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ১৯২১ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী রাজকীয় ঘোষণা দ্বারা দেশীয় রাজন্যগণের এক সভা (Chamber of Princes) স্থাপিত হইয়াছে। এই রাজন্যসভা 'সভ্য' ও 'প্রতিনিধি সভ্য' লইয়া গঠিত। রাজন্যসভার সভ্য হইতেছেন—

(১) ১৯২০ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে যে সকল দেশীয় রাজ্যে রাজা বংশানুগত সম্মানার্থ ১১ বা তাহার অধিক সংখ্যক তোপ প্রাপ্ত হইতেন;

(২) যে সকল রাজা নিজ নিজ রাজ্য শাসন বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকায় বড় লাটের মতে রাজন্য-সভার সভ্য হইবার উপযুক্ত।

রাজন্য-সভার 'প্রতিনিধি-সভ্য'—যে সকল রাজ্যের রাজা উপরিলিখিত দুই শ্রেণীর অন্তর্গত নহেন; কিন্তু 'নিয়ম' প্রণয়ন করিয়া যাঁহাদিগকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইবে।

রাজন্য-সভা একটি মন্ত্রণা-সভা বা পরামর্শ-সভা মাত্র; ইহার কার্য্যকরী কোনও ক্ষমতা নাই। পূর্ব্বোক্ত রাজকীয় ঘোষণাপত্র হইতে এই নূতন সভার প্রতিষ্ঠা ও কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। উহার একটি অংশ উদ্ধৃত হইল :—"আমার পূর্ব্বের ঘোষণা-পত্রে আমি আমার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের ও আমার নিজের প্রদত্ত আশ্বাস-বাণীর পুনরুল্লেখ করিয়াছি যে, ভারতবর্ষের রাজগণের সম্মান ও অধিকার সর্ব্বদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে আমি কৃতসঙ্কল্প। রাজন্যগণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন যে, আমি কখনও এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না; এ প্রতিজ্ঞা চিরদিন পালিত হইবে। আমি আমার প্রতিনিধিকে এক্ষণে নূতন রাজন্য-সভার গঠন ও কার্য্য-প্রণালী প্রকাশিত করিতে অনুজ্ঞা করিতেছি। সাধারণতঃ দেশীয় রাজ্য ও আমার অধীন ভারতবর্ষ এই উভয় স্থলের ব্যাপার-সম্বন্ধে অথবা দেশীয় রাজ্যের সহিত আমার সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের সম্পর্ক-বিষয়ে আমার প্রতিনিধি এই সভার পরামর্শ অবাধে গ্রহণ করিবেন। কোনও রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা-সম্বন্ধে বা কোনও রাজ্যের রাজাদিগের সম্বন্ধে অথবা আমার গভর্ণমেণ্টের সহিত কোনও রাজ্যের সম্বন্ধ-বিষয়ে এই সভার কোনও সম্পর্ক থাকিবে না। সমস্ত দেশীয় রাজ্যের অধিকার ও কার্য্য করিবার

স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। আমার একান্ত ইচ্ছা যে, এই সভার কার্য্যে দেশীয় রাজন্যগণ যোগদান করেন; কিন্তু সভায় যোগ-দান করা না-করা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন; ইহাতে কোনও বাধ্যতা নাই। কোনও সভ্য কোনও সভার আলোচ্য বিষয়ে তাঁহার মত প্রকাশ করিতে বা ভোট দিতে বাধ্য থাকিবেন না। আমার আরও ইচ্ছা এই যে, যদি কোনও রাজা সভায় উপস্থিত হইয়া আলোচনায় যোগ-দান করিতে না পারেন, তাহা হইলে আমার প্রতিনিধি ইচ্ছা করিলে, তাঁহাকে তাঁহার মত ব্যক্ত করিবার সুযোগ দিতে পারিবেন।"

১৯২১ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মহামান্য ডিউক্ অব্ কনট্ কর্ত্তৃক এই রাজন্য-সভার রীতিমত উদ্বোধন হয়।

সম্প্রতি শাসন-পদ্ধতিতে যে সকল গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, দেশীয় রাজন্যবৃন্দের সভা তাহার মধ্যে সম্ভবতঃ একটি অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার। ইহা হইতে অনেক সুফলের আশা করা যায়। ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে যে সকল সাধারণ ব্যাপার আছে, তাহারই আলোচনার জন্য স্থাপিত হইলেও ঐ সকল রাজ্যের সীমানার বাহিরে যে সমস্ত স্বাধীন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতেছে, তাহার সম্বন্ধে সমালোচনা না উঠিয়া পারিবে না। রাজ্যগুলির মধ্যে যখন এই সকল প্রতিষ্ঠান ক্রমে প্রবর্ত্তিত হইবে, তখন রাজারা নিশ্চয়ই তাহার গতি লক্ষ্য করিবেন, পরস্পর এ সম্বন্ধে আলাপ করিয়া মনোভাব ব্যক্ত করিবেন এবং নিজ নিজ রাজ্যের প্রজাগণকে নূতন নূতন অধিকার দিবার জন্য ব্যগ্র হইবেন। এইরূপ ক্রমে হইতে থাকিলে, দেশীয় রাজাদিগের মধ্যে খামখেয়ালী ভাবে রাজ্য শাসন করিবার ইচ্ছা

কমিয়া আসিবে এবং ক্রমে গণতান্ত্রিক সভা-সমিতি হইয়া আরও উচ্চাশা ও অধিকার বর্দ্ধিত করিবে। "এখন যেমন ব্রিটেনের সহিত বংশ-পরম্পরাগত সম্বন্ধমাত্র রহিয়াছে, ইহা হইতে মুক্ত হইয়া নবায়মান জাতিগুলি ইংরেজাধিকৃত ভারতের শাসন-প্রণালীর সহিত ঘনিষ্ঠ রাজনীতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইবে।"* মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্টের লেখকগণও রাজনীতিক দূরদৃষ্টির ফলে এইরূপ কল্পনা করিয়াছেন:—"ভারতের ভবিষ্যৎ পরিণাম-সম্বন্ধে আমাদের এইরূপ ধারণা যে, স্থানীয় বা প্রাদেশিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন এইরূপ কতকগুলি রাজ্যের সমষ্টি লইয়া ভারতবর্ষ গঠিত হইবে। এইরূপ রাজ্য-সমষ্টির উপর নেতৃত্ব করিবেন একটি কেন্দ্রস্থ গভর্নমেণ্ট এবং সেই শাসনতন্ত্রে জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি ও জনসাধারণের নিকট দায়ী ব্যক্তি ক্রমশঃই অধিকতর সংখ্যায় থাকিবেন। ঐ গভর্নমেণ্ট সমগ্র ভারতের পক্ষে হিতকর আভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ সমস্ত ব্যাপারের ব্যবস্থা করিবেন। তাঁহারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্য সকল স্বাধীন অংশের সহিত তুল্যভাবে সমগ্র ভারতের মুখপাত্র স্বরূপ হইবেন। ভারতের এই যে চিত্র, ইহাতে দেশীয় রাজ্যগুলিরও স্থান থাকিবে। তাঁহারাও কোনও কোনও ব্যাপারে হয়ত ইংরেজাধিকৃত ভারতের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে ইচ্ছা করিবেন।"

* ইল্‌বার্ট ও মেস্‌টন্‌-কৃত 'ভারতের নব শাসন-যন্ত্র'।

পরিশিষ্ট (১)

রাজকীয় ঘোষণা

২৩শে ডিসেম্বর, ১৯১৯

ঈশ্বর-কৃপায় গ্রেট্‌ব্রিটেন ও আয়রলণ্ড এবং সাগরপারস্থ ইংরেজ রাজ্যের রাজা, ধর্ম্মের রক্ষক, ভারতবর্ষের সম্রাট্ আমি পঞ্চম জর্জ্জ এই ঘোষণা করিতেছি। আমার প্রতিনিধি ও গভর্নর জেনারল, ভারতীয় রাজন্যবৃন্দ এবং আমার সমস্ত প্রজাবর্গ যে জাতি বা ধর্ম্মের হউক না কেন—সকলকেই আমি সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি।

(১) ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সভাসমূহের ইতিহাসে আর একটি যুগ আসিয়াছে। আমি একটি আইনে আমার রাজকীয় সম্মতি প্রদান করিয়াছি। এই দেশের পার্লিয়ামেণ্ট ভারতবর্ষের উৎকৃষ্টতর শাসনের জন্য এবং প্রজাদের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার জন্য যে সকল ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন, এই আইন তাহার মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য। মাননীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে রীতিমত বিচার ও শাসন-প্রণালী সংস্থাপিত করিবার জন্য ১৭৭৩ ও ১৭৮৪ সালের আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। ১৮৩৩ সালের আইনের ফলে ভারতীয়দিগের পক্ষে সরকারী কর্ম্মের দ্বার উন্মুক্ত হয়। ১৮৫৮ সালের আইনের দ্বারা ভারতের শাসন কোম্পানীর হস্ত হইতে ইংলণ্ডরাজের

হস্তে ন্যস্ত হইল এবং আজ ভারতে যে জাতীয় জীবন দেখা যাইতেছে, তাহার ভিত্তি স্থাপিত হইল। ১৮৬১ সালের আইনে প্রতিনিধি-মূলক প্রতিষ্ঠানের বীজ রোপিত হয় এবং ১৯০৯ সালের আইনে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ করে। এক্ষণে যে বিধি আইনে পরিণত হইল, তাহাতে জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণকে শাসন-ব্যাপারে নির্দ্দিষ্ট একটি অংশ দেওয়া হইল এবং ভবিষ্যতে যাহাতে শাসনপ্রণালী প্রতিনিধি-মূলক হয়, তাহার পন্থা প্রদর্শিত হইল। আমি বিশেষ ভরসা করি যে, এই আইনে যে নীতির সূচনা হইল, তাহা সার্থক হইলে মানবজাতির উন্নতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা হইবে। সুতরাং আপনাদিগকে অতীতের বিষয় স্মরণ করিতে ও ভবিষ্যতের সম্বন্ধে আমার ন্যায় আশান্বিত হইতে অনুরোধ করিবার এই উপযুক্ত সময় মনে করি।

(২) ভারতবর্ষের কল্যাণ যে দিন হইতে আমাদিগের উপর ন্যস্ত হইয়াছে, সেই দিন হইতেই ইহা আমাদের রাজ-বংশ ও রাজ-পরিবার কর্ত্তৃক ধর্ম্মতঃ গচ্ছিত সম্পত্তির ন্যায় গণ্য হইয়া আসিতেছে। ১৮৫৮ সালে প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া ধর্ম্মতঃ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্যান্য প্রজাদিগের সম্বন্ধে তাঁহার যে দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য, ভারতীয় প্রজাগণের সম্বন্ধেও তাঁহার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য তদ্রূপ। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে সকলের স্বাধীনতা থাকিবে এবং আইন সকলকে তুল্য ভাবে ও বিনা পক্ষপাতে রক্ষা করিবে, সে ভরসাও তিনি দিয়াছিলেন। আমার ভক্তিভাজন পিতা সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ড ভারতীয় জনসাধারণের নিকট ১৯০৩ সালে যে বার্ত্তা প্রেরণ করেন, তাহাতে সদয় ও ন্যায়সঙ্গত

শাসন অক্ষুণ্ণ রাখিবার সঙ্কল্প বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। পুনরায় ১৯০৮ সালের ঘোষণাপত্রে, ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইয়াছিল, তিনি তাহা পুনরায় প্রদান করিয়াছিলেন এবং সেই সকল অশ্বাসবাণীতে যে উন্নতির প্রেরণা ছিল, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন। ১৯১০ সালে, আমার সিংহাসনাধিরোহণের পর আমি ভারতের প্রজাগণ ও রাজন্যবৃন্দের নিকট যে বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহাতে তাঁহাদের রাজভক্তি ও শ্রদ্ধায় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলাম, এবং বলিয়াছিলাম যে, ভারতের সুখ-সমৃদ্ধি সর্ব্বদা আমার নিকট আদরের ও আকাঙ্ক্ষার বিষয় হইবে। পর বৎসর আমি সম্রাজ্ঞীর সহিত ভারতে গমন করিয়াছিলাম এবং ভারতীয় প্রজার সহিত আমার সহানুভূতি এবং তাহাদের কল্যাণের জন্য আমার আন্তরিক শুভেচ্ছার পরিচয় দিয়াছিলাম।

(৩) আমি এবং আমার পূর্ব্ববর্ত্তিগণ—আমরা যেরূপ স্নেহ ও অনুরাগের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছি, এই দেশের পার্লিয়ামেণ্ট ও আমার ভারতের কর্ম্মচারীরাও সেইরূপ আগ্রহ-সহকারে ভারতে আর্থিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ভগবান্ আমাদিগকে যে সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-সম্পদ্ দিয়াছেন, তৎসমস্তই আমরা ভারতের প্রজাগণকে দিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এখনও একটি দান অবশিষ্ট আছে, যাহার অভাবে কোনও দেশের উন্নতি সম্পূর্ণ হইতে পারে না। তাহা এই—আপন আপন সমস্ত ব্যাপার পরিচালন করিতে ও আপন স্বার্থরক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে প্রজাদিগের অধিকার। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করা সাম্রাজ্যেরই একটি কর্ত্তব্য ও

গৌরবের বিষয়; কিন্তু আভ্যন্তরীণ সমস্ত ব্যাপার-নির্ব্বাহের ভার ভারতবর্ষ নিজ স্কন্ধে বহন করিবার ন্যায্য দাবী করিতে পারে। ঐ ভার অত্যন্ত দুর্ব্বহ; সময় ও অভিজ্ঞতার প্রভাবে যখন উপযুক্ত বলসঞ্চয় হয়, তখনই ঐ ভার বহন করা সম্ভব। কিন্তু এক্ষণে ঐ অভিজ্ঞতা যাহাতে জন্মে এবং দায়িত্ব যাহাতে বাড়ে, সেই রূপ সুযোগ প্রদান করা হইবে।

(৪) আমার ভারতবর্ষের প্রজাগণের মধ্যে প্রতিনিধি-মূলক প্রতিষ্ঠানের জন্য আকাঙ্ক্ষা যে উত্তোরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা আমি সহানুভূতির সহিত লক্ষ্য করিতেছি। এরূপ আকাঙ্ক্ষা যে স্বাভাবিক, তাহাও আমি বুঝি। সামান্য আরম্ভ হইতে প্রবৃত্ত হইয়া, ক্রমেই এই উচ্চাশা ভারতে প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির হৃদয় অধিকার করিতেছে। আইন-সঙ্গত পথে সাহস ও আন্তরিকতার সহিত এই উচ্চাশা চালিত হইয়াছে। স্বদেশ-প্রেমের আবরণে কতকগুলি দুষ্ট লোক ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সময়ে সময়ে নানা অত্যাচার করিয়া যে কলঙ্ক আরোপিত করিয়াছিল, তাহাতেও আপনাদের আকাঙ্ক্ষা নষ্ট করিতে পারে নাই। বিগত মহাসমরে ব্রিটিশ সাধারণ-তন্ত্র যে সকল আদর্শের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহার দ্বারা সেই আকাঙ্ক্ষা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। ঐ মহাসমরে ভারতবর্ষ আমাদের জয়-পরাজয়ে, আশা ও উৎকণ্ঠায় যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, তৎপ্রতি সহানুভূতি পাইবার অধিকার ভারতের আছে। প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার ফলেই, ভারতীয়দিগের মনে রাজনীতিক দায়িত্ব-লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছে। সেই সংসর্গ হইতে ভারতীয়েরা মানবজাতির চিন্তা-প্রণালী ও

ইতিহাস ভাল করিয়া জানিবার সুযোগ পাইয়াছেন; তাহার ফলে এই আকাঙ্ক্ষা জন্মলাভ না করিয়াই পারে না। তাহা না হইলে, ভারতে ইংলণ্ডের কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। এই জন্য বহুবর্ষ পূর্ব্বে প্রতিনিধি-মূলক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি অতি সুবিবেচনার সঙ্গেই পত্তন করা হইয়াছিল। এই সূচনা স্তরে স্তরে বর্দ্ধিত হইয়া, এক্ষণে দায়িত্বপূর্ণ শাসনের পথে একটি নির্দ্দিষ্ট সোপান আমাদের সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছে।

(৫) সেই একই সহানুভূতির সহিত এবং দ্বিগুণ কৌতূহল লইয়া আমি এই পথে আপনাদের উন্নতি লক্ষ্য করিব। এ পথ সহজ হইবে না। লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে হইলে অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হইবে এবং আমার প্রজাদিগের সমস্ত শাখা ও জাতির মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা আবশ্যক হইবে। আমি বিশ্বাস করি যে, ঐ সকল গুণের অভাব হইবে না। নূতন গণতান্ত্রিক সভাসমূহ যাহাদের প্রতিনিধিস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের অভিপ্রায় ঐ সমস্ত সভা সুবিবেচনার সহিত ব্যক্ত করিবে বলিয়া আমি ভরসা করি। আমি আশা করি, তাহারা জন-সাধারণের স্বার্থ বিস্মৃত হইবে না; কারণ আপামর সাধারণকে (masses) এখনও ভোট দিবার অধিকার প্রদান করা সম্ভব হইতেছে না। আমি ভরসা করি, প্রজাগণের নেতারা—যাঁহারা ভবিষ্যতের মন্ত্রী হইবেন, তাঁহারা দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না এবং রাজ্যের সাধারণ ইষ্ট-লাভের জন্য স্বার্থত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইবেন। তাঁহারা স্মরণ রাখিবেন যে, প্রকৃত দেশহিতৈষণা পক্ষাপক্ষের ও সাম্প্রদায়িকতার সীমা অতিক্রম করে। তাঁহারা ব্যবস্থাপক-সভার বিশ্বাসভাজন হইবেন, অথচ

আমার কর্ম্মচারিগণের সহিত সাধারণ হিতের জন্য একযোগে কার্য্য করিবেন ; অবান্তর বৈষম্য ভুলিয়া একটি ন্যায়পরায়ণ ও উদার শাসনতন্ত্রের যথার্থ আদর্শ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিবেন। আমার কর্ম্মচারিগণও তাঁহাদের নূতন সহযোগীদিগকে সম্মান করিবেন ও তাঁহাদের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া ও সদ্ভাবে কার্য্য করিবেন, ইহাও আমি তুল্য রূপেই ভরসা করি। তাঁহারা, প্রজাবৃন্দ ও তাঁহাদের প্রতিনিধিদিগকে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান-লাভে সুশৃঙ্খলার সহিত অগ্রসর হইতে সাহায্য করিবেন। আমি ভরসা করি, এই সকল নূতন কর্ত্তব্য-সম্পাদনে তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় বিশ্বস্তভাবে আমার প্রজাবৃন্দের সেবা করিয়া তাঁহাদের সুমহৎ উদ্দেশ্য সফল করিবার একটি সুযোগ পাইবেন।

(৬) আমার আন্তরিক কামনা এই যে, আমার প্রজাবৃন্দ ও যাঁহারা আমার শাসন-কার্য্যের জন্য দায়ী, তাঁহাদের মধ্যে যত দূর সম্ভব যেন বিদ্বেষ-ভাবের চিহ্নমাত্র না থাকে। রাজনীতিক উন্নতির জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া যাহারা অতীতে আইন ভঙ্গ করিয়াছে, তাহারা ভবিষ্যতে যেন আইনের সম্মান করিতে শিক্ষা করে। যাঁহারা শান্তিপূর্ণ ও শৃঙ্খলাযুক্ত শাসন-যন্ত্রের সংরক্ষণে নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা অতীতে যে সকল উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করিয়াছেন, তাহার কথা যেন ভুলিয়া যান। এক নূতন যুগের সূত্রপাত হইতেছে। আমার প্রজাবৃন্দ ও কর্ম্মচারিগণ একই উদ্দেশ্যের জন্য মিলিয়া-মিশিয়া কাজ করিবেন, এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া উভয়ে এই নূতন যুগের উদ্বোধন করুন। অতএব আমি আমার প্রতিনিধিকে আদেশ করিতেছি যে, সর্ব্বসাধারণের নির্ব্বিঘ্নতার কোনও ব্যাঘাত না ঘটে, ইহা বিবেচনা করিয়া

তিনি আমার নামে এবং আমার পক্ষ হইতে রাজনীতিক অপরাধে অপরাধীদিগের প্রতি যত দূর সম্ভব রাজকীয় ক্ষমা প্রদর্শন করিবেন। রাজ্যের বিরুদ্ধে কোনও অপরাধের জন্য কিংবা অন্য কোনও বিশেষ অথবা সঙ্কটকালীন আইনে দণ্ডিত হওয়ায় যাহাদের কারাবাস বা স্বাধীনতার সংকোচ হইয়াছে, তাহাদিগকে এই সর্ত্তে মুক্তি দেওয়া হয়, ইহা আমি ইচ্ছা করি। আমি ভরসা করি, যাহারা এই দয়ার সুযোগ গ্রহণ করিবে, তাহাদিগের ভবিষ্যৎ আচরণে এই দয়া সার্থক হইবে। আমার সমস্ত প্রজা যেন এরূপ ভাবে চলে, যাহাতে ভবিষ্যতে এই প্রকার অপরাধের জন্য আইন প্রয়োগ করিতে না হয়।

(৭) এই নূতন শাসন-প্রণালী-প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজন্য-বৃন্দের একটি সভাগঠনে আমি আনন্দ সহকারে সম্মতি দিয়াছি। আমি ভরসা করি, ঐ সভার পরামর্শে রাজন্যবৃন্দের ও তাঁহাদের রাজ্যের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে; যে সকল বিষয়ে ইংরেজাধিকৃত ভারত ও ঐ সকল রাজ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহার উন্নতি হইবে এবং সমগ্র সাম্রাজ্যের মঙ্গল হইবে। ভারতের রাজন্যগণকে এই উপলক্ষে আবার আমি আশ্বাস দান করিতেছি যে, তাঁহাদের অধিকার, পদমর্য্যাদা ও বিশেষাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে আমার সঙ্কল্প সর্ব্বদাই স্থির রহিয়াছে।

(৮) আগামী শীত কালে আমার পক্ষ হইতে 'রাজন্যবৃন্দের সভা' ও ব্রিটিশ ভারতে 'নূতন শাসন-প্রণালী'র উদ্বোধন করিতে আমার প্রিয় পুত্র প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্‌স্‌কে পাঠাইব, এই ইচ্ছা করিয়াছি। যাঁহাদের উপরে দেশের ভবিষ্যৎ সেবা নির্ভর করিতেছে, আমার পুত্র যেন তাঁহাদের মধ্যে সদ্ভাব ও বিশ্বাস

দেখিতে পান। এই সদ্ভাব ও বিশ্বাস থাকিলেই তাঁহাদের পরিশ্রম সাফল্যমণ্ডিত হইবে এবং তাঁহাদের শাসন উন্নত ও উজ্জ্বল হইবে। আমার সমস্ত প্রজাবৃন্দের সহিত আমি সর্ব্ব-শক্তিমান্ পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যেন তাঁহার কৃপায় ভারতের সুখ-সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হয় এবং ভারতবর্ষ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পূর্ণমাত্রায় পাইতে পারে।

২৩শে ডিসেম্বর, ১৯১৯

পরিশিষ্ট (২)

সম্রাট্ কর্তৃক প্রেরিত বার্ত্তা

ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষৎ ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের
উদ্বোধনোপলক্ষে ডিউক্ অব্ কনটের দ্বারা ১৯২১ সালের
৯ই ফেব্রুয়ারী বিজ্ঞাপিত হয়।

ব্রিটিশ ভারতে নূতন শাসন-সম্বন্ধে পার্লিয়ামেণ্ট যে আইন পাস করিয়াছিলেন, তাহাতে আমি সম্মতি দিবার পর এক বৎসরের কিছু অধিক কাল গত হইয়াছে। এই যে সময় গত হইয়াছে, ইহা কেবল প্রয়োজনীয় শাসন-যন্ত্রের সম্পূর্ণতা সাধন করিতে কাটিয়াছে এবং আপনারা অদ্য সেই আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপরিষদ্দ্বয়ের উদ্বোধনে সমাগত হইয়াছেন। এই শুভ উপলক্ষে আমি আপনাদিগকে এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক-সভার সভ্যবৃন্দকে আমার অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভ কামনা প্রেরণ করিতেছি। আপনাদের ও তাঁহাদের পরিশ্রম সফল হউক।

বহু বর্ষ ধরিয়া, হয়ত বহু পুরুষ ধরিয়া, স্বদেশ-প্রেমিক এবং রাজভক্ত ভারতবাসিগণ তাঁহাদের মাতৃভূমির জন্য স্বরাজের কল্পনা করিয়া আসিতেছেন। আজ আমাদের সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বরাজের প্রথম উন্মেষ আপনারা দেখিতে পাইলেন। আমার রাজ্যমধ্যে উপনিবেশসমূহ যে স্বাধীনতা ভোগ করে,

তাহা লাভ করিবার পক্ষে যথেষ্ট সুযোগ এবং অবকাশও আপনারা প্রাপ্ত হইলেন।

আপনারা ব্যবস্থাপরিষৎসমূহে জনসাধারণের প্রথম নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি; আপনাদের উপর একটি অতি গুরুতর দায়িত্ব নির্ভর করিতেছে। আজ যে শাসন-প্রণালীর সুমহৎ পরিবর্ত্তন হইল, ইহার সমীচীনতা জগতের সমক্ষে সপ্রমাণ হইবে আপনাদের কার্য্যের দ্বারা এবং আপনাদের মতামতের ন্যায়-পরতার দ্বারা। কিন্তু আপনাদের বহু কোটী স্বদেশবাসী যাহারা এখনও পর্য্যন্ত রাষ্ট্রীয় কার্য্যকলাপে যোগদান করিবার যোগ্যতা প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাদিগকে উন্নীত করিবার এবং তাহাদের স্বার্থ আপনাদিগের নিজেরই স্বার্থ বলিয়া গণ্য করিবার দায়িত্বও আপনাদের উপর নির্ভর করিতেছে।

আমি সর্ব্বদা সহানুভূতির সহিত আপনাদের কার্য্য নিরীক্ষণ করিব। আপনারা যে ভারতবর্ষ এবং সাম্রাজ্যের প্রতি আপনাদের কর্ত্তব্য করিতে কৃতসঙ্কল্প, এই দৃঢ় বিশ্বাস আমি হৃদয়ে পোষণ করিব।

পরিশিষ্ট (৩)

সম্রাট্ কর্ত্তৃক প্রেরিত বার্ত্তা

বোম্বাইয়ে অবতরণ-কালে প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্স্ কর্ত্তৃক
১৯২১ সালের ১৭ই নভেম্বর বিজ্ঞাপিত হয়।

অদ্য আমার পুত্র প্রথম আপনাদের দেশে পহুছিবেন। আমি তাঁহার দ্বারা ভারতবর্ষের রাজন্যবৃন্দ এবং প্রজাবর্গকে আমার সাদর সম্ভাষণ প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করি। আমার পরিজনবর্গ বংশ-পরম্পরাক্রমে আপনাদের প্রতি স্নেহসূচক যে সকল প্রতিশ্রুতির পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন, আমার পুত্রের গমন তাহারই চিহ্নস্বরূপ এবং তাহারই পুনরাবৃত্তি। আমার পিতা যখন প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্স্ ছিলেন, তখন তিনি প্রাচ্যের এই বিশাল সাম্রাজ্য (যাহার শাসনভার পরে তাঁহার বহন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল) দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। আর যখন তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখন তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার যে মহা সুযোগ আমি পাইয়াছিলাম, তাহা কৃতজ্ঞতা-মিশ্রিত গর্ব্বের সহিত স্মরণ করিতেছি। সেই একই আশায় এবং একই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আমার পুত্র আজ আপনাদের নিকট গমন করিয়াছেন। আপনাদের দেশে তাঁহার উপস্থিতির কথা মনে হইলে, ভারতবর্ষে আমি যে সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম তাহারই সঞ্চিত সুখস্মৃতিরাশি আমার মনে উদিত হয়; মনে হইতেছে, ঐ দেশের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য, যুগযুগান্তের ইতিহাস, উহার মহান্ স্মৃতিস্তম্ভসমূহ; সকলের অপেক্ষা অধিক মনে

পড়িতেছে ভারতবর্ষের রাজভক্ত প্রজাগণের অকৃত্রিম অনুরাগ। সাম্রাজ্যের বিপদের দিনের আহ্বানে ভারতবর্ষ যে প্রকারে সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাতেই সে রাজভক্তির অগ্নি-পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। আমার পুত্র ভারতের বিভিন্ন স্থানে পর্য্যটন করিবেন, তাহা আমি যেমন যেমন লক্ষ্য করিব, অমনি আমার মনে ঐ সকল স্মৃতি উদিত হইবে। আপনাদের মধ্যে তিনি যখন বিচরণ করিবেন, আমার হৃদয় তখন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিবে, এবং আমার হৃদয়ের সহিত সম্রাজ্ঞীর হৃদয়ও সেখানে থাকিবে, কারণ তিনি ভারতবর্ষকে আমা অপেক্ষা কোনও অংশে কম ভালবাসেন না। আমরা যে সকল বন্ধুগণের রাজভক্তি বহুমূল্য বলিয়া গণনা করিয়াছি এবং আমাদের পিতৃপুরুষেরাও করিতেন, সেই সকল বন্ধুর নিকট আমার পুত্র এই আশা ও ভরসার বাণী লইয়া যাইতেছেন। আপনাদের জীবনে যাহা কিছু ঘটে, তৎপ্রতি আমার সহানুভূতি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ আপনাদের কথাই আমি সব সময়ে ভাবিয়াছি। সমস্ত সভ্যজগতে সামাজিক শৃঙ্খলার ভিত্তি যুদ্ধ ও বিপ্লবের দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছে। যেখানেই নাগরিকতা (citizenship) আছে, সেখানেই তাহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষকেও অন্যান্য দেশের ন্যায় তাহার নিজস্ব বিশেষ বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। এই সমস্যাসমাধানের উপযোগী নূতন সামর্থ্য ও নূতন দায়িত্ব তাহাকে দেওয়া হইয়াছে। আমার একান্ত আশা ও দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই সকলের সাহায্যে এবং আমার গভর্নমেণ্ট ও কর্ম্মচারিগণের পরামর্শে আপনারা সে সকল সমস্যার এমন একটি সমাধান করিতে পারিবেন, যাহা

আপনাদের ইতিহাসবিশ্রুত অতীত গৌরবের উপযুক্ত। আমি ইহা একান্ত ইচ্ছা করি ও ভরসা করি যে, সুশৃঙ্খলাপূর্ণ উন্নতির প্রভাবে সমস্ত অশান্তি বিলীন হইয়া যাইবে। আপনাদের উৎকণ্ঠা এবং আপনাদের হর্ষ আমার নিজেরই। আপনাদের সুখের যেখানে সংস্রব আছে, আপনাদের যাহাতে আশার সঞ্চার হয়, যাহা আপনাদের উন্নতির পথে সহায়তা করে, সে সমস্ত বিষয়ে আমি সহানুভূতির প্রেরণায় আপনাদের সহিত একই প্রকার অনুভব করিয়া থাকি। আমার পুত্র দূর হইতে আপনাদের নিয়তি মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। এক্ষণে আপনাদের নিকট গমন করিয়া সেই শুভকামনা পূর্ণতর জ্ঞানের দ্বারা পরিণমিত করিবার জন্য তাঁহার হৃদয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। আমি ভরসা করি এবং বিশ্বাস করি যে, তিনি যখন আপনাদের সমুদ্রোপকূল পরিত্যাগ করিবেন, তখন আপনাদের হৃদয় তাঁহাকে সেই বিদায়-যাত্রায় অনুসরণ করিবে এবং তাঁহার হৃদয় আপনাদের নিকটেই থাকিবে, এবং যে সহানুভূতির সুবর্ণ-শৃঙ্খলে আমার সিংহাসন বহুবর্ষ ধরিয়া ভারতের সহিত আবদ্ধ রহিয়াছে, তাহার আর একটি গ্রন্থি (link) বাড়িবে। এবং জগদীশ্বরের নিকট আমার সাগ্রহ প্রার্থনা এই, আমি যে সাম্রাজ্যের জন্য পরিশ্রম করিতেছি এবং ভগবানের ইচ্ছায় যে সাম্রাজ্যের জন্য আমার পরে আমার পুত্র পরিশ্রম করিবেন, সেই স্বাধীন সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতবর্ষ যেন জ্ঞান ও সন্তোষ এই উভয়ের যুগপৎ উন্নতিতে জাতীয় মহত্ত্বের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারে।

সমাপ্ত